

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী



হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনা বলী

১৯

সম্পাদনা
গীতা দত্ত

pathagar.net

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ॥ কলকাতা সাত

সূচিপত্র

পদ্মরাগ বুদ্ধ	৫
প্রদীপ ও অন্ধকার	৬৯
অনুবিসের অভিশাপ	৯৯
হস্তারক নরদানব	১১৫
ছত্রপতির ছত্রভঙ্গ	১৩১
গুপ্তধনের দৃঃষ্টিপ	১৪১

কলকাতায় ভিনিসের একরাত্রি

জয়স্ত ও মানিক সেদিন ডিনার খেতে গিয়েছিল—পার্ক স্ট্রিটে এক হালফ্যাশনি বন্ধুর বাড়িতে।

জয়স্ত ও মানিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক স্ট্রিটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগসাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগসাহেবের বাজারের দক্ষিণ দিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচালো কাপড় পরেন না, শিঙড়া কুরি খেতে তালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ি ধরে দাঁড়ি কামান, হাঁচেন—কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়স্ত ও মানিক যে এই শ্রেণির বন্ধুর খুব অনুরূপী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়াবার পর এর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ।

শখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশৰ্যবৃক্ষে সফল হয়ে জয়স্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু কিছু অংশ মানিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিম্নৃণ করে এখন বাড়িতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য বলে মনে করে।

হয়তো সেইজন্মেই পার্ক স্ট্রিট আজ বাগবাজারকে করেছে ‘ডিনার’ খাবার নিম্নৃণ।

বাগবাজারকে চমকে দেবার জন্যে পার্ক স্ট্রিট কোনও আয়োজনেরই অংশ করেনি।

সেসব দেখে জয়স্ত ও মানিক কোনও রকম বিশ্যয় প্রকাশ করলে না বলে গৃহকর্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে ‘মেনু’তে খাদ্যের ফরাসি নামগুলো তাদের কাছে বড়ো বাড়বাড়ি বলে মনে হল।

জয়স্ত বললে, ‘ওহে, এই ফরাসি নামগুলোর ভেতরে গোরু আর শুয়োরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?’

গৃহকর্তা এতক্ষণে জো পেয়ে অটুহস্য করে বললেন, ‘কেন হে, গোরু আর শুয়োর সম্বন্ধে এখনও তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?’

জয়স্ত গম্ভীর হয়ে বললে, ‘তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে বসে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও-দূটি খাবার আয়োরা পছন্দ করিব না।’

খানা শেষ হলে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসেন্মেণ্ট সে-ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে ‘কিউবিস্ট’ চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও ‘কিউবিস্ট’ কারিগরদের দ্বারা গড়া, এমনকি ঘরের মেরোর ‘মোজেকে’র উপরেও ‘কিউবিজম’র প্রভাব।

গৃহকর্তা বললেন, ‘জয়স্ত, এ ঘরটির ডেকোরেশন তোমার কেমন লাগছে?’

—‘বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ি সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন আদর্শের দিকে লক্ষ রাখে, তাহলে আমি বেশি খুশি হই।’

—‘কিন্তু আমি চাই ‘আপ টু ডেট’ হতে। ‘কিউবিজম’ হচ্ছে হালফ্যাশনের ঢেউ।’

—‘না, ‘কিউবিজম’র বয়েস হল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর! এখনকার আর্টে হালফ্যাশন এনেছেন ‘হাইপার রিয়ালিস্ট’ শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?’

—‘না।’

—‘তাহলে পার্ক স্ট্রিটে বাস করেও তুমি ‘আপ টু ডেট’ হতে পারোনি, তুমি জানো, যিনি ‘কিউবিজম’ আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন ‘কিউবিজম’ ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন?’

—‘না।’

—‘তাহলে হে বস্তু, তুমি পার্ক স্ট্রিটের কালো কলঙ্ক।’

বস্তু মনে মনে রেগে ঠোট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙ্গলি সাহেবের মতন তিনিও লোক দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুটিনাটির খবর বাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ভিনারের পর কফির পালা।

কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হ হ করে ঝোঁড়ে হাওয়া ঘরের ভিতরে চুকে প্রথমেই ‘কিউবিজম’দের আঁকা ছবিগুলোকে ডিঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

তখনই তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনও ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়স্তর চোর-ডাকাত ধরার কাহিনি শুনে গৃহকর্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।

জয়স্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে বাগবাজার—শ্রুতিশঙ্খা দোড়! ওঠো মানিক!’

গৃহকর্তা বললেন, ‘কিন্তু এখনও বৃষ্টি পড়ছে যে?’

—‘পড়ুক। চলো মানিক।’

গাড়ি-বারাদার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গি তখন একটা প্রকাণ্ড হুদে পরিগত হয়েছে।

সেই জলরাজ্য জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক স্তুপগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তিনেত্রে যেন সেই নির্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে মোটর যখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে প্রবেশ করল, পথের জলও তখন বেড়ে উঠল।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, শহরের বুরোভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মানিক বললে, ‘বর্ষায় কলকাতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোনও তফাতই থাকে না।’

জয়স্ত বললে, ‘কেবল ‘দীর্ঘশাসের সেতু’ আর ‘গড়োলা’ নৌকোর অভাব।’

—‘গড়োলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষাকালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে যেয়াটি বাসিয়ে নৌকো বাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর দীর্ঘশাসের সেতু’র কথা বলছ? বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরি করা যায় না?’

কিন্তু জয়স্ত কোনও জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, ‘হজুর, গাড়ি আর চলবে না।’

পদ্মরাগ বৃক্ষ

৩.
৮.

ঢাম্প বললে, ‘গাড়ি তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্তব্যগালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য! এসো মানিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।’

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখনও অনেক দূরে।

দুজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল,—পথের জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতোই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইন্দুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মানিক ঘৃণায় নাক টিপে ধরে বললে ‘বাড়িতে গিয়ে জলে ‘পার্মাসেনেট অফ পটাস’ গুলে গা না ধূলি আর রক্ষা নেই! জয়, ‘পার্ক স্ট্রিটের ডিনার বুথি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ।’

জয়স্ত বললে, ‘আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার ট্যাকসো যত বাড়ছে, তার রাস্তার জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিবিব বেড়ে উঠছে! অর্থ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অভ্যুত্থাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে।’

দুজনে বিরক্ত মনে হোঁচ্ট খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যাস্ত কুকুর পর্যন্ত হাজির ছিল না। লাল পাগড়ি পর্যন্ত অদৃশ্য!

বৃষ্টি তখনও থামেনি এবং বোঝে বাতাস তখনও বন্ধ জানলায় জানলায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে চুক্তে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

হঠাতে জয়স্ত বলে উঠল, ‘ইঁ, এই তো চোরের শুভযুহূর্ত! মানিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিকটিকি দেখতে চাও?’

মানিক বিস্মিত নেত্রে জ্যাস্তের মুখের পানে তাকালে।

জ্যাস্ত আঙুল তুলে বললে, ‘আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,—ওই বাড়িখানার তিনতলার দিকে তাকাও।’

পাশেই একখানা তিলন বাড়ি। একটা মনুষ্য-মূর্তি দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে!

মানিক বললে, ‘চোর! কিন্তু কেমন করে লোকটা উপরে উঠছে?’

‘ট্যাক্সির জলের পাইপ ধরে।’

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অঙ্ককারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জ্যাস্ত বললে, ‘এসো, দেখো যাক চোরটাকে ধরতে পারে যায় কি না?’

জ্যাস্ত বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়িয়ে নেওয়া লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুহানি গলায় কে শুধোলে, ‘কোন হ্যায় রে?’

—‘বাইরে এসে দাঁধো না বাবা, চাঁচাও কেন? বাড়িতে চোর চুকেছে!’

হঠাতে রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শিস দিলে!

জ্যাস্ত চারিদিকে চেয়ে কানকেই দেখতে পেলে না। বললে, ‘মানিক, এ চোর একজন আসেনি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শিস দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান করে দিলে।’

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জ্যাস্ত বললে, ‘দরোয়ানজি, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধরে তিনতলার বারান্দায় গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শিগগির আমাদের নিয়ে ওপরে চলো।’

দরোয়ান তখনই কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে টুকে যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহলে মিথাই তার নাম হাতি সিং!

তার সঙ্গে জয়স্ত ও মানিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতলার বারান্দায়! তিনতলায় দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, ‘হজুর, হজুর!’

কেউ সাড়া দিলে না।

কিন্তু জয়স্তের তীক্ষ্ণ কান শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বাম দিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহের এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল—দরজার কবাট শশদে খুলে গেল!

ঘরে ঘুট ঘুট করছে অঙ্ককার!

১. প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মৃত্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতি সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মতো তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হল,—কার হাত থেকে কী একটা জিনিস যেন মাটির উপরে পড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবৃহৎ হাতি সিং কুপোকাত!

জয়স্তও একলাক্ষে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই!

বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়স্ত দেখলে, জলের পাইপ ধরে আশ্চর্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অঙ্ককার ঘরে ঢুকে সে বললে, ‘হাতি সিং, তুমি উঠেছ?’

হিন্দি ভাষায় সাড়া এল, ‘উঠেছি বাবুজি! বড়েই জ্যোন চোর, ধরে রাখতে পারলুম না!’

—‘সে তোমার দোষ নয়। আলোর ‘সুইচ’ কোথায়?’

হাতি সিং আলো জ্বালল।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে পড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালি তদ্বলোক জুত্যস্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়স্ত ও মানিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

প্রথমেই জয়স্তের চোখ পড়ল তদ্বলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙুলের রাঙা ছাপ! তাঁর তাঁর গলা ঢিপে ধরেছিল।

তদ্বলোকের বয়স হবে চালিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতি সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপটা দিতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে তদ্বলোক কতকটা সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ‘আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হ্যায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেনবাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চলে যাচ্ছিলুম।’

মানিক বললে, ‘আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল হ্যায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমলচন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্রনাথ বসুকে কে হত্যা করে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

—‘তাহলে আপনিই হচ্ছেন প্রত্তুতাত্ত্বিক—’

জয়স্ত

—‘অমলচন্দ্র সেন।’

জয়স্ত অবাক হয়ে অমলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অমলবাবুর বিখ্যাত নাম সে-ও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্তুতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন?

পূরানো পোকায় কাটা পৃথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাণ্ডা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও—

তার চিঞ্জায় বাধা পড়ল।

অমলবাবু হঠাতে সবিশ্বায়ে বলে উঠলেন, ‘ও কী, ওই বুদ্ধমূর্তি ওখানে পড়ে কেন? ওটা ভাঙলই
বা কী করে?’

জয়স্ত ঢেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকে দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি পড়ে রয়েছে,
তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, ‘এখন বোধ যাচ্ছে, হাতি সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ওই মূর্তিটাই
চোরের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল! শব্দটা আমি তখনই শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে
পারিনি।’

অমলবাবু উদ্দেশ্যিত কষ্টে বললেন, ‘এত জিনিস থাকতে চোর ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচিল?
চোর ওই—বুদ্ধমূর্তি—নিয়ে—’

বলতে বলতে তিনি হঠাতে আবার থেমে গেলেন!

জয়স্ত

জয়স্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গ লক্ষ করতে লাগল।

সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হাদিস খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, ‘আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের
পরিচয় জানা হল না তো?’

জয়স্ত বললে, ‘জানবার মতো পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়স্ত আর আমার
বস্তুর নাম মানিকলাল। আমাদের শখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।’

—‘আপনাদের কথা আমিও বোধ হয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক-অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই
কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?’

—‘অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিশ বলবে তবতোষকে ধরেছিলেন ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু।’

—‘পুলিশ যা বলে বলুক, কিন্তু আসল বাহাদুরি কারলোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন
ক্ষেমন করে?’

জয়স্ত সব খুলে বললেন।

অমলবাবু বললেন, ‘জয়স্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

জয়স্ত হাসতে হাসতে বললেন, ‘অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাতে এই দুর্যোগ,
জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ যথা সময়ে আপনার বাড়ির সামনে আমাদের আবির্ভাব—এ-সমস্তই
অথবাই হয়ে পড়ে।’

অমলবাবু বললেন, ‘দেখুন, ওই বুদ্ধমূর্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়িতে ছিল।
ওই মূর্তিটি আমরা চার মাস আগে কাষেডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।’

—‘কাশোড়িয়ায়? যেখানে জন্মলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির ‘ওক্কারধাম’ আছে?’

—‘হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য মন্দির থেকে আরও তফাতে, জন্মলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরও অনেক কীর্তি লুকানো আছে। সেই খৌজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্তি পাই। এই মূর্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।’

জয়স্ত বললে, ‘মূর্তিটি এতদিন সুরেনবাবু কাছে ছিল,—তারপর?’

অমলবাবু বললেন, ‘গেল হণ্টায় একদিন ওই মূর্তিটি আমার পরাক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরও অনেক মূর্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোনও জিনিস বা মূর্তি নিয়ে যায়নি। পুলিশ এই হত্যার কোনও যুক্তিসন্দৃত কারণও খুঁজে পায়নি। জয়স্তবাবু, হত্যাকারী কীসের খৌজে সুরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন?’

—‘আপনার আর কিছু বলবার আছে?’

—‘আছে। আমার কোনও শক্তি নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘূম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে—আমি অঙ্গনের মতো হয়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে মূর্তি এতদিন সুরেনবাবুর ঘরে ছিল।’

মানিক বললে, ‘আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন করে সেখানে ওই বুদ্ধমূর্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।’

জয়স্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিল।

মূর্তিটি চুনপাথরে গড়া ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একহাতের বেশি হবে না।

। ৩৪ ।

সোনার চাকতির নকশা

জয়স্ত বুদ্ধমূর্তির দিকে হিঁরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোনও রকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ ধরনের লক্ষ লক্ষ মুদ্রিমূর্তি এশিয়ার সর্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আলতো ভাবে ঝাগয়ে জয়স্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃদুকষ্টে বললে, ‘হত্যাকারী এই মূর্তিই চুরি করতে এসেছিল? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কী?’

মানিক বললে, ‘হয়তো বিশেষ কোনও কারণে ওই মূর্তিকে কেউ এমন পরিত্ব মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সন্তুষ্টিত নয়।’

জয়স্ত বললে, ‘এর উভয়ের দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত, বুদ্ধের প্রতি একটা অতি-ভিত্তি থাকা সন্তুষ্ট কেবল গোঢ়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভৌষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাথাকার করে না। কাশোড়িয়ার অজানা জন্মলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্তি, তার জন্যে কলকাতার কোনও বৌদ্ধের এতটা নাড়ির টান

ହବେ କେନ୍ ? ଏଇ ଚେଯେ ତେର ମୂଲ୍ୟବାନ ଆର ଅସାଧାରଣ ପୁରୋନୋ ବୃଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି କତ ଲୋକେର ସରେ ସରେ ରଯେଛେ, ତାଦେର ଜନ୍ୟ ତୋ କୋନ୍‌ଓ ବୌଦ୍ଧର ମାଥା ବ୍ୟଥା ହୁଯା ନା । ନା ମାନିକ, ଏ ବ୍ୟାପାରେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ରହ୍ୟ ଆଛେ ।

ମାନିକ ବଲଲେ, ‘ଦେଶେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଳୀର ପ୍ରତିମା ଆଛେ, ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଭକ୍ତରା ତେମନ ପାଗଳ ହୁଯାନା । କିନ୍ତୁ ଶୁନିତେ ପାଇଁ, କୋନ୍‌ଓ କୋନ୍‌ଓ କାଳୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନାକି ଜାଗ୍ରତ, ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ନିତେ ବା ଦିତେ ପ୍ରତ୍ଯେତ । କେ ବଲତେ ପାରେ, ଏଇ ବୃଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତିର ତେମନ କୋନ୍‌ଓ ଖ୍ୟାତି ଆଛେ କି ନା ?’

ଜୟାନ୍ତ ବଲଲେ, ‘ଥାକତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ୟାତିର କଥା କାହୋଡ଼ିଆର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲେର ଭିତର ଥିକେ କଳକାତାଯ ଆସବେ କେମନ କରେ ?’

ଏତକ୍ଷଣ ଅମଲବାବୁ ଚୂପ କରେ ଥୁବ ମନ ଦିଯେ ଜୟାନ୍ତ ଓ ମାନିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁନଛିଲେନ । ଏଥିନ ତିନି ବଲଲେନ, ‘ଜୟାନ୍ତବାବୁ, ଆମର ମନେ ହଛେ, ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେମନ କରେ ଆମରା ପୋଯିଛିଲୁମ, ଦେ ଗର୍ଭଟାଓ ଆପନାଦେର କାହେ ବଲା ଉଚିତ । ହୁଯତେ ତାହଲେଇ ଆପନାଦେର କୋନ୍‌ଓ କୋନ୍‌ଓ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ପାଓୟା ସହଜ ହେ ।’

ଜୟାନ୍ତ ଏକଥାନା ଚୟାର ଟାଙ୍କେ ବସେ ପଡ଼େ ବଲଲେ, ‘ବଲୁନ । ଆମରା ଗଲ୍ଲ ଶୁନତେ ଭାଲୋବାସି ।’

ଅମଲବାବୁ ଆର କୋନ୍‌ଓ ରକମ ତୃମିକା ନା କରେଇ ବଲତେ ଲାଗଲେନ—

‘ବହୁଦିନ ଥିକେଇ ଆମି କାହୋଡ଼ିଆର ଓକ୍ତାରଧାମେର (ଇଂରେଜିତେ Angkor Thom) କଥା ଶୁନେ ଆସଛି । ତାଇ ମାସ କ୍ୟାମେ ଆଗେ ଆମି ଯଥନ ସୁରେନବାବୁର କାହେ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁଦେର ଏଇ ବିରାଟ କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଲୁମ, ତଥନ ତିନିମା ଥୁବ ଉଂସାହିତ ହୁଯେ ଉଠିଲେନ ।

କିନ୍ତୁ ଆମରା ତୋ ସାଧାରଣ ଭ୍ରମକାରୀ ନାହିଁ, ଆମରା ହାହିଁ ପ୍ରତ୍ତିତାତ୍ତ୍ଵିକ । ଆମାଦେର ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚକାଙ୍କ୍ଷାଓ ଛିଲ । ଶୁନେଇ, ଓକ୍ତାରଧାମେର ଚାରିଦିକକାର ଗଭିର ଅରଣ୍ୟେ ଏମନ ଆରା ଅନେକ ହିନ୍ଦୁକିର୍ତ୍ତ ଆଛେ, ଯା ଏକନ୍‌ଓ ଆବିଷ୍କିତ ହୁଯାନି । ଆମାଦେର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ, ତାଦେର ସନ୍ଧାନ ନେଇଯା ।

ଯଥା ସମୟେ ଯାତ୍ରା କରିଲୁମ ।

ତାରପର ସାଗର, ନଗର ଓ ଅରଣ୍ୟ ପାର ହୁଯେ କୀ କରେ ଓକ୍ତାରଧାମେର ଆକାଶଛୋ଱୍ୟା ଓ ଦୃଷ୍ଟିନୀମା ଛାଡ଼ାନୋ ଧରିମୁକ୍ତପେର ପରିତାତ୍ଫ ବିଜନ ବିରାଟିତାର ଛାୟା ଏସେ ଦାଁଡାଲୁମ, ସେବ କଥା ଏଥାନେ ବଲବାର ଦରକାର ନେଇ ।

ଗୌରବମୟ ଅତୀତେର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମୃତ୍ୟୁନିସାଡ୍ ଦୀର୍ଘଶାସର ମଧ୍ୟେ ଏକଦିନ, ଆମି ଆର ସୁରେନବାବୁ ସବିଶ୍ୱାସେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଇଁ, ଏମନ ସମୟେ ଶୁନାତ ପେଲୁମ ପାଶେର ଡାଙ୍ଗ ମଲିରେର ଭିତରେ କେ କାତର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଛେ ।

ସୁରେନବାବୁ ଚିକିଂସାତ୍ମ୍ର ଜାନତେ, ତାଁର ମଦେ ଓମୁଦ୍ରେ ବାଙ୍ଗ ଛିଲ ।

ଚିକିଂସାର ଗୁଣେ ଦୁର୍ଦିନ ପରେ ସର୍ବ୍ୟାସୀର ଅସୁଖ କିଛୁ କମଲ । ତାଁର ମୁଖେ ଶୁନଲୁମ, ତିନି ଓକ୍ତାରଧାମେ ବେଡ଼ାତେ ଏସେ ଏହି ବିଗଦେ ପଡ଼େଛେ ।

କେବଳ ଓକ୍ତାରଧାମ ନୟ, ଇତିମଧ୍ୟେ ଏଖାନକାର ଗହନ ବନେର ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅନେକ ଅଜାନା ବିଷ୍ୟାକୁ ତିନି ଦେଖେ ଏସେଛେ ।

ସର୍ବ୍ୟାସୀର କାହିଁ ଥିକେ ଅନେକ ନତୁନ ତଥ୍ୟ ଜାନତେ ପାରା ଯାବେ ବୁଝେ ଆମରା ପ୍ରାଣପଣେ ତାଁର ଚିକିଂସା ଓ ସେବା କରତେ ଲାଗଲୁମ । କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ କିଛୁ ହଲ ନା, ହଶ୍ବାଖାନେକ ପରେ ତାଁର ଅବସ୍ଥା ଏକେବାରେ ଖାରାପ ହୁଯେ ପଡ଼ିଲା ।

সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘আর কোনও আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।’

গভীর রাত্রে সন্ধিয়াসী আচ্ছমের মতো বললেন, ‘সুরেনবাবু, আমার কাছে সরে এসো।’

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন ‘আদেশ করুন।’

সন্ধিয়াসী খুব ক্ষীণস্থরে বললেন, ‘সুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্থীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পূরক্ষার দিয়ে যেতে চাই।’

সুরেনবাবু বললেন, ‘পূরক্ষারের লোতে আমরা আপনার সেবা করিনি।’

—‘সে কথা আমি জানি। সেই জন্যেই তোমাদের পূরক্ষার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ক্ষণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পূরক্ষার তোমাদের দেব তা বড়ো সাধারণ পূরক্ষার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যে কোনও সম্ভাটও লালায়িত হতে পারে। তবে এ পূরক্ষার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।’

সুরেনবাবু বললেন, ‘কী কাজ?’

—‘তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন আর চ্যান রয়েছে। ওদের কালকেই বিদায় করে দিয়ো।’

সুরেনবাবু সবিশ্বাসে বললেন, ‘কেন?’

—‘ওরা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।’

আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান হচ্ছে তাদের সর্দার। ইন হচ্ছে আমাদের পথ-প্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শক্তি করতে চাইবে, তার কোনও হাদিস খুঁজে পেলুম না।

সন্ধিয়াসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতির মৃত্যি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিকে ছাড়া আর কোনও দিকে যেয়ো না। দু-দিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—’

এই পর্যন্ত বলবার পরেই সন্ধিয়াসীর গলা থেকে ক্রমাগত চেঁচকি উচ্ছেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্ধিয়াসী বললেন, ‘তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারদিকে পাথরে বাঁধানো একটি পুরুরিগী। তার এক ক্ষেপণ থেকে পশ্চিম মুখে একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বিসৌবশেষ। প্রধান মন্দিরের চার কোণে আর চারটি ছোটো ভাঙা মন্দিরও আছে।’

সন্ধিয়াসীর হাঁপ ও হেঁকি আরও বেড়ে উঠল।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, ‘তারপর—তারপর?’

কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, ‘বড়ো মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদি আছে। তার উপরে আছে ছোটো একটি বৃক্ষমৃত্যি। তোমরা সেই মৃত্যিকে তুলে নিয়ে—’

সন্ধিয়াসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, ‘তারপর আমরা কী করব?’

কিন্তু সেকথা সন্ধ্যাসী শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। যেন নিজের মনেই অশ্ফুটস্থরে তিনি
বললেন, ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ বুদ্ধ’—

তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব।

আমরা সন্ধ্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অঙ্কের
পালন করলুম।

চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম—আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না।
এখানেই হঞ্চালয়ে থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেখে বাকি লোক
নিয়ে তারা ঢলে যেতে পারে।

আমাদের হঠাতে মত পরিবর্তনে তারা বিশ্বিত হল বটে, কিন্তু কোনও রকম সন্দেহ করতে পেরেছে
বলে মনে হল না।

সেই দিনই তারা বিদ্যায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কী দেখব আর কী লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু
কী একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতুহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে পরদিনই উত্তর-পশ্চিম
দিকে যাবা করলুম।

সেই প্রাত্তর, পুষ্টিরিণী আর চারটি ছোটো মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—
সমন্তই পাওয়া গেল।

বড়ো মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদির উপরে একটি বৃক্ষমূর্তি বেদির সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা
গাঁথুনি থেকে মৃত্যিকে খুলে নিলুম।

কিন্তু অনেক খোঁজার্থুজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না।
সমাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোনও পুরস্কারই সেখানে ছিল না—যদিও আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকের
পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিসই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছরের পুরানো যে
শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় সুরেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, ‘সন্ধ্যাসী বোধ হয় বুঝতে
পেরেছিলেন, কীসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য
সম্পদ আর কী থাকতে পারে?’

জয়স্বরাবু, চোর আজ যে বৃক্ষমূর্তি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ওইটিকেই আমরা সেই বড়ো
মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও-মূর্তি নিয়ে চোরের কী লাভ হত, এ কথাটা কিছুতেই আমি
বুঝতে পারছি না।’

জয়স্বরাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ‘আমলবাবু, আপনি বলছেন যে
সন্ধ্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ’? কিন্তু ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ’ নামে কোনও বৃক্ষমূর্তির কথা তো আমি
কখনও শুনিনি।’

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমিও শুনিনি।’

১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ

মানিক বললে, কিন্তু পদ্মরাগ মণি বলে মহামূল্যবান মণি আছে!

১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ

জয়স্বর অশ্ফুট কঢ়ে বললে, ‘সন্ধ্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, ‘বাবু জনে’ পূর্ববীর

যে-কোনও সম্ভাট লালায়িত হতে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চুনপাথরের গড়া এক বৃক্ষমূর্তি, আর একখানা শিলালিপি,—রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বৃক্ষমূর্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ডয় পায় না! আশ্চর্য রহস্য!

সে বৃক্ষমূর্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিল। তারপর তাকে উলটে ধরে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, ‘দ্যাখো মানিক, এর তলার দিকটা!’

মানিক দেখলে, মূর্তির তলায় খানিকটা জয়গায় শুঁড়ো পাথরের প্লেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, ‘এখানে একটা ছাঁদা ছিল। এখন ডরটা করে দেওয়া হয়েছে! ’

জয়স্ত হঠাৎ মূর্তিটা উচুতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিষ্কেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অমলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, ‘কী করলেন, কী করলেন! ওর পিছনে যে বাঙ্গি লিপি ছিল। ’

জয়স্ত সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুকরোর ভিতর থেকে একটা জিনিস নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিসটা তামার একটা কৌটোর মতো—অনেকটা বিলাতি ‘সেভিংস্টিকে’র কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিঞ্চ তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘৎ হবে!

জয়স্ত বললে, ‘মূর্তির ভিতরটা খুন্দে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছাঁদা আবার বক্ষ করে দেওয়া হয়েছিল। ’

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে থেকে বললেন, ‘ও কৌটোর ভিতরে কী আছে?’

—‘সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল। ’

সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাকতি!

অমলবাবু বললেন, ‘ও আবার কী?’

জয়স্ত জবাব না দিয়ে চাকতিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, ‘এতে কী-একটা নকশা খোদা রয়েছে। ’

—‘নকশা?’

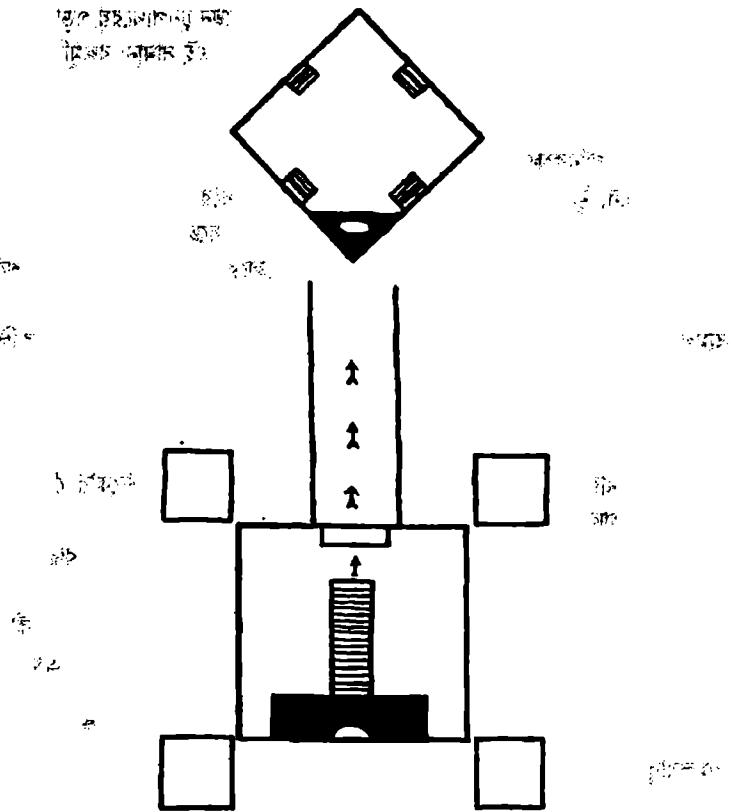
‘হ্যাঁ’—বলেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেনসিল ও ‘ম্যাগনিফাইং প্লাস’ বার করলে। বাঁ হাতে চাকতিটি উপরে ‘ম্যাগনিফাইং প্লাস’ ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেনসিল ধরে সে তখনই তাড়াআড়ি আর-একখানা বড়ো নকশা তৈরি করে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নকশাখানা অমলবাবুর হাতে সম্পর্ণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিশ্বাসে বলে উঠলেন, ‘এ যে প্রাতুরের সেই মন্দিরের নকশা! এই মন্দিরেই আমরা ওই বৃক্ষমূর্তি পেয়েছি। ’

জয়স্ত খুব খুশি মুখে পকেট থেকে ঝুপোর নস্যদানি বার করে দুবার নস্য নিয়ে বললে, ‘তাহলে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো করে আপনি একবার নকশাখানা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, সন্ধ্যাসী যা বলে যেতে পারেননি, আমরা এইবাবে সেই শুশ্র কথাটা ভুঁতে পারব! পদ্মরাগ বুদ্ধ! পদ্মরাগ বুদ্ধ! রহস্যময় নাম। ’

অমলবাবু নকশার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর

টোপ: পুরো উচ্চতমাসমূহ নড়া
বীরুৎ: পুরো নামাক টুকু



সোনার চাকতির নকশা

বললেন, 'দেখুন জয়স্তবাবু, এ খানা যে সেই মন্দিরের নকশা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চারঘাঠওয়ালা পুকুর, তার কোনাকুনি রাষ্টা, চারিদিকে চারটি ছাটো আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমনকি কালো পাথরের লম্বাটে বেদিটি পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় অমিলও রয়েছে।'

জয়স্তবাবু উপরে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কী কী মিলছে না, আমাকে তালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

— মন্দিরের ভিতরে, বেদির সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কী আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ওরকম কিছুই আয়দের চোখে পড়েন।'

— 'তারপর?'

— 'পুকুরের পশ্চিম কোণে তিন কোনা ওই কালো অংশটাই বা কী? মন্দিরের বেদির মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ওইখানেই আমরা বৃক্ষমূর্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা ছিল আছে, বুকাতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

— 'আর কোনও অমিল দেখতে পাচ্ছেন?'

—'না। তবে মন্দির থেকে পুরুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তির চিহ্ন রয়েছে কেন?'

জয়স্ত নকশার দিকে চেয়ে খালিকঙ্কণ ভেবে বললে, 'আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে! কিন্তু সেগুলো এখন প্রকশ করে লাভ নেই, কারণ সেসব সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অফিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ বুদ্ধের সমষ্ট রহস্য লুকিয়ে আছে।'

অমলবাবু বললেন, 'জয়স্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। শুকারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মূল্যবান বৃক্ষমূর্তি আছে তা নাকি দুর্লভ মণিমাণিক কেটে একসঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ বলেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!'

মানিক বললে, 'ভেবে দ্যাখো জয়স্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বৃক্ষমূর্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

জয়স্ত বললে, 'সর্বাসীও এমন পূরক্ষার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে-কোনও সম্রাট লালায়িত হতে পারেন!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! সে মূর্তি কত বড়ো? কতগুলো পদ্মরাগ মণি দিয়ে সে মূর্তি গড়া হয়েছে? মানিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!'

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!'

জয়স্ত বললে, 'অমলবাবু লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!'

—'কিন্তু জয়স্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্ম তন্ম করে খুঁজেও আমরা চুনপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইনি!'

জয়স্ত উত্তেজিত কঠে বললে, 'আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চুনপাথরে গড়া মূর্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নকশা অঁকা চাকতি। বৃক্ষমূর্তির মধ্যে এমন দুটো জিনিস লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অজ্ঞস্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা ক঳নাতীত কোনও সুরূলভ বস্তু খালিত করতে পারি? এই জনেই এমন একটি সাধারণ মূর্তির লোভে কেউ নরহত্যা করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কীসের এই চাবি? চাবিটা যেরকম বড়ো, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড়ো কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আমার মতে, এই চাকতির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নকশা আছে। কিন্তু নকশার ওই সিঁড়ির রহস্যটাই বা কী? ওরকম কোনও সিঁড়ি আপনি দেখতে পাননি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাঞ্চনিক নয়—নকশার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাঞ্চনিক হতে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই!'

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না, ওর অস্তিত্ব নেই!'

চাহুন্দি
ত চুক্তি

জয়স্তও দৃঢ় স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি—

—‘কেমন করে?’

১১১০ চ্যুতি

—‘ওঙ্কারধামে গিয়ে?’

—‘ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছেটার মতো। ওই অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুরুরের কোণে আর-এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন যাদুমন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?’

—‘বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে!’

অমলবাবু আহত কষ্টে বললেন, ‘অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি বলে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাঢ়া বলে মনে করেন?’

জয়স্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, ‘না, না অমলবাবু, আপনাকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্ষব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধৰন প্রত্যন্তের কথা। ও-বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজে। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশি সুবিধা করে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোনার চাকতির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধিদেবের মূর্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধরে রয়েছে, তবু এমন দুটো অস্তুত জিনিস আপনারা আবিষ্কার করতে পারেননি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাখা পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাইনি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এসো মানিক!’

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

চ্যুতি

লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে, তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়স্ত বললেন, ‘এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কী মনে হয়?’

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘কী আবার মনে হবে? এগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ।’

জয়স্ত হেঁট হয়ে পড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, ‘আর কিছু মনে হয় না?’

অমলবাবু বললেন, ‘আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়ো!.. কিন্তু জয়স্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাবার কী আছে? আসামি যখন পলাতক, তখন শুষ্টি দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না।’

কিন্তু সেবৰ্থা বোধ হয় জয়স্তের কানে চুকল না। পকেট থেকে নস্যদানি বার করে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, ‘পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই যেসব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান।’

একটু থেমে, হঠাতে ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, ‘অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি? মাথায় সে খুব ঢাঙ্গ, মাগলে সাত ফুটও হতে পারে। তার দেহ রীতিমতো হাস্টপুট। তার গায়ে অসুরে মতন জোর। সে ডান পাশে একটু বেশি হেলে পড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই।’

প্রথমে অমলবাবু হতভয়ের মতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছাইলেন। তারপর তাঁর মুখে-চোখে

গভীর বিশ্বয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, ‘জয়স্তবাবু, আপনি চ্যানকে চিনলেন কেমন করে?’

জয়স্ত দুই ভুক কুঁচকে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, ‘চ্যান?’

—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যান। ওক্ষারধামে সে আমাদের কুলির সর্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইনকে আমরা বিদ্য করে দিয়েছিলুম। আগন্তর মুখে এখনই অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না।’

জয়স্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে খুশিমুখে বললে, ‘না চ্যানকে আমি চিনি না! তাহলে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় দাঙ, জোয়ান আর মোটাসোটা?’

—‘হ্যাঁ! আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই।’

—‘উত্তম! মানিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে ফোন করে সব কথা জানিয়ো। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেন্ট বার করা হয়। কারণ খুব সম্ভব সুরেনবাবুকে সেই-ই খুন করেছে। আর আজকে চ্যানই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ওই পদচিহ্ন।’

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, ‘জয়স্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান কি কলকাতায় আছে?’

—‘পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষই দিছে।’

—‘পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?’

‘থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বুদ্ধি। পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো করে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশি সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখেছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়ো! সাধারণত ছোটো চেহারার পায়ের দাগ এত বড়ো হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ করে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে দ্যাঙ লোকেরা বেশি তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কীরকম স্পষ্ট দেখেছেন? হালকা দেহ বহন করে যেসব পা, তাদের ছাপ আরও কম স্পষ্ট হত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডান পাশটা বেশি চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডান পাশে বেশি হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আগন্তর অতবড়ো পালোয়ান দারোয়ানকে কুপোকাত করে সরে পড়েছে! দেখেছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লোকের যা করতে পারে না।’

অমলবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, ‘কিন্তু চ্যান এসেছিল আমাকে খুন করতে। কোথায় কাষোড়িয়া, আর কোথায় কলকাতা! কী আশ্চর্য।’

—‘এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! ওক্ষারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান আর ইন সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে চ্যান আর ইন পদ্মরাগ বুদ্ধের সন্ধানে আছে। পদ্মরাগ বুদ্ধকে লাভ করতে হলে যে চুনপাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তিটিকে দরকার চ্যান কোনও গতিকে সেটো ও টের পেয়েছে। ওই মৃত্তি এখন আপনার দখলে তাই শক্তির দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।’

অমলবাবু সভয়ে বললেন, ‘আমি তো পদ্মরাগ বুদ্ধ ছাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?’

জয়স্ত গভীর কঠে বললে, ‘কে বলে আপনি পদ্মরাগ বুদ্ধ চান না? এক হস্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওক্তারধামে যাত্রা করব?’

‘—বলেন কী মশাই? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দোড়ে অপসাতে মারা পড়ব? পদ্মরাগ বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটি টাকাও হয়, তাহলেও ওর মধ্যে আমি নেই। আগাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদিনে ওই চাবি আর চাকতি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ বুদ্ধ পেলো সে মৃত্তি নিয়ে আপনারা যা-খুশি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।’

মানিক বললে, ‘আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাতত এইটৈই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশি লোক হয়েও চ্যান কী করে অমলবাবুর বাড়ির অঙ্গ-সঙ্গের সব খবর রেখেছে? সে কেমন করে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমৃত্তি আছে, আর গৃহকর্তা নিদ্রিত? বুঝে দ্যাখো জয়, চ্যান অঙ্কারাই ঘরে ঢুকে মৃত্তিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল?’

জয়স্ত তাড়াতাড়ি মানিকের পিঠ চাপড়ে খুশি কঠে বললে, ‘শাবাশ মানিক, শাবাশ! তুমি খুব বড়ো প্রশ্ন তুলেছ, একথা তো আমার মাথাতে দেকেনি? চ্যান এত হাঁড়ির খবর রাখলে কী করে?’

অমলবাবু বললেন, ‘আপনার কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই পাড়ায় চার-পাঁচজন বর্ষি লোক প্রায় আনাগোনা করে! দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা!’

জয়স্ত বললে, ‘তাই নাকি? তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ির উপরে পাহবা দেয়! কিন্তু তারা ঘরের ভিতরকার খোঁজ রাখলে কেমন করে? আচ্ছা অমলবাবু, পথের ওপাশে ওই মস্ত বাড়িখানায় কে থাকে বলতে পারেন?’

—‘ওটা মেসবাড়ির মতো। ওখানে দেশবিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ বাঙালি নয়।’

—‘তাহলে ও-বাড়ির তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা খুবই সহজ দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্তেই ওখানে বসে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে কি না?’

অমলবাবু চমকে উঠলেন, ছান মুখে বললেন, ‘বলেন কী? আমি কি তবে শিয়াবে শমন নিয়ে বাস করছি?’

জয়স্ত বললে, ‘আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমরা দুজনে আপনাকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতিনিমিত্ত করে ঘরের আলো নিয়ে দিয়ে যদি কোথাও শক্র জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার আওয়াজে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কী হয়, দেখা যাক।’

কথামতো কাজ হল। জয়স্ত ও মানিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তৌঙ্ক বাঁশির আওয়াজ।

জয়স্ত বললে, ‘যা ভেবেছি তাই। আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করি বাঁশির সঙ্গেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, ‘সবাই হঁশিয়ার হও, শক্ররা এখনুনি রাস্তায় বেরবে!’ ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও-বাড়ি থেকে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এসো! আর-একবার অঙ্কারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক।’

জয়স্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়াল।

তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনও ঝিমঝিম করে ঝরছিল, রাস্তা

দিয়ে তখনও হাঁটু-ভোর জলের ধারা কলকল করে ছুটছিল এবং শেষ রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দা ছিঁড়ে তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝাকমক করে জলে উঠছিল।

সেই মহুতেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়স্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে একটা সূর্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো করে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে? চ্যান, না আর কেউ?

একটি মাত্র চিল ও দুইটি পাখি

অমলবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, ‘কী ভয়ানক! দেখুন জয়স্তবাবু, দেখুন! সত্যই তো, ও-বাড়ির বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দূরোগে বাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুকে পড়ে ও-লোকটা কী দেখছে?’

জয়স্ত বললে, ‘এতক্ষণ ও-লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে বসে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ করছিল। এখন ও-বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কি না! আমরা পথে বেরিলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হবে!’

—‘সর্বনাশ! তাহলে আপনারা কী করবেন?’

জয়স্ত হেসে বললে, ‘অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমাদের শঙ্কদের গায়ে কৃত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা খাপা ঘাঁড়কে ধরে মাটির উপর কাত করেছিলুম, মানিক সে সাঙ্গ দিতে পারে! কুস্তি-বৰ্জিং আমরা দুজনেই জানি। সূতরাং পথে বেরিতে আমাদের কোনও ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশাস্তি সৃষ্টি না করে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আগ্রহ নেই তো?’

অমলবাবু বললেন, ‘আগ্রহ? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান আবার আসে?’

জয়স্ত বললে, ‘আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কালু-সকালে আমরাই ওই সামনের বাড়িটায় বেড়াতে যাব।’

—‘বলেন কী, ওই বায়ের বাসায়?’

—‘কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেসবাড়ি। তা স্থান হয়, তাহলে ওখানে আরও অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোনও চেনা লোককে খুঁজতে যাব! দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুবি বসাতে সাহস করবে না।’

মানিক বললে, ‘কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কী লাভ হবে?’

—‘প্রথম লাভ হবে এই যে চ্যান ওখানে আছে কি না সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যানকে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান ওখানে থাকলে কালু সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।’

—‘কী অপরাধে, আর কী প্রমাণে?’

—‘চ্যানই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোনও প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান যে এই বাড়িতে দেওয়াল বেয়ে উঠে ছুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার

চেষ্টা করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দায় ওই পদচিহ্নগুলো। ওই প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেক কালের জন্যে জেল খাটোনা যেতে পারে। প্রধান শক্রকে সরাতে পারলে আমরা নিষিদ্ধ হয়ে কাশোড়িয়ায় গিয়ে বনবাসী হতে পারব।'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়জ্ঞবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ন্যাসীর কথা মানলে বলতে হয়, ইনও আমাদের মন্ত শক্র। সে কোথায় আছে?'

জয়স্ত বললে, 'তারও চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবাবু, অতঃপর আপনি ইনের রূপ বর্ণনা করুন!'

অমলবাবু বললেন, 'চ্যান যেমন অসাধারণ ঢাঙ, ইন তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চার ফুটের বেশি তো হবেই না, বরং কম হওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ যাদুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যাত হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হলেও ইন অত্যন্ত চটপটে আর চুলবুলে। সে হেটে ক্রিকেট-বলের মতো আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মতো। চ্যানের লম্বা চওড়া চেহারা সকলেরই দ্রষ্ট আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইনকে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয়! আবার চ্যান ও ইনকে একসঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি বৈচিত্রের কথা!'

জয়স্ত বললে, 'চমৎকার! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইনকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে?'

মানিক বললে 'নিশ্চয়ই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন!'

—'ফোটোগ্রাফ নয় মানিক, এ হচ্ছে 'এক্সপ্রেসানিট' চিত্রকরের আঁকা ছবি; এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একে একে কিছু দেখালে না, কিন্তু মূল ভাবটি হ্রাস প্রকাশ করলে। তুমি যদি ইনের সত্ত্বিকার একখানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহলেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! কিন্তু যাক সে কথা! ভোরের পাখি ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্থপলোক দেখবার চেষ্টা করা দরকার!'

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুস্ত শূন্য হয়ে গেল—এখন আর এক ফেঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গলে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনও জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এসময়ে বিচিত্র জনতার অনেকাত্মনে রাজপথের তত্ত্বাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আজ এখনও তার ঘূম ঘূম ভাব দূর হয়নি। যার নিতান্ত দায়, সেই-ই পথে পা ব্যাটিয়েছে। অনেক দোকান এখনও বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আত্মাদ প্রায় স্তুর, মোটররা এখনও মাঝেমধ্যে গ্রামের লোডে উৎসাহিত হয়নি।

জয়স্ত ও মানিক যখন রাস্তার ওপাশের মন্ত বাড়িখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোনও কচকচি জাগেনি।

একটা বুড়ো হিন্দুহানি দারোয়ান সদর দরজার চৌকাঠে বসে দাঁতনকাঠি চৰ্বি করছিল। জয়স্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'দরোয়ানজি, এ বাড়িতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?'

দারোয়ান একটু বিশ্বিত ভাবে জানালে যে এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালি বাবু'দের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়স্ত বললে, 'সে কথা আমি বুঝি দারোয়ানজি! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব

না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিমা!

দারোয়ান জানলে, তিনতলায় চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।
‘তিনতলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটো আছে?’

শোনা গেল, তিনতলায় রাষ্ট্রার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-চ্যান্জন বর্মি লোক আছে। তিতরের দিকে আছে একধর মাদ্রাজি। বর্মিদের ঘরের পাশেই দুখানা ঘর খালি আছে।

জয়স্ত আর কিছু জিঞ্জসা না করে দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল।

কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ির—বিশেষত যেখানে অবাঙালির বাস—সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘণাকর হান। তার ধাপে ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মৃত্য ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধি জঞ্জল এবং তার দেওয়াল হয়, খুতু পানের পিক ও অন্যান্য নানা নঢ়ারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রিত। শাস্তি ও চক্ষু বন্ধ করে এবং যতটা সম্ভব জড়োসড়ে হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়।

জয়স্ত ও মানিক এই ভাবেই দোতলায় গিয়ে উঠল।

দোতলায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে ডাস্টবিনের চেয়েও নোংরা একতলার উঠান দেখা যায়।

অধিকাংশ ঘরের দরজা-জানলাই সারারাত্বাপী বৃষ্টির জন্যে এখনও বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তর্জন-গর্জন বাইরে বেগে ছুটে আসছে।

তারা তিনতলায় উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চারজন লোকের দ্রুত পদধ্বনি!

কিন্তু তিনতলায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বারান্দার ধারের প্রত্যেক ঘরের দরজা জানলা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা ঘুরে এল—তবু কাক্ষ দেখা বা সাড়া নেই, এমনকি এখানে কাক্ষের নাক পর্যন্ত ঢাকচে না!

মানিক মুদ্যথে বললে, ‘কিন্তু উপরে এখনই যাদের পায়ের শব্দ পেলমি তারা কে, আর গেলই বা কোথায়?’

জয়স্ত বললে, ‘হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান ও ইন কোম্পানির লৈক, আমাদের সাড়া পেয়ে গাঢ়া দিয়েছে! মানিক এখন একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে!’

একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগালো রয়েছে।

১৩৯ : ৪৮

দারোয়ানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

১৩৯

ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাষ্ট্রার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে সুমুখের দিকে তাকিয়ে জয়স্ত বললে, ‘দ্যাখো মানিক, এখান থেকে অমলবাবুর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।’

বারান্দার মেঝান থেকে কাল রাত্রের সেই মূর্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়স্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আন্তে আন্তে একটা জানলা বন্ধ করার আওয়াজ হল।

মানিক চুপি চুপি বললে, ‘বারান্দার ধারের একটা ঘরের জানলা খোলা ছিল আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ করে দিলো!’

জয়স্ত বললে, 'হ্যাঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করছে। হয়তো আমাদের মতলব ধরে ফেলেছে!'

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জানলা ও একটা দরজা রয়েছে। দুই-ই বন্ধ।

দরজার কড়া ধরে জয়স্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোনও সাড়া নেই।

জয়স্ত বললে, 'এরা বোধ হয় প্রতিষ্ঠা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চলো, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।'

দুজনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল।

আর-একবার এদিকে-ওদিকে উকিখুকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মানিক, তারপর জয়স্ত।

হঠাতে হড়মুড় করে বিষম একটা শব্দ হল—মানিক চমকে পিছনে তাকাতে না তাকাতে জয়স্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্তেই ভয়ানক ধাক্কা যেয়ে মানিক সিঁড়ির উপরে আছাড় যেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মানিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যত্নাগায় সে যেন অঙ্গ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়স্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুমুদ্য শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে!

তারপরেই চারিদিকে ব্যস্ত পদ্ধৰনি, চ্যাচামেচি, ছড়োছড়ি! সে বুরালে, জয়স্ত হঠাতে পা-হড়কে সিঁড়ির উপর পড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আছন্নের মতো বসে থেকে মানিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দেওলায় নেমে সে দেখলে, সেখানে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারির ভিড়!

জয়স্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্ধ-মুর্ছিতের মতন বসে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মানিক তার কাছে গিয়ে ডাকল, 'জয়, জয়, তোমার কি বড় বেশি জেগেছে?'

অভিভূতের মতো জয়স্ত খালি বললে, 'হ্যাঁ।'

মিনিট পাঁচক পরে জয়স্ত কতকটা প্রকৃতিশ্ব হল, তার ঢোকের তাঙ্গ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কাকে খুজতে লাগল।

মানিক বুরালে, জয়স্ত এ অবস্থাতেও চ্যান বা ইনকে ভোলেনি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুঘুকের কোনও নমুনাই দেখা গেল না।

মানিক বললে, 'জয়; আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনব কি?'

জয়স্ত কষ্টেস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়স্ত ও মানিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়স্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শক্ত ঘরে বললে, 'মানিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোনও বর্মি লোককে দ্যাখেনি?'

—‘না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিলিট্যুডেক্সেরি স্টেশন। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কি না জানি না।’

—‘নিষ্ঠয় এসেছিল।’

—‘কী করে জানলে?’

জয়স্ত গান্ধীর স্বরে বললে, ‘মানিক, আমি পা পিছলে পড়ে যাইনি।’

—‘তবে?’

—‘আমাদের সূচতুর বঙ্গ এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করেছে।’

—‘জয়স্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।’

জয়স্ত খুব শুনো হাসি হেসে বললে, ‘মানিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাতে পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মারলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হড়মুড়িয়ে পড়ে গেলুম।’

মানিক সচকিত কঠে বললে, ‘বলো কী জয়! কে ধাক্কা মারলে? তাকে দেখেছ?’

—‘না, দেখবার সময় পাইনি। তবে তার গাযে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা থেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। তারপর আমি যখন দোতলার বারান্দায় পড়ে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অচিলায় অজ্ঞানা বঙ্গ আমার পকেট থেকে সেই বড়ো চাবিটা আর নকশা আঁকা সোনার চাকতি নিয়ে দিব্যি সরে পড়েছে।’

—‘সর্বনাশ! এখন উপায়?’

জয়স্ত বললে, ‘অমলবাবুর বাড়িতে ফোন আছে। তুমি এখনই গিয়ে ইন্স্পেকটার সুন্দরবাবুকে একদল কন্টেক্টেল নিয়ে এখানে আসতে বলো। এই বাড়িখানা তল্লশ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দি।’

গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইন্স্পেকটার সুন্দরবাবু যখন মানিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়স্ত তখন অস্ত্র পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কঠে সে বললে, ‘এত দেরি হল কেন সুন্দরবাবু?’

সুন্দরবাবু তার মাথাজোড়া ঘর্মাক্ত টাকের উপরে কুমালঠালনা করতে করতে বললেন, ‘হ্ম! দেরি হবে না? শুনলুম বাড়ি খানাতল্লশ করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হকুমনামা আনতে হল যে! কিন্তু ব্যাপার কী জয়স্ত? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খৌজ পেয়েছ?’

—‘আমার তো তাই বিশ্বাস! অন্তত যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্যন্তভুক্ত অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।’

—‘হ্ম! মানিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্যসাগর অবিষ্কার করেছ! পদ্মরাগ বুদ্ধি, নকশা আঁকা সোনার চাকতি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

জয়স্ত বললে, ‘এখন ওসব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন ওই বাড়ির ভিতর যাই।’

—‘কিন্তু অপরাধী কি এখনও ওখানে আছে?’

—‘বর্মিদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ির ভেতর থেকে কোনও বর্মি-লোক বাইরে বেরোয়ানি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেক্টে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেক্টে হবে।’

—‘বেশ, তবে চলো।’

এত পাহারাওয়ালা দেখে দারোয়ানের দুই চক্ষু বিশ্বায়ে ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল।

সুন্দরবাবু পুলিশসূলভ কর্কশ কঠে বললেন, ‘এই পাঁড়ে!’

দারোয়ান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, ‘আমি পাঁড়ে নয় হজুর, আমি হনুমান চোবে।’

—‘তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জামুবান পাঁড়েই হও, সেকথা আমি জানতে চাই না! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চলো।’—তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হৃকুম দিলেন, ‘এই সেপাইরা! আমার সঙ্গে জন-চহোক লোক এসো, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,—কেউ যেন এই বাড়ির বাইরে যেতে না পাবে।’

জয়স্ত ও মানিক সবাইকে নিয়ে তেতলায় গিয়ে উঠল।

বর্মিদের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল।

সুন্দরবাবু পাল্লার উপরে এক লাধি মারভেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে চুকে দেখা গেল, চারজন বর্মি বিবর্ম মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু কক্ষ ঘরে বললেন, ‘এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কী করতে এসেছিস?’

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, ‘আমরা এখানে ব্যাবসা করতে এসেছি।’

—‘হ্যাঁ! মানুষ মারবার ব্যাবসা? ওহে জয়স্ত, এ ব্যাটাদের কোনটাকে তুমি চাও?’

বর্মিদের কাছে এগিয়ে এসে জয়স্ত তাঁক্ষণ্ডিতে প্রত্যেকের আপাদমস্তক লক্ষ করে বললেন, ‘তোমরা ক-জন এখানে থাকো?’

তারা জবাব দেবার আগেই দারোয়ান হনুমান চোবে বললে, ‘হজুর! এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্মি থাকে।

জয়স্ত বললে, ‘এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর দুজন কোথায় থাকে?’

একজন বর্মি বললেন, ‘আধগন্তা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।’

জয়স্ত চুপচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, ‘লোকটা যিছে কথা নাইন। আমি হলপ করে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোনও বর্মি বাড়ির বাইরে পা বাড়ম্বনি।’

—‘হ্যাঁ, মিছে কথা না? তাহলে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! চলো, ভেতরের ঘরটা খুঁজে দেখি।’

কিন্তু অন্য ঘরে চুকেও বাকি দুজনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, ‘এই জামুমান পাঁড়ে!’

দারোয়ান হাত জোড় করে বললে, ‘হজুর, আমার নাম হনুমান চোবে।’

—‘ও একই কথা। সকাল থেকে তুমি দেউড়িতে আছ?’

—‘হ্যাঁ হজুর।’

—‘দুজন বর্মিকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ?’

১৯

১৯

—‘না হজুর!’

—‘তাহলে তারা কি হস করে আকাশে উড়ে গেল?’

—‘বড়েই তাজবের কথা হজুর! আরও দুজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন জানিসক দাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!’

মানিক জয়স্তের কানে কানে বললে, ‘চ্যান আর ইন-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!’

জয়স্ত কেবল বললে, ‘ই’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘জয়স্ত, এখন আমাদের কৌ করা উচিত?’

জয়স্ত বললেন, ‘মেই চাকতি আর চাবির খোঁজ। যদিও ও-দুটো জিনিস খুব সন্তুষ্ট সেই অদৃশ্য লোক দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘরদুটো খুঁজে দেখা যাক।’

খানাতলাপ শুরু হল।

দুটো ঘরের সমস্ত ওলট-পালট করে এমনকি বিছানার বালিশ পর্যন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা হল, কিন্তু চাবি আর চাকতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, ‘মে মগদুটো তাহলে বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জামুমান—’

—‘হজুর, হনুমান—’

—‘না আমি তোমাকে জামুমান বলেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ওই ঘরে কে থাকে?’

—‘একজন মাদাঙ্গি সদাগর।’

—‘আচ্ছা, আগে ওই ঘরখানাই দেখা যাক। এসো জয়স্ত! এই সেপাই, ইঁশিয়ার! মগের বাছাওলো যেন সরে না পড়ে!’

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়স্ত শুধোলে, ‘হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজি থাকে তার নাম জানো?’

—‘জানি হজুর! গোপীনাথ নায়ড়ু।’

সুন্দরবাবু হাঁকলেন, ‘গোপীনাথ! গোপীনাথ!’

কোনও সাড়া নেই।

দারোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘গোপীনাথবাবু তো খুব তোঁরে উঠেন, তবে এখনও দরজা বন্ধ কেন?’

সুন্দরবাবু আবার পদ্যুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচ বার জাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়ম করে দরজার পালাদুটো খুলে গেল!

হড়মড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিশ্বাসে ‘হ্য’ বলে টিংকার করে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মানিক বললে, ‘কী হল সুন্দরবাবু, কী হল?’

সুন্দরবাবু আবার বললেন, ‘হ্য!

জয়স্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিত হয়ে চারিদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা নম্বা-চওড়া মাদ্রাজি,—তার বুকের উপরে আমূলবিন্দ একখানা মস্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও বক্ষস্থেত বেরিয়ে আসছে!

দারোয়ান বিহুল স্থরে ডাকলে, ‘গোপীনাথবাবু!—গোপীনাথবাবু!’

জয়স্ত মাথা নেড়ে বললে, ‘গোপীনাথবাবু এ জীবনে আর কথা কইবে না!’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘গোপীনাথকে এখনই কেউ খুন করেছে! সাবধান, খুনি ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বঙ্গ ছিল!

জয়স্ত ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, ‘জানলার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনি পালিয়েছে!

একটা খোলা জানলার দুটো লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক হয়ে রয়েছে!

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, ‘বাপ! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদ তারের মতন দুমড়ে ফাঁক করে পালানো যায়?’

মানিক বললে, ‘এ চ্যান ছাড়া আর কেউ নয়! কিন্তু চ্যান এই গোপীনাথ বেচারাকে খুন করলে কেন?’

সুন্দরবাবু এদিকে ওদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, ‘দ্যাখো মানিক, ঘরের সমস্ত জিনিস লস্তুভ! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উলটেপোলতে কিছু খুঁজেছিল।’

ঘরের সর্বাত্তি রাশি রাশি চটিভূতা, কাঠের পুতুল, ‘ল্যাকারে’র কৌটো প্রতৃতি ছড়ানো রয়েছে!

মানিক বললে, ‘দেখছি, সমস্ত জিনিসই বর্মায় তৈরি! গোপীনাথ কি বর্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যাবসা করত?’

দারোয়ান বললে, ‘হাঁ বাবুজি!

সুন্দরবাবু বিরক্ত কষ্টে বললেন, ‘আবার দেখছি একটা নতুন মাঘলা ঘাড়ে চাপল। যাই, উপরঅলাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি গে।’

সুন্দরবাবু বাহিরে গেলেন। মানিক বললে, ‘জয়, তুমি বোবা হয়ে কী ভাবছ বলো দেখি?’

জয়স্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা ঢেয়ারের উপরে বসেছিল। মুখ তুলে বললে, ‘মানিক, আমি মনে মনে আঁক কষছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।’

—‘আঁক?’

—‘মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্য হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোনও অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি ইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এর ব্যাবসা ছিল ব্ৰহ্মাদেশ থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধরে মেওয়া যাক, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্মায় গিয়েছে আর বর্মি ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হস্তে একদিন এই ঘরে বসে দেখলে যে একদল বর্মি লোক সামনের ওই ঘর দুখানা ভাড়া নিলে ফেলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাতীবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্মিদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোনও কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ির দিকে নজর রাখে, আর বর্মি ভাষায় কী পৰামৰ্শ করে। গোপীনাথও তখন কোতুলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেললে! তখন সে-ও তাদের উপরে—আর অমলবাবুর বাড়ির উপরে পাহারা দিতে লাগল। কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান আর ইন কোম্পানি আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদের চেয়েও সাহসী, এমন সুযোগ সৈ ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই কাঁকে গোপীনাথ আমার চাকতি আর চাবির অধিকারী হল। কিন্তু তার দৃত্তাগ্রন্থে উপরের বারান্দা

থেকে চ্যান আর ইন কোম্পানির কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ভ্যাগ করতে হয়েছে! মানিক, আমি কি অক ক্ষমতে ভুল করেছি বলে মনে করো?’

‘ইতিমধ্যে কখন সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়স্ত্রের কথা কিছু কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, ‘না, জয়স্ত্র! তুমি তো অক ক্ষমতে না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হ্য, ওই তো হচ্ছে শব্দের গোয়েন্দাদের বদ শ্বতাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেঁজা ফতে করে সরে পড়ে!’

সে-কথায় কান না দিয়ে মানিক বললে, ‘তাহলে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন করে চ্যান আর ইন এই ঘর খানাতলাশ করে চাবি আর চাকতি নিয়ে ওই জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?’

জয়স্ত্র কিছু বললে না, সামনের দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ করে মানিক দেখলে, সামনের দেওয়ালের গায়ে একখানা বড়ো ‘ব্রহ্মাইড এনলার্জেন্ট’ ছবি টাঙানো রয়েছে! ছবিখানা মৃত গোপীনাথের, কিন্তু উলটো করে টাঙানো রয়েছে।

মানিক বললে, ‘চ্যান আর ইন দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানটানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উলটো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!’

জয়স্ত্র মাথা নেড়ে বললে, ‘তারা যদি ওই ছবিখানা নামাত তাহলে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হত না বোধ হয়! দ্যাখো না, ঘরের যেসব জিনিস তারা খেঁটেছে, কেনওটাই গুছিয়ে রেখে যায়নি।’

—‘তবে?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘আমার মাথা আর মুগ্ধ! এখন উলটো আব সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!’

জয়স্ত্র বললে, ‘এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হল কি উলটো হল সেটা দেখবার সময় আব পায়নি।’

—‘কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কী?’

—‘ছবিখানা আব একবার নামালেই হয়তো কারণ বোৰা যাবে!—এই বলে জয়স্ত্র উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখান উলটো দেখলে, ছবির পিছনে পিজিবোর্ডের এক জায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে।

জয়স্ত্র পিজিবোর্ড ফাঁক করে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনুরের করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাকতি!

মানিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়স্ত্র খুশিকষ্টে বললে, ‘চাবি আব চাকতি ঢুরি করে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিস দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান আব ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনিরা খানাতলাশিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জানলাপথে চ্যান আব ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একেবারেই প্রথিবী জয় করেননি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই প্রথিবী জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যাব কল্পনাশক্তি নেই, দুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন দুর্কথা শুনিয়ে দাও তায়া, শুনিয়ে দাও। এই জামুমান পাঁড়ে—’

—‘হজুর, হনুমান চোবে—’

—‘ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধ হয় বড়োসাহেব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চলে যাও।’

জয়স্ত বললে, ‘আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই! কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাসখানেক ছুটি নিন।’

—‘কেন?’

—‘আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য শুরু হবে একেবারে কামোডিয়ার ঝঙ্গলে, ওক্কারধামের ধ্বংসস্তূপে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ।’

ওক্কারধামের যাত্রী

ধান-খেতের পর ধান-খেত, তারপর আবার ধান-খেত! সুরজের পর সুরজ আর সুরজ!

যতদূর চোখ চলে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ, কলাগাছ আর বাঁশবনের ডিভি। তারই ডিভির দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী! কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়াঘাটে নৌকায় চড়ে পার হতে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোটো ছোটো গ্রাম।

সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে বসে আনন্দি স্ত্রীলোকেরা চিংড়িমাছ, কমলালেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রি করছে।

ধ্লোর স্তুপে খেলা করছে নগ বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিঁধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর।

একখানা গাড়িতে আছে জয়স্ত ও ইনিক, পরের গাড়িতে অমলবাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়িতে দরকারি জিনিসপত্র এবং চাকরবাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, ‘এ যে দেখছি অঞ্চলগাঁওর সদেশ! শাশোপাশ একটানা এত বেশি ধানের খেত কেউ কি কখনও চোখে দেখেছে? হ্যাঁ!’

অমলবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ। এদেশ এমনি উর্বর বলেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে নতুন এক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, নতুন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।’

—‘হ্যাঁ, ওসব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না।’

—‘মা সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর অবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই তুলতে পারবেন না...’

সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি।

এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসিদের অধিকারে এসেছে।

আজ ফরাসিরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে নিবিড় বন কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত

এটা ছিল বাষ আর হাতির নিজস্ব মূল্যক, এখানকার দুর্ভেদ্য অরশের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সতর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

সতেরো শতাব্দীতে পর্তুগিজ মিশনারিরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধৰ্মস্থানে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে সেই বিস্ময়কর কাহিনি প্রচার করেন।

মিশরের পিরামিডের মতন বড়ো আশৰ্চ্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গজ শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না।

পরে সে গুরুও লোকে ভুলে গেল...

বড়ো বড়ো বটগাছ, বাঁশবন, নারিকেলগাছ ও নানা জাতীয় লতাশুল্প এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ চিহ্নগুলিকে এমন তাৰে ঢেকে রাখল যে, বাইরের কোনও কৌতুহলী চক্ষু আৰ তাদের কোনও খোজই পেলে না...

দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ!

ফরাসিরা প্রথমে ব্যাবসা সূত্রে ইন্দো-চিনে পদার্পণ করলে।

লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরশের অঙ্ককারে যেখানে সূর্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অস্তুত রাজধানী, মাইলের পর মাইল ব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব মন্দির, বিচ্চিরি প্রাসাদ! কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেইসব প্রবাদ শুনলেন।

অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ওখানে আগে কোনও বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতার পিছনে কোনও চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে সুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চিনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুথিপত্রেও কাষোজের এক আশৰ্চ্য সভ্যতার কাহিনি পাওয়া যায়!

Mouhot একজন ফরাসি ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতুহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে প্রেপ্তার করার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাষ আৰ হাতিৰ মূল্যকে প্ৰবেশ কৱলেন।

বাধেৰা জনদলের ছায়ায় বসে, হাতিৰ নদীৰ ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগৱেৱা গাছেৰ ডালে ডালে ঝুলে পড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষেৰ মুখ।

ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্ৰবেশ পথেৰ উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবেৰ চাৰিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদেৰ পায়ণ নোত্ৰেৰ সামনে বহুযুগ পৱে আৰাব কুদু মানুষেৰ আবিৰ্ভাৰ হল!

বোৰা পাথৱেৰ উপৱে বিস্ময়েৰ শব্দ-ৱেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনি বহন কৱে Mouhot আৰাব আধুনিক সভ্যতাগতে ফিরে এলৈন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উন্নেজনার সৃষ্টি কৱলে...

সেকালেৰ পৃথিবীতে এক জাতি যখন আৰ এক জাতিকে আক্ৰমণ কৱত, পৰাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত। তাৰা আৰাব নতুন দেশে গিয়ে সেখানকাৰ বাসিন্দাদেৱ তাড়িয়ে বা বশ কৱে নতুন রাজ্য স্থাপন কৱত।

এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোনও কেনও রাজ্য এখনও টিকে আছে।

সত্ত্বত এই ভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে এখনও সেটা স্থির হয়নি।

তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের হাতে গড়া নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়নি, এমন কথা বলা যায়।

এই সভ্যতার আগ্রহে যে এক সময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মতো প্রমাণেরও অভাব নেই।

ওক্তারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড়ো নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশ লক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদের মেঘাছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস করে আজও বেঁচে আছে—যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশ্রদের পিরামিড!

ওক্তারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়ো, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য!

মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিঘিজী হিন্দু—আমাদেরই পূর্বপুরুষ!

সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্তি স্থক্ষে দেখলে আপনাকে স্তুতি হতে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে একথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—মনে করবেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মর্তে অবতীর্ণ দেবতা!

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মতো কথা ঝুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, ‘হ্ম’।

প্রথম গাড়িতে তখন মানিক বলছিল, ‘জয়, কলকাতার অলিগনিতে চ্যান আর ইন হয়তো এখনও আমাদের ঝুঁজে মরছে!’

জয়স্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘শক্রদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ঠকে মনে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারিনি।’

—‘কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান আর ইন ছিল না, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরেকদের দলে তারা ছিল না।’

জয়স্ত অন্যমনক্ষের মতো বললেন, ‘হতে পারে। না হতেও পারে।’

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়স্ত সচমকে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা—অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

জয়স্তদের তিনখানা গাড়ি ঠিক পরে পরেই ছুটেছে।

কিন্তু আরও খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরও দুখানা নতুন মোটরগাড়ি! রাস্তার উপরে ধূলোর মেঘ সৃষ্টি করে গাড়ি দুখানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মানিক সবিশ্বাসে বললেন, ‘এত বেগে ওরা কারা গাড়ি চালায়! ক্রমাগত হর্নের পর হর্ন দিয়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে সরে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়ি বা কীসের?’

পিছনের গাড়ি থেকে যাস্ত-স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, ‘পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো! নইলে এখনই অ্যাকসিডেন্ট হবে!’

জয়স্ত নিজেদের ড্রাইভারকে বললে, ‘গাড়ি নিয়ে একগাশে সরে যাও। গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফ্যালো।’

ড্রাইভার তার কথামতো কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ি দুখানাও পথের একগাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে জয়স্ত পথের উপর নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোষরবক্ষে সংলগ্ন রিভলভারের উপর হাত রেখে পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তার দুই চঙ্গু প্রদীপ, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধূলোর মেঘে ঢাকা দুখানা গাড়ি তার অঙ্গাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব কাছে এসে পড়েছে!

মহাকালের অভিশাপ

জয়স্তের পাশে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, ‘জয়, তুমি কি মনে করো, ও গাড়ি দুখানার মধ্যে আমাদের শক্তি আছে?’

জয়স্ত বললে, ‘শক্তি জানি না, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।’

জয়স্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ করে ক্রমাগত হৰ্ণ বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র গতিতে সাঁৎ করে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় গাড়িখানা! গাড়ি তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোনও মানুষের মুখই অবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, ‘মেল-ট্রেনের স্পিডও এদের কাছে বোধ হয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে?’

পথের ধূলোর দিকে তাকিয়ে জয়স্ত বললে, ‘যেখানেই যাক, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘নাগাল ধরবে মানে? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি ছেটাতে হয়! হ্যম, আমি তাতে মোটেই বাজি ছই! গাড়ি যদি একবার হেঁচে খায়, তাহলে ওকারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাঁজির হতে হবে!’

জয়স্ত রূপোর নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, ‘ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প পড়েননি? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোশকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ির স্পিড না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধূলোর ওপরে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘ও হো হো হো বুঝেছি! এই দাগ ধরে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো?’

অমলবাবু বললেন, ‘কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কী?’

জয়স্ত বললে, ‘দরকার একটু আছে বই কি! এমন মারাত্মক স্পিড নিয়ে যারা ক্ষমতায়ে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন?’

৪৩

১২০

অমলবাবু ভীত কষ্টে বললেন, ‘আপনি কি বলতে চান, ওই গাড়ি দুখানার মধ্যে চ্যান আর ইন আছে?’

—‘চ্যানকেও চিনি না, ইনকেও চিনি না, এখন উঠুন গাড়িতে!’ —এই বলে জয়স্ত নিজের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ি তিনখানা আবার অগ্রসর হতে লাগল।

জয়স্ত প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ববর্তী গাড়িগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্মে।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, ‘আচ্ছা জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না করে এগিয়ে গেল কেন? আর শক্রুরা সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলাই বা কী করে? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না!’

জয়স্ত বললে, ‘চ্যান আর ইন হয়তো এখনও এখানে এসে পৌঁছোতে পারেনি, কিন্তু মানিক, তুমি ভুলে যেয়ো না যে এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!’

—‘জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোনও টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে?’

—‘হতেও পারে, না হতেও পারে! হয়তো ওরা হৃকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে! ওক্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগলে থাকবার জন্যে’।

গাড়ি ছুটছে! দুধারে সেই সবুজ খেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।

মানিক বললে, ‘দূরে একটা প্রাম দেখা যাচ্ছে।’

ড্রাইভার বললে, ‘হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম রিপ। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছোব।’

সিয়েম রিপ গ্রাম থেকে উত্তর দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল, বিরাট ওক্কারধামের বিপুল দেবালয়!

চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুনীর্ঘ বনস্পতিরা ওক্কারধামের পঞ্চতার অনেক নীচে পড়ে রয়েছে।

দূর থেকে ওক্কারধামকে দেখে মনে হল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নির্দশন রূপে সাজাহান বাদশার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়। এই অরণ্যের মধ্যে হঠাত তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

এ যেন আলাদিনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কেমনও অসম্ভব মায়ামন্দির, যে-কোনও মহুর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্য মিলিয়ন যেতে পারে!

ওক্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্তী সেই গাড়ি দুখানার ঢাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্বপ্রথমেই ডাকবাংলোয় চুকে একটা আশ্চর্ষিত নিশাস ফেলে বললেন, ‘হ্যাঁ, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!’

জয়স্ত বললে, ‘আপাতত আমাকে ও-দুটি সুখ থেকেই বক্ষিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।’

মানিক বললে, ‘কিন্তু এখানে তাদারক করবার কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে না। চারিদিক শাস্তিময়, শত্রুদের কোনও চিহ্নই নেই।’

‘হঁা, বড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে—’ মৃদুস্বরে এই কথা বলেই জয়স্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, ‘এই ওঙ্কারধাম আমার পুরোনো বন্ধুর মতো। মানিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ করে আসতে চাই।’

মানিক বললে, ‘এই অস্তুত মন্দির আমারও কোতৃহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।’

অগ্রসর হতে হতে অমলবাবু অধিনিয়মিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে কাহিনি বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে এই—

অন্তর্লোক থেকে পূর্ব আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই!

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হত্তীদের পঞ্চে! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চড়ে! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে বসে! চলেছে সভাসদ, সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, সওদাগর ও ধনী দীন প্রজার দল যথাযোগ্য যানবাহনে বা পদবেজে! চলেছে ঝুঁঝ ও ডিখারির দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সম্মাসীর গায়ে মাখানো শুকনো ভয়ের মতো সাদা ধূলোয় তরা উঁচু নিচু পথ মাড়িয়ে;—তাদের কোনও সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জলছে উজ্জ্বল আশার অঙ্গান বাতি! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে!

কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফেসকা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে জাগছে পাগলিনদীর কুকু চেউ, দূরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের ভুলাময় কটকপ্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-খিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত! কত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনন্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আঘা এগিয়ে চলল সেই বিপুর বাহিনীর পিছনে পিছনে!...

কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নিজস্ম নিষ্ঠক নির্দয় পথ জড়ে পড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকক্ষালের পর নরকক্ষাল,—জীবনের যাত্রার্থে যেসব অভাগ এগিয়ে যেতে পারলে না, তাদেরই শেষ চিহ্ন!

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলেন না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত সন্তান!

হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার নিম্নস্থ স্পর্শ ভূলে, সাগর পার হয়ে ব্ৰহ্মদেশের নিবিড় অৱগ্য ভেড়ে করে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী, মা-ছেলে, বৰ-বট, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনও কোনও বিধীয় প্রবেশ করতে সাহসী হয়নি। খুব সন্তুষ্ট তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদাজ বলে জানি।

ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষায় লিপি খুঁদে গেছে, তাই দেখেই এই সংজ্ঞা জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মৃত্তিও তাদের মৌন ভাষায় আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে—যাদের শিঙ্গনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ।

এইখানে গহন বন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিবাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অট্ট হয়েই আছে! তারতের গাঙ্কার, সারনাথ বা কোণারকের মতো এখানে আমরা কোনও প্রাচীন শিল্পকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওক্তারধামের শত শত শিল্পচিত্র, হাজার হাজার দেবতা দানব মানব ও পশুর মূর্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে।

এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারেনি!

...মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবস্তদের কলকোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে— দেবদাসীরা পায়ের নৃপুর খুলে মেন এই সবে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পুজো সেবে এই সবে যেন ঢোকের অন্তরালবর্তী হয়েছেন, ধৃপত্নো অঙ্গুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওক্তারধামের মতন বড়ো শহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না।

নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারতশিল্পী যখন এই শহরকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন, তখন ইউরোপের যে-কোনও নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হত!

এখেন, রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওক্তারধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মতো প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিস্ব পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর বাজধানীকে নিষ্কেপ করে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল? কোথায় গেল সেই সাগরীপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা?

আজকের বোবা ওক্তারধাম সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে যে-কোনও মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনর্বিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মানিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনও দূরে হালকা যেয়ে।

ওক্তারধামের পদ্ম ফেটা খালের খিলমিলে জলে, বাঁচার নারিকেল কুঞ্জের ভিত্তে ক্রমেই বেশি করে জমে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া।

বিভিন্ন দল বেঁধে ছেটো ছেটো যেষের মতো বাঁকে পাখিরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসছে দূরের মন্দিরগুলি ভেদ করে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গন্তীর মন্ত্রছন্দ! শুনলে আস্থা শিউরে উঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কঠরব, না বহুগের ওগারে বসে ওক্তারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত ঘরে স্তবপাঠ করত, তারই সুন্দীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অঙ্গকারের রঞ্জে রঞ্জে!

মানিক হঠাতে মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সম্মুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য ও বিচ্ছিন্ন এক নগর তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজি কেতাবে

এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোনও আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারেনি।

খুব উঁচু সেই নগর তোরণ, তাৰ দ্বাৰপথ দিয়ে অনায়াসে বড়ো বড়ো হাতি আনাগোনা কৰতে পাৰে এবং তাৰ উপৰে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিৱাট শিবেৰ মুখ! এমন বৃহৎ শিবেৰ মুখ মানিক জীবনে কোনও দিন দেখেনি!

ওক্ষারধামেৰ একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগৰকে ‘প্ৰবলপৰাক্ৰান্ত ও ভয়াবহ’ বলে বৰ্ণনা কৰে গেছেন। এখানকাৰ হিন্দুৱা জীবনধাৰণ কৰত তৱৰিৱ সাহায্যেই। তাদেৱ হাপত্তোও প্ৰকাশ পেয়েছে সেই প্ৰচণ্ড ভাবই! কাৰণ বাহিৰ থেকে ভিতৱ্যে চুক্তে গেলেই শিবেৰ যে প্ৰকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগস্থককে বলতে চায়, সাৰধান! পূৰ্ব ও পশ্চিম দিকেৰ মুখদুখানি যেন অনন্তেৰ ধ্যানে আঘাতহাৰা। এবং তোৱণেৰ ভিতৱ্য দিক থেকে যে মুখখানি নগৰেৰ দিকে তাকিয়ে আছে, তাৰ ভিতৱ্য থেকে যেন আশীৰ্বাদ ও বৱাভয়েৰ ভাৰ আবিষ্কাৰ কৰা যায়!

প্ৰলয়কৰ্তা শিবকে নগৰৱক্ষী রাপে নিৰ্বাচন কৰে ওক্ষারধামবাসী ভাৱতীয়ৱা উচিত কায়ই কৰেছে। কাৰণ, বাবে বাবে তাৰা যখন দিথিজয়ে যাত্রা কৰত পৃথিবীৰ বুক ভেমে যেত তখন শোণিত প্ৰবাহে!

প্ৰলয়-দেবতাৰ প্ৰীতিৰ জন্যে লক্ষ লক্ষ শক্তিৰ প্ৰাণবলি দিয়ে অবশ্যে তাৰা নিজেৱাও পাণ্য দেবতাৰ পায়ে আঘাতন কৰে চিৰ বিদ্যায় নিয়ে গিৱেছে। তাদেৱ স্মৃতিৰ শুশানে শেষ পৰ্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চিৰ-একাকী প্ৰলয়-দেবতাই!

অমলবাবু তোৱণেৰ উপৰ দিকে শিবেৰ ভয়াল মুখেৰ পানে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে নমক্ষাৰ কৰে বললেন, ‘হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কৰ্তা নও, সৃষ্টি কৰাও তোমাৰ কাজ! অবোধ প্ৰাণী আমৱা, লোভে অৰু হয়ে তোমাৰ আশ্রয়ে ছুটে এসেছি বলে আমাদেৱ অপৰাধ নিয়ো না প্ৰড়ু, আমাদেৱ তুমি রক্ষা কোৱো।’

মানিক হেসে বললে, ‘এই পাথৰে গড়া জড়দেবতাৰ যদি রক্ষা কৰিবাৰ শক্তি থাকত, তাহলে ওক্ষারধাম আজ শুশান হয়ে যেত না।’

অমলবাবু কুদু কঠে বললেন, ‘মানিকবাবু, তীৰ্থক্ষেত্ৰে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনই সৰ্বনাশ হবে।’

মানিক বললে, ‘সৰ্বনাশ যদি হয়, তাহলে ওই পাথৰেৰ দেবতাৰ জন্যে কিষ্টয়ই হবে না, আমাদেৱ নিজেদেৱ বুদ্ধিৰ ভূলেই হবে।’

মানিকেৰ মুখেৰ কথা শেষ হওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গেই আসন স্কলাৰ কলিমাখা স্তুতাকে বিদীৰ্ঘ কৰে আচম্ভিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকেৰ শব্দ ও তীৰ আৰ্তনাদ! তাৰপৰেই আবাৰ বন্দুকেৰ শব্দ!

অমলবাবু ও মানিকেৰ সচকিত দৃষ্টি পৰম্পৰেৰ মুখেৰ দিকে ফিৰল!

মানিক ত্ৰস্ত শব্দে বললে, ‘শব্দগুলো এল বাংলোৰ দিক থেকে!’ বলেই সে বেগে ডাকবাংলোৰ দিকে ছুটে চলল—তাৰ পিছনে অমলবাবু!

বাংলোৰ হাতাৰ মধ্যে ছুকেই দেখা গেল, সুন্দৰবাবু খুব ব্যস্ত ভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতৱ্য থেকে বেৱিয়ে আসছেন!

মানিক তাড়াতাড়ি শুধোলে, ‘এখানে বন্দুক ছুড়লে কে? আৰ্তনাদ কৰলে কে?’

সুন্দৰবাবু বললেন, ‘আমিও তোমাদেৱ ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা কৰতে চাই?’

—‘জয়স্ত কোথায়?’

—‘সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল’

মানিক চিংকার করে ডাকলে, ‘জয়স্ত! জয়স্ত!’

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, ‘সুন্দরবাবু, আপনি ওইদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু আপনি ওইদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেবাইছি!

তিনজনে তিন দিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনও মানুষের চোখ অঙ্ক করবার মতো অঙ্ককার সৃষ্টি করেনি—শেষ পাখির দল তখনও বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কষ্ট আর শোনা যাচ্ছে না, মীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরঙ্গলভবের দীর্ঘশ্বাস!

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীত কষ্টস্থর শোনা গেল—‘মানিক! অমলবাবু! এইদিকে এইদিকে!’

মানিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপি!

‘কী সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?’

‘হ্যাম, এ কী কাণ্ড! জয়স্তের টুপি এখানে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু জয়স্ত কোথায়?’

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টেচিয়ে উঠলেন, ‘এখানে এত রক্ত কেন?’

মানিক উদ্ব্লাস্তের মতো আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল। আড়ষ্ট চোখে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, ‘এ কার রক্ত?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘কিন্তু জয়স্ত কোথায়?’

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললেন, ‘মহাকালের অভিশাপ! মানিক তোমার নাস্তিকতার ফল দ্যাখো!’

পাথরের সিনেমা*

আরও অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়স্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দারোয়ান হাতি সিং ও দলের অন্যান্য চাকর-বাকরারও এসে পড়েছে।

সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অঙ্ককার সেখানে গাঢ় হতে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্টলের লঞ্চনের প্রথর আলোকে চারিদিক সম্মজ্জল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল টেঙ্গিয়াও শৰ্ক বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, ‘হায় হায়, মগের মুল্লকে এসে জয়স্ত শেষটা প্রাণ হারাল!’

মানিক মাথা নেড়ে বললে, ‘আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়স্ত হয়তো এখনই ফিরে আসবে!’

*ওঙ্কারধাম সমষ্টিকে এ উপন্যাসে যা বলা হয়েছে তা লেখকের কপোলকঞ্জিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্তা। ইতি লেখক।

অমলবাবু বললেন, ‘আমার তা মনে হয় না। দু-দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্য! আর ওখানে জয়স্তের টুপিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?’

মানিক বললে, ‘দেখা যাক, জয়স্তের পদ্ধতিতেই কোনও রহস্য আবিষ্কার করা যায় কি না!’

যেখানে টুপিটা পড়ে ছিল সেখানে গিয়ে সে আগে টুপিটা তুলে নিলে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপির দুদিকে দুটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপির ভিতরেও রক্তের দাগ! সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মানিক নিরাশ কষ্টে বললে, ‘আর কিছু পরীক্ষা করা যাবে না! জয়স্তের মাথায় লেগেছে শক্র গুলি।’

অমলবাবু বললেন, ‘তাহলে গুলি থেয়ে জয়স্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?’

—‘জয়স্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে বলে মনে হয় না।’

অমলবাবু বললেন, ‘দশজন সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাতে আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না বলে নির্বাধ আর গৌয়ার বলাই উচিত। জয়স্তবাবু নিশ্চয়ই এ-শ্রেণির লোক নন।’

—‘সে কথা সত্যি। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত?’

—‘এখানে জয়স্তবাবুও নেই, শক্ররাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?’

—‘অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়স্তকে ধরেও শক্ররা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাকতিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাকিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়স্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে দুটো জিনিস চুরি যাবে না।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘এখানে রয়েছে জয়স্তের রক্তমাখা টুপি, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত দূরেও মাটির উপরে রক্তের দেউ বইছে! আমার কী ভয় হচ্ছে জানো মানিক?’

—‘কী ভয় হচ্ছে?’

—‘আমরা দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধরো, জয়স্ত জানতে পারবার আগেই শক্রের প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে পড়ে যায় আর তার টুপিটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ওইদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম। সে যখন ওইখানে গিয়ে পৌঁছেছে তখন শক্রদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অঙ্গান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত বেশি রক্ত বেরিলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুনিশে কাজ করে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মানিক, খুব সত্ত্বে আমাদের বন্দু আর বেঁচে নেই।’

গভীর দুর্যোগে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুলকষ্টে বললেন, ‘কিন্তু জয়স্তবাবুর দেহ কোথায় গেল?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্যে শক্ররা জয়স্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।’

ওকারধামের মন্দির-চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি দিয়ে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে এবং জঙ্গলের বোৰা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানারকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিষ্কাস-উচ্ছাস।

মানিক খানিকক্ষণ সুন্দরির মতো বসে থেকে হঠাতে পাগলের মতো চিংকার করে বলে উঠল, ‘প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!'

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্ম! আমারও ওই কথা! এখন আর পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়স্ত্রের হত্যাকারীদের!'

অমলবাবু বললেন, ‘কিন্তু কোথায় তারা?’

মানিক বললে, ‘অমলবাবু, যে তাঙ্গা মন্দিরের ভিতর থেকে আগমনি বৃক্ষ টিটা এমেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো?’

—‘নিশ্চয়ই আছে!’

—তাহলে তাঙ্গিতলা গুছিয়ে নিয়ে এখনই চলুন সেইদিকে!

—‘তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হবে না?’

—‘অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চার্চিটা পায়নি, কিন্তু চাকতির নকশা তো পেয়েছে! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ওইদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।’

—‘কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান আর ইনকে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।’

—‘এটা আপনার ভূল বিষাস। পদ্মরাগ বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত—জানত না কেবল পদ্মরাগ বুদ্ধের ঠিকানা। নকশা পেয়ে তারা এখন সদলবলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘মানিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। চলো, চলো,—আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শক্ররা ততই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনই যাত্রা করতে হবে।’

সবাই যখন শক্রদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ডাকবাংলোর ছাদে একটা পঁচাচা বসেছিল, হঠাতে এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝটপট ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্ম—পথে পা বাঢ়াতে না বাঢ়াতেই পঁচাচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!’

মানিক দৃঢ়তিত স্থরে বললে, ‘জয়স্ত্রকে যখন হারিয়েছি, তচ্ছ পঁচাচার ডাকে আমাদের আর কী অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?’

—‘যা বলেছ মানিক! জয়স্ত্র যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাৰিকাহীন জাহাজের মতো! কপালে এও ছিল—হ্ম!

এবারে আর ঝাপসা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছাঁটা পিছনে রেখে ওক্তারধামের পঞ্চড়া অঙ্ককারে গড়া পঞ্চন্তসের মতো মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কী অবাস্তবই দেখাচ্ছে!

অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওক্তারধাম। তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্যুকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লঠনের আলোতে চলাস্ত ও সুদীর্ঘ কংকাণ্যার সৃষ্টি করে হৈঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হৈঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্ণ-তরবারি হাতে করে দলে দলে হাজার হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের

ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগত এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ বলেই মনে হয়!

দূর-পায়ে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওক্তারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চতুরের ভিতর দিয়ে অগ্নসর হচ্ছিল!

অমলবাবু যেন আপন মনেই বললেন, 'রাজা ইন্দ্রবর্মণের পুত্র যশোবর্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্যও ছিল অসাধারণ! তিনি নাকি নিরন্তর হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ সংহার করেছিলেন!

তাঁর কীর্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো বৎসরের ভিতরেই এখানকার বিরাট নগর গড়ে সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব বলেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্মণ যে বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অমানুষিক বললেও চলে।

ওক্তারধামের বয়স তখন পুরো এক বৎসরও হয়নি। ভারত রাহ সম্বুদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হাঠাঁ একরাত্রে সৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

প্রাসাদের বাহিরে যেসব প্রহরী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীরা সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে চুকতে লাগল পঙ্গপালের মতো দলে দলে। ভিতরের প্রহরীরা প্রাণভয়ে কে কোথায় সরে পড়ল তার কোনও সন্ধানই মিলল না!

বিদ্রোহীদের জয়ধনিতে মহারাজ যশোবর্মণের ঘূম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল দুইজন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্রোহীরা দলে খুব ভারী ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিনজনের বেশি লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপ্র ছিল না।

মহারাজ যশোবর্মণ বিপুল বপু নিয়ে সেই পথ জড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মতো অসিচালনা করতে লাগলেন—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মতো মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে।

যশোবর্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহাকৃতের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে চুকতে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত রাহ তখন মহাবিক্রিমে যশোবর্মণকে আক্রমণ করলেন—দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারত রাহের মৃতদেহের উপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে, শুন্মে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!

হাতি সিং ও আর চারজন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লঠন নিয়ে অগ্নসর হচ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে সরে সরে যাচ্ছে ছায়াময় অঙ্গকার।

সে আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তরমূর্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধরে পাশাপাশি বসে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোনও কোনও দানব শতাব্দী ধরে প্রকাণ শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন আস্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে পড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, ‘আগে এমনি পাঁচশো চলিশটি দানব এখানকার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওকারধামের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মন্মেষ্টের চেয়ে তা দুগুণ বেশি উচ্চ! আর তার অন্য চারটি শিখরও বড়ো কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়শো ফুট করে! আর চারিদিক ঘিরে ওই যে খাল চলে গেছে, তাও চওড়ায় দুশো ত্রিশ ফুট!’

সর্পমূর্তি চোখে পড়ে চতুর্দিকেই।

এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওকারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওকারধামের প্রথম রাজা কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি পড়েছে সেখানেই জ্বলাত করেছে অসংখ্য হাতির মূর্তি।

এখানেও তাই। সর্বত্রই এত হাতি যে দেখলে অবাক হতে হয় এবং অধিকাংশ মূর্তিই জীবন্ত হাতির মতোই মস্ত বড়ো! এমন বহু সব মূর্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানত না—তাদের ধৈর্যের পরমায় ছিল অক্ষয়!

যেন তারা জন্মজ্ঞানের ধরে মূর্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না! এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলেমাটির মতো! তাদের হাতের মাঝা-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুঁয়ে-দুয়ড়ে অতি সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামতো যে-কোনও আকার ধারণ করতে বাধ্য হত! এ বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ছান হয়ে যাবে!

দোয়ালের গায়ে গায়ে পাথরের খোদা ছবিই বা কত!

সেই ছবির পর ছবির সারি মাপলে নিশ্চয়ই এক মাইলের কম হ্রাস না! কোথাও মন্ত হস্তীরা খেয়ে চলেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামক্ষেত্রের দুশোর পর দৃশ্য, কোথাও গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ করছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রক্ষণশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিসের বিকিনি চলছে, বাজিকরা হরেক রকম খেল দেখাচ্ছে এবং সম্বন্ধ বাজিরা যোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কী এক খেলায় নিযুক্ত হয়ে আছেন!

রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পঞ্চিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরানি-দুয়োরানি, সখীর দল, বাঁদি ও তীর্থযাত্রী—কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্যুদ্ধ, হস্তযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচকাওয়াজ শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘৰ-সংসার,—শিল্পীর বাটালি কোনও কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি!

মহাকালের আদ্শা হস্ত কর শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এমন বিংশ শতাব্দী বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখমাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র।

প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত-পূর্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চপ্পল হয়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরাভিনয় করছিল, বর্তমানের শুন্দি মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তুতি হয়ে গেছে আচম্ভিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত!

যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তির আর ছুটবে না! ঘায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হতে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের মেসব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনও মাটিতে পড়বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিকৰ্ণে, সেই বিদেশি শক্রদের সঙ্গে তাদের আর কোনও দিন দেখা হবে না, রাজসভার মধ্যে সিংহসনের উপরে ছব্রের তলায় মহারাজ বসেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট, সবাই চির-বোবা।

আরও কত যুগ আসবে, আবার চলে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির লুপ্ত সভাতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনও এমনি স্তুতি ও আড়ষ্ট হয়েই এখানে বেরিজ করবে।

সুন্দরবাবু সবিশ্বায়ে বলে উঠলেন, ‘হ্ম! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গঞ্জের ছবিই এখানে রয়েছে!’

অমলবাবু বললেন,—‘সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জানত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি খুদে রাখতেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত’।

মানিকও এই শিলায় নৃতন জগতে এসে বিশ্বিত হয়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নৃতন স্বদেশে এসে বিশ্বিত না হয়ে থাকতে পারে কে? কিন্তু সে বিশ্বয় তাকে বেশিক্ষণ অভিভূত করে রাখতে পারেনি। তার মাথায় ঘুরছে কেবল জয়স্ত্রের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা হা করে উঠছে!

অমলবাবুর কোনও উভিই ভালো করে তার কানে চুক্কিল না, শুন্য দৃষ্টিতে চারিদিকের শিরককজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে হনহন করে এগিয়ে চলল,—লঠনের আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে পড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধ-ফোটা আলোতে চারিদিক থমথম করছে।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত পাথরের হাতির পর হাতি সারগোথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাতে তার হিঁশ হল, এর পরে কোন দিকে যেতে হঁকে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গেলে সন্দীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মানিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে সন্দীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তদ্বাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিয়াময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রিদানবীর ফিসফিস কানাকানি! জীবন্ত জগতের আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

চতুর্দিকের নিষ্ঠুরতা আচম্ভিতে, আর যেন চুপ করে থাকতে না পেরে, পাগল হয়ে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

চমকে উঠে মানিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো!

পিছনে অনেক লোকের গোলমাল!

আবার দুবার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে সুন্দরবাবুর চিৎকার শোনা গেল—‘মানিক! মানিক!’

মানিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাত একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাপিয়ে পড়ল এবং কোনও কিছু বোবাবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দুখানা বড়ো বড়ো চ্যাটিলো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শক্তিকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মানিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মানিক তা জানে না, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুচিত্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুইপাশে বসে আছেন এবং হাতি সিং বসে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না।

কিন্তু সে উঠে বসবাব চেষ্টা করতেই অমলবাবু বলে উঠলেন, ‘না, না, আপনি আরও খানিকক্ষণ শয়ে থাকুন।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্যম, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শক্তিদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?’

তখন মানিকের সব শ্মরণ হল এবং তার কষ্টদেশ যে বেদনায় টন্টন করছে এটাও অনুভব করতে পারলে।

সে বললে, ‘সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাত আক্রমণ করে কে যেন আমার গলা চিপে ধরেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারকে দেখতে পাননি?’

—‘হ্যম, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা টিকটিকির ল্যাজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পেয়েছিলি কি অমলবাবু?’

—‘না।’

মানিক বললে, ‘আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্ন দেখার ফল?’

—‘কই দেখি! তাই তো হে মানিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা চিপে ধরেছিল? কেন ধরেছিল? সে বাঁটা গেল কোথায়?’

অমলবাবু বললেন, ‘ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না।’

—‘আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল?’

—‘অনেকগুলো লোক। আক্রমণ করেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে

আসেনি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হল! মিনিটখানেক পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচজন লোকের আবির্ভাব, আবার আমাদের বন্দুক ছোড়া—আবার তাদের অস্তর্ধান!’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘আমার মনে হল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না, কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়।’

মানিক ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতর দিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কী যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্চর্ষ ভাবে বললে, ‘নাঃ, ঠিক আছে!’

সুন্দরবাবু বিশ্বিত কঠে শুধোলেন, ‘কী ঠিক আছে, মানিক?’

‘সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা সেলাই করে দিয়েছি। শক্ররা কোনও গতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল।’

অমলবাবু বললেন, ‘তার মানে?’

—‘মানে খুব সহজ। আমি বোকার মতো এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে পড়েছিলুম। তখন একজন কি দুজন শক্র অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনক্ষ রাখার জন্যে বাকি শক্ররা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেল খেলছিল।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘মানিক, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অঙ্গন করে ফেলেও তারা ওই চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?’

—‘এর একমাত্র কারণ হতে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়তে তারা পালিয়ে যায়।’

—‘খুব সম্ভব তাই।’

এমন সময়ে হাতি সিং জমির উপর থেকে কী একটা ছোটো চকচকে জিনিস তুলে নিয়ে মানিককে বললে, ‘বাবুজি, আপনি উঠে বসতেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে পড়ে গেল।’

সেই জিনিসটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুক্তের মতন হয়ে গেল। সেটা আর কিছু নয়, সেই নকশা আঁকা সোনার চাকতি!

কী আত্মত রহস্য।

চাকতি ছিল আগে হতভাগ্য জয়স্ত্রে কাছে, তারপর তাকে হত্যা করে শক্ররা নিশ্চয়ই এই চাকতিখানাকে হস্তগত করেছিল, কিন্তু যে অমূলানিধির জন্যে এত ঝোঁজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিসটাই মানিকের বুকের উপরে অ্যাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন করে?

তাড়াতাড়ি চাকতিখানা নিয়ে লঞ্চনের আলোতে ভালো করে পরীক্ষা করে মানিক হতবাদ্ধির মতো বললে, ‘এ যে সেই চাকতি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্ম, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি।’

খানিকক্ষণ সকলেই বিশ্বয়ে শুরু! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, ‘হয়তো মানিককে যে আক্রমণ করেছিল, ব্যাধাস্তির সময়ে চাকতিখানা তার অজান্তেই পড়ে গিয়েছে।’

মানিক বললে, ‘আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড়ে আশ্চর্য?’

আচরিতে সুন্দরবাবু কী দেখে চমকে উঠলেন!

তাড়াতাড়ি একটা লঠন তুলে ধরে জমির দিকে দৃষ্টিপাত করে বিপুল বিশ্বয়ে বলে উঠলেন, ‘হ্ম! এ আবার কী?’

মানিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত পড়ে রয়েছে—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড়ো ছোরা বা ছোটো তরবারির মতো অস্ত্র এবং মানুষের হাতের সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যন্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ দেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মানিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ‘মানিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায়নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কী?’

মানিক ভীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধরে আঙুলটা দেখে বললে, ‘আঙুলটা কীরকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো! এ আঙুল যাই হোক, তাকে খুব দ্যাঙ্গা আর বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়।’

অমলবাবু সচকিত কষ্টে বললেন, ‘শক্রদের দলে চ্যান আছে কি না জানি না, কিন্তু খুব দ্যাঙ্গা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যানকেই আমার মনে পড়ে?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘ধরে নেওয়া যাক, চ্যান সকলের চোখে ধূলো দিয়ে কোনও রকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধরে নেওয়া যাক, চ্যানই গলা টিপে মানিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল বলি দিলে কে? মানিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি লড়াই করেছিলে?’

মানিক বললে, ‘লড়াই করব কী, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাইনি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ওই ছোরাতেই আঙুলটার উচ্চেদ হয়েছে! ওরকম দুধারে ধার দেওয়া ছোরা কখনও আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শক্রকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে থাকে, তবে সে-ও পালিয়ে গেল কেন? তাকে তো আমরা বন্ধু বলে পরম সমাদর করতুম! আর এই অজ্ঞান মুহূর্কে বন্ধুই বা পার কোথেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খসে পড়ে গু।’

অমলবাবু বললেন, ‘এক হতে পারে, পদ্মাবত বুদ্ধের লোভে ওই স্মোর চাকতিখানার জন্যে শক্ররা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেছিল।’

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘ওসব বাজে কথা! শক্ররা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মানিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা তৃতে পারে না! হ্ম, এসব হচ্ছে ডাহা ভূতুড়ে কাও! এ জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মতো! এখানকার আনাচে কানাচে ভূতের আজ্ঞা আছে।’

মানিক বিষণ্ণ কষ্টে বললে, ‘এ যদি ভূতুড়ে কাও হয় আমি তাহলে বলব, জয়ত্বের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে।’

সুন্দরবাবু তখনই টপু করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অভ্যন্ত ভালোবাসি কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাসার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না! ওঠো মানিক, উঠুন অমলবাবু।’

মানিক গাঠোখান করে বললে, ‘হ্যাঁ, এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না করেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।’

সুন্দরবন্বয় বললেন, ‘খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শক্ররাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছে! তারা যে সাহস করে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক। ...আরে গেল, এই হাতি সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছে কেন? যদি ফস করে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন করে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো।’

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল।

রাত পোয়াল, উষার সিঁথায় দিবস-বধূ সিদুর-লেখা লিখলে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত দুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা করে গহন বনের ঠাণ্ডা বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্যচিতার রক্ত-শিখা জুনে উঠল, বাতি আবার তার অঙ্ক কুরুরির দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের প্রথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মতো নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা।

মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিশ্বার করে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগডালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কী বলে ওঠে এবং কৌতুহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধ করি আশ্চর্য হয়ে ভাবে—‘এরা আবার কোন দেশি বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে রাখে কী কতকগুলো সাদা সাদা জিনিস, দু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন দেশি বানর?’

মাঝে মাঝে বাঁশবন দুলে দুলে ওঠে, মড়মড় করে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতির দল ওখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপ-ঝাপের উপর দিয়ে তৈরি একটা গতির রেখা সশঙ্কে চলে যায়—একটা চাপা গর্জনও শোন যায়, বনের মধ্যে অশাস্ত্রিক অনাঙ্গত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্য জন্ম দূরে সরে গেল!

মাঝে মাঝে মানুষের ঘণ্টা পায়ের শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোঁফিয়ে সাপের ঘূম ভেঙে যায়, ফোঁস করে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে ভুলস্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিকঠে পড়ে এবং পর মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়।...এবং সর্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যান্দের দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাদের অশ্রাঙ্গ অস্তিত্বের ধ্বনি!

কে যেন নিরালায় কানাকানি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিসফিস করে কথা বলছে; কে যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে অতি সন্তুষ্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে।

গভীর দূর বিস্তৃত নানা শব্দময় প্রত্যেক অরণ্যেই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ!

কোনও অরণ্যেই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সন্তানগ জানায় না। বনবাসী কোনও জীবই মানুষকে বন্ধ বলে মনে করে না। কল্পনায় নির্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে।

পদে পদে বিপদের সত্ত্ববনায় মানুষ চমকে ওঠে! বোধ হয়, প্রতোক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কঠ থেকে!

সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাঞ্চ বলে সন্দেহ হয়। সূর্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছয়বেশ পরাতে ঢেঠা করে বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর অঙ্ককারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ?—অরণ্যের যতো ভয়কর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কানে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভাষিকাময় আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অঙ্ককার সহনীয়!

আর-একটা দৃংশ্পময় রাত্রির পরে এল নিষ্ক শাস্ত প্রভাত।

অমলবাবু বললেন, ‘আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সক্ষ্যাত আগেই ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌঁছাতে পারব।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘কিন্তু শক্রদের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।’

মানিক বললেন, ‘কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সমস্ত আর সাবধান বলেই তারা এখনও সামনে আসছে না।...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। কে যেন পায়চারি করে বেড়াচিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ করে কেটে নিতুম!'

মানিক বললেন, ‘তার নাক নিয়ে আপনি কী করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাদা, তবু তার নাক টিকলো হলেও আপনার অভাব তো দূর হত না?’

সুন্দরবাবু খুশি হয়ে বললেন, ‘এরকম ঠাণ্ডা আমি পছন্দ করি না! আমার নাক খ্যাদা? কে বললে তোমাকে? আমার নাক খ্যাদা নয়।’

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল!

কেবল মাঠে নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে খিরবির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী এবং তার তীরে তীরে চরে বেড়াচ্ছে একরাঁক পাখি!

সুন্দরবাবু খুশি গলায় বলে উঠলেন, ‘বনমুরগি! এসো মানিক, কেবি যাক ভগবান আজ আমাদের বনমুরগির মাঝে খাওয়াতে পারেন কি না।’

মানিক মাথা নেড়ে বললেন, ‘না সুন্দরবাবু! জয়স্ত মুরগির মাংস খেতে ভালোবাসত! সে যখন নেই, আমার মুখে ওমাংস আর কুচে না।’

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুরগিগুলো তখনই উড়ে পালাল! সুন্দরবাবু হতাশ তাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্ত খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে ফেঁস করে একটা নিষ্পাস ফেললেন।

মানিক বললেন, ‘দেখুন সুন্দরবাবু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।’

—‘হ্য! সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি?’

—‘আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি! ইচ্ছা করলে এখনই আমরা দেখতে পারি, শক্রবা আশ্রমে শিছু পিছু আসছে কি না? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি।’

—‘কী করে শুনি?’

—‘এই মাঠটা দেখছেন তো? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন! আমরা এখনই ওপারের বনে গিয়ে চুকব। তারপর না এগিয়ে ঝোপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চূপ করে বসে থাকব।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘খাসা মতলব এঁটেছ ভায়া! শক্ররা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহলে তাদেরও এই মাঠ পার হতে হবে। এখানে লুকোবার জায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম গুড়ুম রবে গর্জন করে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি?’

—‘ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!’

—‘ওসব শক্রকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চলো, এখন তোমার কথা মতোই কাজ করা যাক।’

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য করে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মানিক বললেন, ‘এখানে বেশির ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-চাকা দেওয়া যাক! একটু পরেই হয়তো চ্যান আর ইনের খবর পাওয়া যাবে।’

সকলে একে একে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হল।

সবজে মাঠ ধূ ধূ করছে।

ওদিককার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্যলীলার দর্শক হাপে সূর্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল।

গানের পাখিরাও নীরব হয়ে ছিল না।

১৩১

১৩২

হানা: দেবালয়ের জীবন্ত পাথর

মানিকের অনুমানও ব্যর্থ হয়নি, তার ফলিও ব্যর্থ হল না!

মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হতে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোটো ছোটো!

সুন্দরবাবু দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, ‘এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হ্ম, ব্যাটাদের দলে দশজন লোক আছে। এগুলো হন্হন করে এই দিকেই আসছে। হঁই বাবা, হ্যাঁই দেখেছ ফাঁদ তো দ্যাখোনি! চলে আয়—চলে আয়, চই চই চই! ওরে বাপ রে। কী লস্বা! কী জোয়ান! যেন ঘটোঁকচের বাচ্চা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়গুড়ে বেঁটেরাম সর্দার, পায়ে হেঁটে চলেছে, না ফুটবলের মতো মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?’

—‘কই, দেখি দেখি’ বলে সাথেই অমলবাবু দূরবিনটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় এক রকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই বলে উঠলেন, ‘ওই তো চ্যান! ওই তো ইন! সাত ঘাটের জন্ম ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে ও পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়সুবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস, আমাকেও বধ করতে এসেছিল! অঁঁঁঁঁ! চানের বাঁ হাতে যে ব্যাডেজ বাঁধা! তাহলে পরশু রাতে মানিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতি সিং, বন্দুক ছোড়ো! হতভাগাদের পাগলা কুকুরের মতো মেরে ফ্যালো।’

প্রভুর হস্ত পালন করবার জন্মে হাতি সিং তখনই বন্দুক তুললে, কিন্তু মানিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, ‘বন্দুক নামাও হাতি সিং, আমি যখন বলব তখন ছুড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়েই উত্তেজিত হয়েছেন, শাস্তি হোন! ওদের আরও কাছে আসতে দিন!’

অমলবাবু চঁচিয়ে বললেন, ‘উত্তেজিত হব না—বলেন কী? যমদূতদের দেখলে কি শাস্তি হয়ে থাকা যায়?’

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুশে বললেন, ‘অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি। অত চাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?’

তখন অমলবাবু লজিত হয়ে বললেন, ‘মাপ করুন, আর আমি কথা কইব না!’

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তারা সবাই হয় বর্মি, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্বাঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চানের অসম্ভব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কটা আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মানিক বললে, ‘আসুন, এইবাবে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়ের দিকে গুলি করে ওদের অকর্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই—কী বলেন সুন্দরবাবু?’

—‘বেশ, তাই সই।’

এইবাবে শক্রোঁ বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, ‘ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করেনি, এইবাবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক।’

মানিক বললে, ‘এইবাবে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জন করতে পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘ওয়ান, টু, থ্রি।’

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি উদ্বাধ করলে,—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্বপ্রথমে ধরাশায়ী হল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্তনাদ করে যে দিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়োতে আরস্ত করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হল।

এবাবে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মতো মাঠের মানাদিকে ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনও রকমে উঠে ভোঁ-দৌড় মারলে!

কিন্তু দৌড়োতে পারছিল না কেবল ইন, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চাঁচাতে চাঁচাতে কোনও রকমে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

তার দুর্দশা দেখে চ্যান আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতোই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়োতে আরস্ত করলে!

অমলবাবু চ্যানকে টিপ করে বন্দুক ছুড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরও দু-একবার গুলিবৃষ্টির পর মানিক বললে, ‘যথেষ্ট হয়েছে, টেটা নষ্ট করে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে, আবার বনবাদাড় ভোঁড় একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে বলে মনে হয় না।’

সুন্দরবাবু মানিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘হ্যা, ব্যাটোরা যত বড়ো শুলিখোরই হোক, আবার শুলি খাবার জন্যে ওরা শীঘ্র বাস্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না—জয় মানিকের বুদ্ধির জয়!’

পথ চলতে চলতে মানিক জিঞ্জাসা করলে, ‘আচ্ছা অমলবাবু, এই পদ্মরাগ বৃক্ষের কোনও ইতিহাস জানেন?’

অমলবাবু বললেন, ‘ঠিক পদ্মরাগ বৃক্ষের ইতিহাস জানি না বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মতো এক মরকত বৃক্ষের কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।’*

মরকত বৃক্ষ নিয়ে তর্ক চলছে।

কেউ বলেন, এখন এই মূর্তি জাপানে আছে। কেউ বলেন, ফর্মোজা দীপে আছে; কেউ বলেন, জাভায় আছে।

ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যঙ্গক শহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বৃক্ষমূর্তি আছে, সেইটিই হচ্ছে প্রবাদপ্রসিদ্ধ মরকত বৃক্ষ।

কেবল মরকত বৃক্ষ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল।

ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইসরা বাস করত বর্তমান শ্যামদেশে। এখনও যারা ওখানে বাস করে তারা ওই থেইসদেরই বংশধর। বারংবার পরাজয়ের পর থেইসরা অবশেষে বিশেষ আয়োজন করে ওঙ্কারধামকে হঠাত আক্রমণ করে।

একটা বড়ো যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদৃত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, ‘তোমার খবর মিথ্যা হলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হলেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছ!’

তগন্তের প্রাণদণ্ড হল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেল না। পুরোহিতেরা নগর রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত বৃক্ষ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিশ্ব আর রাশি রাশি হিরে-মণি-মুক্তা তখনই সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, বিজয়ী থেইসরা সেসব গুপ্তধন খুঁজে পায়নি।

ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের এই পদ্মরাগ বৃক্ষ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কি না, কে তা বলতে পারে?’

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্যালোক তখন অরপের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় চতুর্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জন ও নিষ্ঠক যে, রাত্রির স্তুতার সঙ্গে তুলনা করা চলে!

আরও মাইলখানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছুসিত কঠে বলে উঠলেন, ‘ওই সেই সপ্ত-তালগাছ!’

*‘Aṇḍ in Yasodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it.’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘সপ্ত-তালগাছ আবার কী?’

—‘ওই হচ্ছে আমাদের পথের শেষ নিশান। পাশাপাশি ওই যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা মন্দিরের প্রকাণ বাঁধানো চতুর—অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!’

কিন্তু পথের শেষে এসে মানিকের মনে জয়স্ত্রের শোক আরও বেশি করে জেগে উঠল।

জয়স্ত্রের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ বুদ্ধের জন্যে তার আগ্রহ ছিল অস্বীকৃত। জয়স্ত্র নেই, তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্যোগে করবার জন্যে!

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ বুদ্ধকে সমর্পণ করে সে সর্বাঙ্গে চ্যান আর ইনকে প্রেপ্তুর করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না!

তারা সপ্ত-তালের তলায় এসে দাঁড়াল।

তারপর একটা বাঁশবনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিশ্বাসে দেখলে, তাদের ঢোকের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ।

সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো একটি প্রকাণ চতুর! এবং চতুরের মাঝখানে একটি পুঁকুরিণী। পুঁকুরিণীর এক কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কক্ষ অংশ! মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুরুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, ‘এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হ্যম, বার করো তো মানিক, তোমার সেই সোনার চাকতিখানা!’

মানিক পকেট থেকে চাকতি বার করে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, ‘আপনিই তাহলে নকশার পাঠোদ্ধার করে আমাদের বাহবা লাভ করুন।’

সুন্দরবাবু অবহেলা ভরে বললেন, ‘পুলিশে চাকরি নিয়ে চের চের হেঁয়ালি জলের মতো পড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নকশা মাত্র! হ্যম! নকশায় এই তো রয়েছে পুরুটা, চারিদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নকশায় পুরুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন কোনা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুরুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখিছি না।’

মানিক হাসতে হাসতে বললেন, ‘ও কী সুন্দরবাবু, এই মধ্যে মাথা চুলকোছেন কেন?’

—‘মাথা চুলকোছি কি সাধে? এ নকশাখানা কেউ ঠাণ্ডা করে আঁকেনি তো?’

—‘বোধ হয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আমে মন্দিরের ভেতর চলুন! সেখানে গেলে হয়তো কোনও হাদিস পাওয়া যাবে।’

—‘ঠিক বলেছ। তাই চলো।’

দিনের আলো তখন নিবন্ধিত হবার সময় হয়েছে।

পাখিরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। সূর্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘূর্ম এখনও ভাঙেনি।

মাঝখানে প্রকাণ এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে।

দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ মন্দিরটা অস্ত একক্ষে ফুটের কম উচু ছিল না।

মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্যে আর ছেটো বড়ো মূর্তিতে ভরা।

কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দয়তায়। বড়ো মন্দিরের চারপাশে যে চারিটি ছেটো মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে

যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্রংসের লীলা স্তুতি হয়ে আছে মৃত্যুস্তুতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হাহা করে, চোখে বিমলতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল।

মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে সহজে দূরের জিনিস স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে বলে উপরপানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরজ্ঞ রাগে রঞ্জিত মীলাকাশকে।

মন্দিরগৰ্ভ খুব প্রশংসন্ত, তার মধ্যে বড়ো বড়ো অনেকগুলো হলঘরের ঠাঁই হতে পারে।

ভিতরের চারিকোণে চারিটি মানুবের চেয়েও ডবল বড়ো ‘অবলোকিতশ্বর’ বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি। একটি মূর্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদ্যুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও খোদিত ভাস্তর্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো করে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্তিশূন্য বেদি রয়েছে কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমলবাবু বললেন, ‘ওরই উপরে আমরা সেই ছেউ বৃন্দমূর্তি পেয়েছিলুম।’

মানিক একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘অতটুকু একটি মূর্তির জন্যে এত বড়ো একটা মন্দিরের এত বড়ো কালো পাথরের বেদি গড়া হয়েছিল! সে মূর্তি কখনও এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হতে পারে না।’

অমলবাবু বললেন, ‘আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্তিগুলোই যখন এমন প্রকাণ্ড! আমার বিশ্বাস, বেদির উপর থেকে প্রধান মূর্তিটিকে হয়তো কোনও কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে পূজার বেদিতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোনও ভঙ্গ এই মূর্তিটিকে স্থাপন করেছিল।’

—‘খুব সন্তুষ্ট, তাই।’

সুন্দরবাবু এতক্ষণ নির্বাক ও হতভম্বের মতো নকশার সঙ্গে বেদিটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, ‘কী সুন্দরবাবু নকশা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারিনি।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ, এ হচ্ছে একখানা বাজে নকশা। ক্ষেত্রেও ধাপ্তাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদাগঙ্গারাম, একটুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ বৃন্দ! সোনার পাথরবাটি! যা নয় তাই।’

মানিক চাকতিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগৰ্ভে অঞ্চলের তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

সেই মহা নির্জনতার স্থদেশে, সেই মাঙ্কাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তুতা যেন ঘনায়মান ও হিন্দু অঞ্চলকারের মূর্তি ধরে সকলের প্রাণ-মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল।

উপর দিকে হঠাতে ঝটপট ঝটপট শব্দ হল—নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনাল যেন বন্দুকের আওয়াজের মতো!

চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভরে উর্ধ্বমুখে দেখলেন, ভাঙা

মন্দিরের ফাঁকে তখনও উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলঙ্গ দাগ কেটে কী কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, ‘বাদুড়ি’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘না, অঙ্ককারের কালো বাছা!’

মানিক নিজের মনেই বললে, ‘নকশায় বেদির গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়িফিডি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল, জয়স্তবেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই চলো মানিক।’

—‘পালাব, কেন?’

—‘এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করছে! হম, আমার বুক অকারণে ছাঁৎ ছাঁৎ করে না। এটা নিশ্চয়ই হানা মন্দির।’

মানিক হেসে উঠল—তার হাস্যধনি মন্দিরের অঙ্ককার ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনাল ঠিক অঙ্ককারের হাসির মতো!

সুন্দরবাবু অশ্বত্তিপূর্ণ কঠে বললেন, ‘তুমি হেসো না মানিক। এমন অশ্বাভাবিক স্তুকতা তুমি কখনও অনুভব করেছ? এক মাইল দূরে একটা আলপিন পড়লেও যেন শোনা যায়! এ স্তুকতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছেঁয়া যায়! এ স্তুকতা যেন ওজনে ভারী—বুকে জাঁতাকলের মতো চেপে বসে! এ যেন স্তুকতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তুকতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।’

মানিক কোনও কথায় কান না পেতে মন্দিরের বেদির উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, ‘অমলবাবু, এ বেদির গায়ে কখনও যে কোনও সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না! অথচ নকশায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে! এর মানে কী?’

—‘আমার বোধ হয় এ নকশাখনা অন্য কোনও জায়গার।’

—‘অসম্ভব! নকশার সঙ্গে এখানকার বাকি সমষ্টিই হৃষি মিলে যাচ্ছে! এই সিঁড়ির হয়তো কোনও গুপ্ত অর্থ আছে।’

—‘থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। সুতরাং আমাদের পক্ষে ও-গুপ্তঅর্থ থাকা না থাকা দুই-ই সমান।’

হঠাতে সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, ‘মানিক, মানিক! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাসছে?’
মানিক বললে, ‘কই?’

—‘হাসি আবার থেমে গেল।’

—‘ও আপনার মনের ভুল। আমি কোনও হাসি শুনিনি।’

—‘অমলবাবু, আপনিও শোনেননি?’

—‘না। কে আবার হাসবে, এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।’

—‘হ্যাঁ, শুনিনি বললেই হল? আমি স্পষ্ট শনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারলে না।’

—‘তাহলে আপনার পিছনে ওই যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন।’

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকালেন।

আসন্ন সঙ্গ্যার আবহায়া মেঘে প্রকাশ 'অবলোকিতেষ্঵' দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তর-চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন সুন্দরবাবুর মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর নিঞ্চলাম্বে বিকশিত!

সুন্দরবাবু বিস্ফোরিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্ভিতে বুদ্ধমূর্তি জ্যান্ত হয়ে টলমলিয়ে নড়ে উঠল!

'হ্যম, বাপ!' বলে সুন্দরবাবু সুনীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মানিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন!

অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'বুদ্ধদেব নড়ে উঠেছেন মানিক! আমি ঘচক্ষে দেখেছি!'

মানিক বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে দেখলেন, মূর্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে! সে ভৰ্তসনার স্বরে বললে, 'আগনারা দুজনেই পাগল হলেন নাকি?'

সুন্দরবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে বললেন, 'পাগল এখনও হইনি মানিক, কিন্তু পাগল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই! পাথরের মূর্তি হাসে, পাথরের মূর্তি নড়ে, এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে?'

মানিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্তির গায়ে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন, আমি মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোনও প্রাণ নেই!'

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহ বাড়িয়ে সবলে মানিকের হাত চেপে ধরলে!

আকস্মিক আতঙ্কে আচম্ভ হয়ে মানিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'সুন্দরবাবু! অমলবাবু!'

নৃতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অঙ্গকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মানিককে অমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনই বুঝে নিলেন যে, তয়কর ভূতুড়ে কোনও ঘটনা ঘটেছে! মানিককে সাহায্য করবেন কী, তিনি নিজেই প্রায় মৃহিত হয়ে সেইখানে বসে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্যন্ত রাইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথ্যেচ!

মানিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নেবাসী চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না!

যে-হাতখানা এমন বহুমুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হাত!

মানিক তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার করে ফেললে!

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত নিঞ্চল কঢ়ে শোনা গেল, 'মানিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?'

বিষম বিস্ময়ে মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জ্যান্ত!'

— 'হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ত্বে—আপাতত যমালয়ের ফেরতা মানুষ।'

বলতে বলতে বুদ্ধমূর্তির পিছন থেকে সশ্রারীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুেজ জ্যান্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। এ যে জয়ত্বের প্রেতাঙ্গা সে সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনওই

সন্দেহ রইল না! তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখে দৃষ্টি হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!

মানিক বিশয়ে আনন্দে ও উচ্ছাসে প্রায় অবকুল কঠে বললে, ‘জয়! জয়! তুমি! তুমি বেঁচে আছ!’

—‘এক ভালো গণৎকার হাত দেখে বলেছিল, আমার পরমায় আশি বৎসর। অসময়ে মরিনি বলে বিশ্বিত হচ্ছ কেন তাই?’

—‘কিন্তু তোমার সেই শুলিতে ছাঁদা টুপি, জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অস্ত্রধারণ,—এসবের অর্থ কী?’

—‘মানিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি যে বাড়ল না, এ বড়ে দুর্ভাগ্যের কথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছাঁদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো! যেখানে আমার টুপিটা পড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরিষ্কা করতে, তাহলে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দুকেছি! আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাইনি!’

—‘তবে?’

—‘আমি যখন বাংলার দিকে ফিরছিলুম, তখন শক্তরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাদের বন্দুকের একটা শুলি আমার টুপি ভেদ করে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাত্মে আঞ্চলিক জন্য মাটিতে আছড়ে পড়ে চির পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাৎ মৃত্যুর ভান করলুম। তারপর দশ-এগারোজন লোক আমার কাছে ছুটে এল! আমার জামা হাতড়ে সেলাই করা পকেট কেটে সোনার চাকতিখানা বার করে নিলে। এমন সময় তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।’

—‘কেন?’

—‘আমি জানতুম, তোমরা এই মণ্ডিরের দিকে আসবেই, আর শক্তরা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায়নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে প্রাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেইয়ে পুতুরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আশ্রয় এ সুবিধা হত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবেকোন দিক থেকে।’

—‘এতক্ষণে বুরুলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে?’

—‘হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান যখন তোমার গলা টিপে ধরে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার করে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুগ্মসূর এক প্যাচ কমতেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ হাতের একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোনার চাকতিখানা আমি আবার কেড়ে নি। চ্যান বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোনার চাকতি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখান তোমার বুকের উপর রেখে আমিও অদৃশ্য হই! আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ না কেউ সেখান দেখতে পাবেই।’

—‘কিন্তু জ্যান্ত, তমি কি অনাহারে আছ?’

—‘মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়!.....হঁস্য, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শঙ্কুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে?’

—‘প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।’

—‘বাহবা, চমৎকার! মানিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতগতে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিলুম।’

সুন্দরবাবু অপ্রসম্ভ মুখে বললেন, ‘হ্যম, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?’

—‘মোটেই ভয় দেখাইনি। আপনার ছেলেমানুষি ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে খেপে গেলেন।’

—‘খামোকা শ্রেণিনি। পাথরের বৃক্ষ জ্যান্ত হলে কে না—’

—‘মৃত্তিটাই নড়বড়। কতকালের পুরোনো ভাঙা মূর্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনি একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না।’

—‘না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই।’

—‘সে কী, এখনই পালাবেন কোথায়? এখনও যে পদ্মরাগ বৃক্ষ লাভ হয়নি।’

—‘হঁস্য়! সে লাভের আশায় গয়া! সে নকশার কোনও মানে হয় না! এখন ‘লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং’ করেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে।’

—‘সুন্দরবাবু, নকশার মানে আমি বুঝেছি বলেই কলকাতা থেকে এত দূরে চুটে এসেছি।’

অমলবাবু সবিশ্বাসে বললেন, ‘নকশার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন?’

—‘হঁস্য অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে শুনলুম যে, নকশার সিডি আছে অর্থ বেদির গা বয়ে কোনও সিডি আপনি দেখেননি, তখনই তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম। এখন দেখা যাক, আমার আন্দজ ঠিক কি না!.....(উচ্চস্বরে) ওহে হাতি সিং! তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এসো! বড়ো অঙ্ককার, আগে আলোগুলো জুলো।’

হাতি সিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লঠন জালা হল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনও উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেনি।

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, ‘আং, আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল। এখন দেখছি বাইরেই অঙ্ককার! হ্যম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না।’

জ্যান্ত বললে, ‘বেদিটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মানিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহলে বেদিটা বুঝতে তোমার কোনওই কষ্ট হত না!...হাতি সিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদিটা ভেঙে ফেলতে বলো।’

হাতি সিং-এর অনুচরেরা তখনই বেদি ধ্বংসে প্রবৃত্ত হল—অন্য সকলে বিপুল কৌতুহলে আগ্রহদীপ্ত চক্ষে তাদের কাণ দেখতে লাগল।

জ্যান্ত বললে, ‘পাথরের বেদি যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।’

ঠঁ ঠঁজা ঠঁ ঠঁজা ঠঁ—কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিষ্ঠক মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গমগম করে উঠল!

শব্দের চোটে সেই নড়বড়ে বৃদ্ধমূর্তি আবার কাঁপতে শুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কঁটা দিলে!

বেদিটা গাথা ছিল কয়েকখনা বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে।

এক-একখনা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায় বেদির তলা ফাঁকা, কিন্তু অঙ্ককার তরা গর্ভ ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে!

জয়স্ত বললে, ‘ব্যাস, আর পাথর সরাতে হবে না! হাতি সিং, একটা লঠন উঁচু করে তুলে ধরো তো!’

হাতি সিং ভাঙা বেদির গর্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লঠন তুলে ধরলে!

উকি মেরে দেখা গেল, গর্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়স্ত উৎফুল কষ্টে বললে, ‘এখন বুঝতে পারছ তো মানিক, যে রহস্য ঢোকে দেখা যায় না, সোনার চাকতির নকশা তাই একে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নকশা যদি বাজে হত, তাহলে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন করে বৃদ্ধমূর্তির মধ্যে রক্ষা করা হত না! পদ্মরাগ বুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চলো।’

অমলবাবু অভিভূত কষ্টে বললেন, ‘জয়স্তবাবু, আশ্চর্য আপনার বুদ্ধি!’

জয়স্ত বললে, ‘বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য।’

সুন্দরবাবু খুঁত খুঁত করতে করতে বললেন, ‘তাই তো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! এই পাতালের ভিতর চুকলে আবার বেরতে পারব তো? ওখানে কোন ভয়ঙ্কর ওঁত পেতে আছে, তা কে জানে?’

মানিক বললে, ‘তাহলে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করন।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘একলা? বাপরে, তাও কি হয়? ‘পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!’ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব—যা থাকে কপালে! হ্যাঁ!’

জয়স্ত বললে, ‘আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্টেলের লঠন আছে। সবগুলোই জেলে ফালো। পাতালের অঙ্ককারে যত আলো তত ভালো।’

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপানশ্রেণি দিয়ে নামতে লাগল।

পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হল।

তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অঙ্ককারের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।

পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে।

ওহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহস্র আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চিংকারে আর্তনাদ করে পায়ে পায়ে দূরে সরে যেতে লাগল, সভয়ে!

সেখানকার বহুকালব্যাপী নিন্দিত স্তুর্তাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট খট শব্দে যেন অত্যন্ত যাতন্য ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল!

সুন্দরবাবু সফুচিত সন্দেহে ওহাপথের বদ্ধ হাতওয়া শশদে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, ‘হ্যাঁ! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে গুঁক পাই, এখানেও আমি যেন সেই রকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি।’

অমলবাবু বললেন, ‘এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আগনি বিষাক্ত বাস্পের গন্ধ পাছেল!’

—‘উহ, এ বাস্প-টাপ্পর গন্ধ নয়।’

মানিক বললে, ‘তাহলে এটা বোধ হয় ভূতের পায়ের দুর্গন্ধ।’

সুন্দরবাবু চটে বললেন, ‘ঠাণ্ডা কোরো না মানিক, ওরকম ঠাণ্ডা আমি পচন্দ করি না! হ্য! এখানে যে ভূত নেই তা কী করে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি মনোরম হান! আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায় থাকবে?’

মানিক আবার টিপ্পনি কাটলে, ‘কেন, আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওখানে নিত্য নতুন ভূতের জন্ম হয়।’

জয়স্ত সর্বাপ্রে যাচ্ছিল। ইঠাঁ সে দাঁড়িয়ে পড়ে গভীর স্বরে বললে, ‘সাবধান! আর কেউ এগিয়ে না।’

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায় পায় পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না!

মানিক বললে, ‘কী ব্যাপার, জয়?’

—‘কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।’

মানিক কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অস্তুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে! কেবল অস্তুত নয়, ভয়াবহ!

—‘ও কীসের শব্দ, জয়?’

—‘ঠিক বুঝতে পারছি না! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে... না, যাচ্ছে নয়, টানতে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।’

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে কাতর ভাবে ঘনে ঘনে বললেন, ‘হা ভগবান! এই ডানপিটে ছেঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কী ভুলই করেছি! আর কি দেশে ফিরতে পারব? হ্য়।’

বৃক্ষ শরণং গচ্ছামি

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

ততকালের বন্ধ আলোহরা বায়ুহরা সুড়ম্পথ, সমাজির চেষ্টাও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবস্তু জীবের আবর্তিব অসম্ভব, সেখানে এ কী অভিবিত ব্যাপার?

জয়স্ত চূপি চূপি বললে, ‘মানিক, ব্যাপার বড়ো সুবিধের নয়, বন্দুক তৈরি রাখো।’

সৃড়ঙ্গপথের ভিতরে তার চূপিচূপি কথাই শোনাল চিৎকারের মতো!

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্যা, বন্দুকই তৈরি রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন কৃষ্ণকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধরে ঘুমিয়ে ছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ করে দিলুম আমরা তার ঘূম ভাঙিয়ে! বন্দুক ছুড়ে করবে কী? বন্দুকের গুলিও তো হজমি গুলির মতো কপকপ করে গিলে ফেলবে।’

জয়স্ত ও মানিক কিংকর্তব্যাবিমুক্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তা টোনার মতো শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুমদুম করে খুব ভারী ভারী জিনিস আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়স্ত এসব শব্দের কোনও হিসেব খুঁজে পেলে না! এ যেন কার আশ্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু কুন্দলস্থানে বললেন, ‘জয়স্তবাবু, সেকালে শুণ্ঠন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হত বলে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্যি? যে আসছে সে কি যক?’

জয়স্ত বললে, ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোনও বৌদ্ধ প্রয়োহিত সে মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্যি কি না জানি না,—সত্যি না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্যি হলেও এখানে যক কেউ রাখেনি।’

—‘তবে ও কে আসছে?’

—‘ভগবান জানেন।’

এইবার ভীষণ একটা গর্জন শোনা গেল!

৩৫৮

বন্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অস্তুত শোনাল যে, সেটা কীসের গর্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘হ্যাঁ! ক্রমাগত চমকে চমকে আজ মারা পড়ব নাকি? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চলনুম আমি উপরে! এর চেয়ে ওপরের অঙ্ককারে বসে ভয় পাওয়া ভালো, বনের বাঘ-ভাঙ্গকের পেটে যাওয়া ভালো।’

তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যথানকার নিরেট অঙ্ককারের গায়ে ঠেকে লঞ্চনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎখণ্ডের মতো দুটো জুলন্ত চক্ষু!

সে বিচিত্র চোখ দুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিবছে না!

জয়স্ত বললে, ‘আজ আর গেঁয়ারতুমি করা নয়! মানিক, আজ আমাদের ফিরতেই হবে—এখনও সময় আছে! সকলে মিলে পরামর্শ করে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে! চলো, আমরা বাইরে যাই।’

—‘কিন্তু ওসব কীসের শব্দ, ও কার গর্জন, ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না!’

—‘বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয়! শিগগির উপরে চলো।’

সকলে দ্রুতগতে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙ্গ বেদির গুঁড় হেলান দিয়ে মড়ার মতো হলদে মুখে সুন্দরবাবু চূপ করে বসে আছেন।

মানিক বললে, ‘সুন্দরবাবু, আজ আপনারই জয়জয়কার। পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক।’

সুন্দরবাবুর তখন উভার দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়স্ত বললে, ‘আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দশপদপে চোখ নিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে! চলো, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে।’

অমলবাবু বললেন, ‘তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাহানে রেখে গর্ত আবার বন্ধ করে দিলে কি হয় না?’

—‘না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ! এই আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হড়মুড় করে ঠিকরে পড়বে!’

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, ‘জয়স্ত্রের প্রস্তাবই যুক্তিসংগত। পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!’

জয়স্ত্র বললে, ‘ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্যি হয়! ও-পাপ বিদেয় হলে তো সব লাঠা চুকে যায়।’

সুড়ঙ্গের গর্ত ভেদ করে আবার একটা বুকের রক্ত ঠাণ্ডা করা গভীর গর্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপূল ক্ষুধার ভাব! যেন আসম মৃত্যুর গর্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্ফুরিত হয়ে যায়!

জয়স্ত্র সচকিত কষ্টে বললে, ‘সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তলিতলা, ছোটো বনের দিকে।’

রাত তখন বেশি নয়, কিন্তু এই মধ্যে বনবাসিনী নিশ্চিধিনীর নিদুটি মন্ত্রে চতুর্দিকের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বায়ে আনছে দূর বনের আর্তধৰণি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোটো মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়স্ত্র বললে, ‘মানিক, ভাগিয়স বুদ্ধি করে সঙ্গে বিষাঙ্গ যাঙ্গের বোমা এনেছিলুম।’

—‘কেন বলো দেখি?’

—‘কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছড়ে দেখব কোনও ফল হয় কি না।’

—‘যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোনও জীব না হয়?’

—‘মানে?’

—‘ওটা কোনও ভৌতিক কাঁও হওয়া কি অসম্ভব?’

—‘মানিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভড়তে চাও?’

—‘ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোনও জীব বাঁচতে পারে?’

—‘না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোনও স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনো না মানিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।’

১: বোধ হয় তখন শেষ রাত।

আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপরে সকলে বসেছিল অধিনন্দিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির শুক্রতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমনকি মানিকের মত হচ্ছে, তাঁর নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে-গাছের সব পাখি ও বানর তো দূরের কথা, এমনকি ভূত-পেতনিরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচ্ছিতে উপর-উপরি দু-দুবার বক্সুকের শব্দে সকলের তত্ত্বা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চমকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ করে ডাল থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হৈশিয়ার ব্যক্তি বলে ধরাতলে অবর্তীর হবার আগেই খপ করে আর-একটা ডাল ধরে ফেলে শূন্যে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম ভেদ করে নানা কষ্টের চিংকার ও আর্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল!

কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চিংকার করছে এবং দাকণ যাতনায় কাঁদছে।

—‘জয়! জয়!’

—‘কী মানিক?’

—‘শুনেছ?’

—‘হ্যাঁ!’

—‘আমাদের এখন কী করা উচিত?’

—‘ঢুপ করে ইইখানে বসে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন ঘৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।’

—‘কিন্তু ও কীসের গোলমাল?’

—‘কাল সকালে বুৰাতে পারব। এখন আর কথা কোয়ো না। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।’

নীচের ডাল থেকে করণঘর শোনা গেল, ‘হ্যাঁ! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধরে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশিক্ষণ ঝুলতেও পারব না।’

অমলবাবুর সঙ্গে মানিক কোনও রকমে ডাল বয়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হল!

মানিক বললে, ‘বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেননি সুন্দরবাবু।’

ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, ‘মানিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জুলে যায়। নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?’

উপর থেকে জয়স্তের বিরক্ত ও গভীর স্বর শোনা গেল, ‘ফের কথা কয়।’

দূরের কোনও গোলমাল আর শোনা যায় না।

শব্দগুলো যেন স্তুরতাসাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইষ্টকের মতো পড়েই ভুবে কোথায় তলিয়ে গেল। এখন শুধু কালো রাত করছে থমথম, মুখর বিল্লি করছে বিমবিম, বিলের গাছ করছে মরমর। এবং স্লান খণ্টাদ নিবুনিবু চোখে করছে উষার কোলে যতৃ অপ্রস্তুত!.....

গাছে গাছে পাখির দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছসিত আনন্দে রঠিয়ে দিলে—
জাগো নতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলি-প্রজাপতি! পূর্বের শোভাযাত্রায় দিবারানির সোনার
মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কী শান্তিময়! সকালের নতুন বাতাস কী মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনও যে
কালো কৃৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকালে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্চর্ষিত নিশাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, ‘আগে মেটাতে ঢিয়ে দাও চায়ের কেটলি। কী জানি বাবা, যে জায়গায় যাচ্ছ,
জীবনে হ্যাতো আর চা খেতে হবে না! ওহে, ‘এয়ার-টাইট’ টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ
এনেছিল না? হ্যাঁ, ক্ষমা-ঘৃণা করে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুড়ে মেরো।’

জয়স্ত বললে, ‘ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো ব্রেকফাস্ট মানুমের সাহস আর শক্তিকে দুগুণ করে তোলে! মানিক, নিয়ে এসো রাসগোল্লা-সদেশের চিন!’

জয়স্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, ‘জয়স্তভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশি ভাব! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মতো মনের মানুষ দুর্লভ!’

প্রাতরাশ শেষ করে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক ‘দুর্গা দুর্গা’ বলে চেঁচিয়ে নিলেন।

মানিক বললে, ‘সুন্দরবাবু, আদুর্গার কানদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না ঢ্যাচালেও তিনি শুনতে পাবেন।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘এই! ঠাণ্ডা শুরু হল তো? আচ্ছা মানিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগে কেন বলো দেখি?’

মানিক মুঠকে হেসে বললে, ‘আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিনা?’

জয়স্ত তার প্রিয় বাঁশির বাঁশিটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরও সুন্দর করে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব আগে এগিয়ে চলেছে।

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হলদে।

আশেপাশে ঘূরে ফিরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব ছোটো জাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলবে গঙ্গাফড়িং হাই-জাম্পের নানান কায়দা দেখাচ্ছে!

মাঠ পার হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জয়স্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল।

বাঁশিতে বাজছিল তখন কোনও গানের অস্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার সুর বোৰা হয়ে গেল একেবারে!

মানিক দূর থেকেই লক্ষ করলে, জয়স্ত বাঁশিটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে! দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল!

সুন্দরবাবু বুবালেন, আবার কোনও অয়টন ঘটেছে! একটা দুঃখের নিশাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, ‘তোমরাও ছুটে এসো!—বলেই তিনি দৌড়োতে লাগলেন।

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, ‘হে ভগবান, আবার কী হল? আর যে পারি না!’

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তাঁ ঠিক মতো বর্ণনা করা অসম্ভব!

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ! এত বড়ো অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়ে পড়ে পুরুষ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব রকম মোটা!

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে!

অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসগিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্ধি হয়ে রয়েছে দুটো মানুমের মৃতদেহ!.....তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়েন্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চৃণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে পড়ে একটা ভাঙা বন্দুক!

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ে হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত!

কোথাও পড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা! ঝক্কের ফিলকি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে!

এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনও দেখেননি,—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মতো তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ স্তুতিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়স্ত ভারাক্রান্ত কঠে বললে, ‘তাহলে কাল আমরা এই আভাদেরই আর্তনাদ শুনেছিলুম?’

মানিক বললে, ‘তা ছাড়া আর কী?’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘কিন্তু কে এরা?’

জয়স্ত বললে, ‘বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটেনি, পদ্মারাগ বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কী করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে চুকেছিল!’

অমলবাবু ক্ষীণ কঠে বললেন, ‘আমি চ্যান আর ইনকে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মৃথ রিচিয়ে রয়েছে চ্যান। অন্য লোকটাকে চিনি না।’

জয়স্ত বললে, ‘সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।...সাপ কখনও গর্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের রোঁড়া গর্তে সে আশ্রয় নেয়। কোনও জন্তু উপর থেকে গর্ত খুঁড়ে পদ্মারাগ বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত দিয়ে ভিতরে চুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখে সুড়ঙ্গেই বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আঘাতাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর কুন্দ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোনও কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান আর ইন কোম্পানির রঙালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায়নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ করে দুবার বন্দুক ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল।অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শক্তির দল নিজেরাই আঘাতলি দিয়ে আমাদের অজগর-শক্তিকে বধ করে আমাদের পথ সাফ করে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যান্ড ইন কোম্পানিকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দিয়ে পদ্মারাগ বুদ্ধেবকেও! তিনি সত্ত্বাই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হলে তিনি ব্রোঞ্জ করি খুশ হবেন!’

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে তরসা করে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘হ্ম! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে! তুমি আমাদের জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!

বলেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃতদেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কঞ্জনাতীত ব্যবহার আশা করেননি, তিনি ভয়ানক ভড়কে হঠাতে পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়ামবীরের মতো আশ্চর্য এক ডিগবাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশ্নে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ঘাঁড়ের মতো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ওরে বাবা রে, অজগরটা এখনও জ্যান্ত আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!’

জয়স্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে সরে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখনও ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়স্ত হাত ধরে তাঁকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন বলে উঠলেন, ‘আমাকে ছেড়ে দাও জয়স্ত আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হতে চাই না!’

জয়স্ত হেসে বললে, ‘সুন্দরবাবু, শাস্তি হোন।’

—‘শাস্তি হব? জ্যাস্ত অজগরের সামনে শাস্তি হব?’

—‘তয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘষ্টার পর ঘষ্টা ধরে নড়ে চড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনও ওই কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোনও জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কাককে ধরতে পাবে না।’

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিশ্বারিত করে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বটে, বটে, বটে? তাহলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগবাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ।’

জয়স্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা বেদির সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কঠে বললে, ‘এখন দূরে যাক সমস্ত দুঃখপ, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ বুদ্ধের প্রতিমা! হাতি সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই, রাতও নেই, আছে শুধু বন্ধুরীন অঙ্ককার।’

হাতি সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বালল, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সূর্য আর গঞ্জের সঙ্গে ঘটল বিছেদ।

সুড়ঙ্গের সুন্দুর অঙ্ককারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কানে কানে মানিক বললে, ‘আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন?’

সুন্দরবাবু চমকে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, ‘আমাকে আর নতুন তয় দেখিয়ো না মানিক।’

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কাকুর আর দেখা হল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোনও শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই প্রশংসন গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঙিয়ে রয়েছে এক নিরথের পাথরের দেওয়াল।

সকলে খানিকক্ষণ হতভবের মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়া করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙ্গ ভাঙ্গ গলায় বললেন, ‘এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হল।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম! হ্যম, পদ্মরাগ বৃক্ষ না অশ্বিন্দি বৃক্ষ! ধাপ্তা বাবা, ধাপ্তা!'

মানিক বললে, ‘তাহলে অকারণে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?’

অমলবাবু বললেন, ‘এ হচ্ছে নাগরাজা, নাগ ছিল এখনকার প্রতীক! ওঙ্কারধামের ভাস্তুর্যে সর্বত্রই তাই নাগমূর্তির ছড়াচাঢ়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমির পোষা হয়, বাংলা দেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল।’

জয়স্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, ‘উছ! আপনার যুক্তি মনে লাগছে না! যে অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, তঙ্গুরা সুড়ঙ্গের মুখ বক করে তাকে কথনও কবর দিয়ে জ্যাস্ত মারবার ব্যবস্থা করত না! ... আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে! হাতি সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বলো! ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল! দেখা যাক দেওয়ালের ওপাশে কী আছে?’

বলেই সে রূপোর শামুকের নস্যাদিনি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মানিক জানত, জয়স্ত খুশি হলে নস্য ন নিয়ে পারে না!

কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশক্তার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, ‘জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার মীচে। সৃতরাঙ আমরা এখনও হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা মীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর ছড়েছড় করে জল চুক্তে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?’

জয়স্ত বললে, ‘সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল চুকলে পালাবার চের সময় পাওয়া যাবে!..... তাঙে দেওয়াল!’

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগল কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা! শক্ত দেওয়াল! সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হল।

কিন্তু জল-টল কিছুই ভিতরে চুকল না।

জয়স্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অলঙ্কৃণ কী অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে বলে উঠল, ‘চালাও, কুড়ুল! সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়! সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয়নি!’

মানিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ‘দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মতো কী হাতে ঠেকছে! বোধ হয় দরজা!’

সুন্দরবাবু বিপুল কোতুহলে বললেন, ‘আঁ? বলো কী! দরজা? আলিবাবার চালিশ দস্যুর রত্নগুহা, চিংফাঁক, চিংফাঁক, চিংফাঁক!’

ঠক্কাঁ! ঠক্কাঁ! ঠক্কাঁ! চলল সমানে কুড়ুলের পর কুড়ুল! খসে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর! এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে নেচে ওঠে সকলের প্রাণ!.....

দরজা বটে! খুব বড়ে দরজা নয়, ছেটো দরজা! তিন ফুটের বেশি উঁচু নয়, কিন্তু বিলঙ্ঘণ মজবুত! আগাগোড়া লোহার কিল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দুরজ্ঞায় লাগানো রয়েছে একটা পুরোনো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়স্ত বললে, ‘কুলুপের ভিতরে বেশ করে তেল চেলে দাও! আঁকাল ও-কুলুপে চাবি ঢেকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘তেল তো ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?’

মানিক বললে, ‘আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা এ কুলুপে লাগবে?’

জয়স্ত বললে, ‘কুলুপটা ভালো করে তেলে ভিজুক! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরি করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?’

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে মেহতরে হাত বুলোতে বুলোতে একগল হেসে বললেন, ‘রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে! এ ভুঁড়ি কখনও পরিপূর্ণ হয় না! বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরথ করে দেখতে পারো—হ্যাম!’

মানিক স্থস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, ‘এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে?’

জয়স্ত বললে, ‘হ্যাঁ, পদ্মরাগ মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কী, এইবারেই তা জানতে পারব! অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো পদ্মরাগ মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না! পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ মণি বেশি মূল্যবান।’

চায়ের পিয়ালা যখন খালি হল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুল, তখন মানিক সগর্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি তুকুল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল যুলে!

সমস্ত গুহা চিংকার-শব্দে পরিপূর্ণ করে জয়স্ত বললে, ‘জয় পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়!’

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোটো একটি ঘর।

তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীর আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অঙ্কনকারের মৃত্যু হল, তার হিসাব কেউ জানে না!

ঘরে আর কোনও আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোনও ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক!

জয়স্ত ঘরের চারিদিক তাকিয়ে বললে, ‘মানিক, দ্যাখো! পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?’

—‘পারছি, জয়! এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।’

—‘এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, নকশায় রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদির তলায় সিঁড়ির সার আছে, নকশা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত! সাধারণ লোকে নকশা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণের চেয়ে অসাধারণ! কারণ অসাধারণ লোক নকশার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হত, কিন্তু আমরা ফিরে যাইনি। অতএব অন্যান্যেই গর্ব করতে পারি! এখন তোলো ওই সিন্দুকের ডালা।’

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিশ্বায়ে স্ফুরিত হয়ে গেল।

সিন্দুকের ভিতরে লঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীর রঙজোতির ঝটকা!

তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জুলজুলে পাথরে তৈরি একটি অতিআশ্চর্য ও অতুলনীয় বুদ্ধমূর্তি সেখানে কারুকার্যে বিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ ষ্টৰ্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে!

মৃত্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতের কম হবে না!

জয়স্ত বিশ্বায়-বিহুল ঘরে বললে, ‘মৃত্তির সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা! এ মণিময় মৃত্তি না হয়ে যায় না! না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা! মানিক, মানিক! এ কি সভি, না অসম্ভব স্বপ্ন?’

মানিক আবেগে নিরক্ষত হয়ে মৃত্তির মণিময়, দীপ্তি ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্ম! পদ্মরাগ মণি কেটে এত বড়ো মৃত্তি তৈরি করা হয়েছে? পদ্মরাগ মণি এত বড়ো হয়!’

শানিক বললে, 'না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পঞ্চরাগ মণি একসঙ্গে জড়ে শিল্পী এই মৃত্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায়ই নেই!'

জয়স্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্তিটিকে স্থানে তুলে সিদ্ধুকের উপর বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মতো ঘোররক্ষণ্ণ সেই মহামানবমূর্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল!

সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির সামনে দুই হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধর্মং শরণং গচ্ছামি! সঙ্গং শরণং গচ্ছামি!'

pathagof.net

প্রদীপ ও অন্ধকার



প্রথম

অর্থ পঞ্চমবাহিনী সদেশ

নর-নারায়ণের নাম শুনেছেন? পৌরাণিক নর-নারায়ণ নয়, বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক নর-নারায়ণ।

নরেন্দ্র মঙ্গুমার ও নারায়ণ ঢোঁুরি, দুই বন্ধুর নাম। তাদের মতন একজোড়া বন্ধু সচরাচর দেখা যাবে না। দৃঢ়িতে যেন মানিকজোড়! যেখানে তাদের একজনকে দেখা যাবে না, সেখানে দেখা যাবে না তাদের আর-একজনকেও। যেন যাহা বাহার তাহা তিপ্পান থাকবেই। যেখানে নরেন্দ্র আছে, ধরে নিতে হবে সেখানে আছে নারায়ণও। তাই লোকে তাদের নাম দিয়েছে নর-নারায়ণ।

নর-নারায়ণের নাম এমন সুপরিচিত হয়েছে কেন জানেন? অপরাধ-তত্ত্বে তাদের মতন বিশেষজ্ঞ বাংলা দেশে খুবই কম আছে। লোকে তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করে। আমরাও তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করতে পারি, কিন্তু আসলে তারা সাধারণ ডিটেকটিভ নয়। তারা পুলিশ বাহিনীর অস্তর্ভুক্ত নয়, তারা কাজ করে স্থায়ী ভাবেই। এ-শ্রেণির গোয়েন্দাদের সাধারণ পুলিশ কোনওদিনই সুনজরে দেখে না, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নর-নারায়ণের—বিশেষ করে নরেন্দ্রের কথা যত্ন। ফারণ, কোনও গোলমেল মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে পলিশের বড়ে বড়ে কর্তারাও নরেন্দ্রের কাছে এসে পরামর্শ করতে লাজিত হন না। যে-কোনও কঠিন সূত্রের অতি জটিল জোট খুলতে নরেন্দ্রের মতন ওষ্ঠাদ আর নেই। যেখানে কারুর মাথা খেলে না সেখানেও পঙ্কু নয় নরেন্দ্রের মাথা। তার মৃত্যুবান সাহায্য লাভ করে পুলিশ অনেক বড়ে বড়ে মামলার কিমারা করে যথেষ্ট সুনাম কিনেছে, অর্থ নরেন্দ্র জনসাধারণের কাছে কোনওদিনই নিজের নামকে বিজ্ঞাপিত করতে রাজি হয়নি। জনসাধারণ তাকে চেনে না বললেই চলে। তার বাহাদুরি জানে কেবল পুলিশ এবং অপরাধীর।

কিন্তু যে-বাক্তি এমন অসাধারণ বাহাদুর, তাকে চোখে দেখলে আগনারা দস্তরমতো অবাক হয়ে যাবেন। ভগবান তার দেহখানিকে গড়েছেন প্রায় বামন করেই। লম্বায় সে চার ফুট আড়াই ইঞ্চির বেশি হবে না, আর চওড়ায় তাকে দেখতে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ তালপাতার সেপাইয়ের মতন। কিন্তু দেহের তুষ্ণতা ও ক্ষুত্রার জন্যে তার যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে, সেটা প্রৱণ করে নিয়েছে তার অদ্ভুত মাথাটা। কারণ, দেহের তুলনায় তার মাথাটি অসম্ভব রকম প্রকাণ। দেখলে ভয় হয়ে যে, তার অত বড়ে মাথাটার ভার ওইটুকু পলকা দেহ বেশিদিন বোধহয় সহ্য করতে পারবে না। দূর থেকে তাকে দেখায় যেন একটা ঝেঁড়ে মাথা রোগা-লিকলিকে ছোট ছেলের মতন। বাস্তবিক, চেহারার দিক দিয়ে সকলকেই সে রৈতিনীত হতাশ করে দেয়।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রাণের বন্ধু নারায়ণের চেহারা হচ্ছে একেবারে অন্যরকম। তাকে দানব বললেও অতুল্য হবে না। তার মতন সুদীর্ঘ দেহ কলকাতায় আর কারুর আছে বলে মনে হয় না। তার মাথার উচ্চতা হাচ সাড়ে সাত ফুট। চওড়াতেও তার দেহ জাগায় মনের ভিতরে বিপুল বিঘ্নয়। তার বুকের ছাতির বেড় সহজ আবস্থায় আটচাঙ্গিশ ইঞ্চি এবং স্ফীত হলে সেই আশ্চর্য ছাতির বেড় দাঁড়ায় গিয়ে পঞ্চান কি ছাগ্নার ইঞ্চিতে। বড়ে বড়ে পালোয়ান গুড়াও তার বিকলে দাঁড়াতে গেলে ভয়ে কুঁচকে পড়ে শিখে তাকে দেখলে কেঁদে-ককিয়ে ওঠে। সে এমন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী যে, দুই-তিনজন আরোহীর সঙ্গে একখানা বড়ো মেটরগাড়িও দুই হাতে টেনে শুনে তুলতে পারে।

গায়ের রঙে এবং প্রকৃতিতেও নরেন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণের আকাশ-পাতাল তফাত। নরেন্দ্রের গায়ের রং ধৰ্বধরে সাদা। আর নারায়ণ হচ্ছে একেবারে আবলুস কাঠের মতন কালো, এমন অসাধারণ কালো রংও বাঙালিদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রকৃতি হচ্ছে ধীর, স্থির, শান্ত। সে কথা কয় ওজন করে, আর যে-কোনও কথা বলবার আগে ভেবে-চিন্তে তবে উচ্ছারণ করে। আর নারায়ণ? তার হো-হো হাসির ধাক্কায় ল্যাজ খসে পড়বার তয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে না টিকটিকিরাও। সে মহা চৰ্ষণ, এক জায়গায় পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কথা কইতে কইতে সর্বদাই সে বসছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং মেঝে কাঁপানো পদ্মগুলকে ঢালনা করে ঘুরে আসছে এদিকে-ওদিকে—যেন মানুষ-চরকি! আর তার মুখের কথা? তার মুখ যেন কথার তুবড়ি! এবং তার মুখের কথার ভিতরে শিশুত্তও বড়ে কম থাকে না।

বিচিত্র এই মানুষ দুটি—কেউ কারুর মতন নয়, অর্থ দুজনেই দুজনের মনের মতন!

লোকে বিশ্বাস্ত্রুক্ষণ করে বলে, তেনে আর জলে এমন মিল হল কেমন করে?

নারায়ণ হেসে বলে, ‘আমার কেউ তেলও নই আর জলও নই। ডগবান আমাদের একসঙ্গে গড়েছেন পরম্পরের অভাব পূরণ করবার জন্যে। নরেন্দ্রের দেহ নেই বটে কিন্তু মতিষ্কের দিক দিয়ে ও হচ্ছে মস্ত! আমার মতিষ্কের বালাই নেই, কিন্তু আমার দেহখানি নয়ন ভরে দর্শন করছ তো? ব্যাপার কী জানো ভায়া? নরেন আমার হয়ে ভাবে, আর আমি নরেনের হয়ে হাতেনাতে কাজ করি।’

লোকে বলে, ‘তাহলে তুমি নিজেকে যন্ত্র বলে মনে করো নাকি?’

নারায়ণ বলে, ‘ঠিক তাই। আমি হচ্ছি যন্ত্র, আর নরেন হচ্ছে যন্ত্রচালক!’

এই হল নর-নারায়ণের পরিচয়। এইবাবে দেখা যাক তারা এখন কী করছে।

বর্ষাকালের একটি তিজে প্রভাত। ঘোর মেঘাছন্ন আকাশ ঢালছে হড় হড় করে জলের ধারা। রাজপথ হয়েছে যেন একটি নদীর মতো। সকালবেলাতেও রাস্তায় মানুষের সাড়া এত কম যে, মনে হয় শহরের ঘূম যেন এখনও ভাঙেনি। ঘরে ঘরে কেরানিরা প্রায় রাত্রির মতন কালো আকাশ এবং জলতরঙ্গয় রাজপথের দিকে তাকিয়ে যাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবছে, আজ চাকরির মানরক্ষা করা যায় কেমন করে?

খাবার টেবিলের দুই ধারে সামনাসামনি বসে নরেন এবং নারায়ণ। নরেনের সুমুখে টেবিলের উপরে রয়েছে একখানি ঘৰবারের কাগজ, দুইখানি খুব পাতলা টেস্টিং এক পেয়ালা চা।

আর নারায়ণের সুমুখে রয়েছে দ্রষ্টব্যমতো সমারোহের প্লামপুড়ি। খুব-বড়ো একটি ঢায়ের পেয়ালা, মস্ত একটা ঢায়ের কেটলি, থাকে থাকে সাজানো অনেকগুলো টেস্ট, গোটা-ছয়েক ‘এগপোচ, গোটা-ছয়েক সিদ্ধ ডিম আর আস্ত একখানা প্লামপুড়ি! সে একবার খাবারের থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, তারপর এক চুমুকে সব চা নিঃশেষ করে ঘন ঘন কেটলি তুলে নিয়ে শূন্য পেয়ালায় ঢালছে ঢায়ের ধারা।

নরেনের একটিমাত্র পেয়ালার আধখানাও যখন খালি হয়নি, নারায়ণের এক কেটলি চা এবং সমস্ত খাবার হল তার মুখের ভিতরে অদৃশ্য।

নারায়ণ চিংকার করে উঠল, ‘বেয়ারা! বেয়ারা!’

নরেন দৃঃ কুঞ্জিত করে মদু ঘরে বললে, ‘আবার বেয়ারাকে কেন? চ’ ফাঁসেঁ ফাঁসেঁ

—‘পেট ভরল না, আরও খাবারের দরকার’

—‘নারায়ণ, তোমার এই বাড়িবাড়িটা আমি পছন্দ করি না। সকালবেলাতেই উঠে তুমি যা গলাধংকরণ করলে, তাই খেয়ে আমার কেটে যেতে পারে পুরো দুটো দিন।’

নিজের প্রকাণ্ড কালো মুখে ধবধবে দাঁতের বিদ্যুৎ খেলিয়ে কড়িকাঠ-ফটানো কঠে নারায়ণ বললে, ‘বস্তু, তুমি আর আমি? হাতি আর পিপড়ে? তোমার পনেরো দিনের খোরাকেও আমার দেহের এক দিনের বেশি চলবে না যে?’

নরেন বললে, ‘কেবল দেহের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে দিনে দিনে তুমি তোমার মষ্টিষ্ককে আরও কাহিল করে ফেলছ। হাতি খুব প্রকাণ্ড জীব বটে, কিন্তু তাকে দাসত্ব করতে হয় ক্ষুদ্র মানুষেরই।’

নারায়ণ বললে, ‘কিন্তু ভায়া, আমার মষ্টিষ্কের ভার তো আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। এজন্যে আমাকে খোটো দিয়ে তোমার কোনওই লাভ হবে না। আমার মষ্টিষ্ক তুমিই, আর তোমার দেহ হচ্ছি আমি। কেমন, আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্তই পাকা হয়ে আছে কি না? অতএব আমাকে দেহরক্ষা করবার অবসর দাও। বেয়ারা, বেয়ারা! আরও খান-ছয়েক টোস্ট, আর আধ-ডজন এগপোচ।’

নরেন তার কিছু বলবার চেষ্টা না করে চায়ের পেয়ালায় ছোটো একটি চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ করলে। আবার এল এগপোচ, টোস্ট আর এক কেটলি চা। নারায়ণ আবার নতুন খাবারগুলোকে আক্রমণ করলে বিপুল বিক্রিমে।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় একখানা গাড়ি থামার শব্দ হল। নরেন কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, ‘এই বাদলে বাড়ির দরজায় আবার কার গাড়ি এসে থামল?’

নারায়ণ একটা বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গি করে বললে, ‘হ্যাতো কোনও মকেল! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আজ যেন কেউ আমাদের বাইরে বেকুবার অনুরোধ না করে! আমার এতখানি ডাগর দেহ একবার ভিজে গেলে শুকোতে লাগবে সারাটা দিন।’

ঘরের ভিতরে যে হেমরাতোমরা লোকটি এসে ঢুকলেন, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর নাম শচীনন্দন দন্ত।

নরেন বিশিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘এ কী অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! এমন দুর্যোগে এমন অসময়ে আপনি!'

শচীনবাবু বললেন, ‘এক সমস্যায় ঠেকে গিয়েছি মশায়! তাই ঠেকবার আগেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।’

নরেন বললে, ‘ঠেকবার ভয় আছে নাকি?’

—‘আছে বই কি! হ্যাতো এর মধ্যে বেশ খানিকটা ঠেকেও গিয়েছি।’

নরেন বললে, ‘পুলিশ যেখানে নিজের অক্ষমতা শীকার করে, ব্যাপারটা সেখানে মারাঘুক বলেই সন্দেহ হয়।’

—‘হ্যাঁ ঝশাই, মারাঘুক বিআটের শয়েই পড়ে আছি।’

—‘ভালো, বসতে আজ্ঞা হোক। চাঁটা কিছু ইচ্ছা করেন?’

—‘কিছু না, কিছু না! ওসব বাঙ্গাট চুকিয়েই এসেছি’, বলতে বলতে শচীনবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

নরেন একখানা সোফার উপরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল, তার ছোটো দেহখানি সোফার ভিতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

শচীনবাবু বললেন, ‘ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আর গোপনীয়। গোড়াতেই আপনাকে এই কথাটা বলে রাখতে চাই।’

নরেন কোনও জবাব দিলে না, শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল জিঞ্চাসু চোখে।

শচীনবাবু বললেন, ‘খবরের কাগজে পথমবাহিনীর কথা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এদেশের কোনও কোনও গুপ্তচর আমাদের প্রধান শক্তি জাপানকে গোপনে সাহায্য করছে।’

—‘আপনার এমন সন্দেহের কারণ?’

—‘আমরা প্রমাণ পেয়েছি, কোনও কোনও সরকারি গুপ্তকথা বাইরে ব্যক্ত হবার আশেই একেবারে শক্তপক্ষের কানে গিয়ে উঠেছে। এমনকি এখানে কোনও বড়ো জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছোবার তিনি-চার দিন পরেই সেই খবর সরাসরি গিয়ে হাজির হচ্ছে জাপানিদের কাছে।’

—‘কেমন করে জানলেন?’

—‘শক্রশিবিরে আমাদেরও গুপ্তচরের অভাব নেই তো! আমরা খবর পাচ্ছি তাদের কাছ থেকেই।’

—‘গুরুতর কথা বটে। কারুকে সন্দেহ করতে পেরেছেন?’

শচীনবাবু দৃঢ়ঘিত তাবে মাথা নেড়ে বললেন, ‘না। আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি।’

—‘আপনি আমাদের কী করতে বলেন?’

—‘আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই আমরা অপরাধীদের আবিষ্কার করবার কিছু কিছু চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমরা যে গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করি, যামলার ভার পাবার কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। তারপর নিযুক্ত করি আর একজন গোয়েন্দাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই তাকেও ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তারপর নিযুক্ত করি তৃতীয় বাস্তিকে, কিন্তু সেও আজ বেঁচে নেই। বুঝতে পারছেন, ঘটনাগুলো কেবল রহস্যময়ই নয়, রীতিমতো সন্দেহজনক।’

সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে নরেন ধীরে ধীরে বললে, ‘তিন-তিনজন লোক একই মামলার ভার নিয়ে পরে পরে মারা পড়েছে। কথাটা শুনতে কেমন অস্তুত লাগে। কেমন করে তারা মারা পড়ল? কেউ তাদের খুন করেছে?’

—‘খুনোখুনি বা মারামারির কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি।’

—‘তবু তারা মারা পড়ল কেন?’

—‘স্বাভাবিক ভাবেই বিছানায় শুয়ে।’

—‘মানে?’

—‘তারা প্রত্যেকেই মারা পড়েছে একই রোগে।’

—‘রোগটা কী?’

—‘নিউমোনিয়া।’

নরেন আবার সোফার উপরে এলিয়ে পড়ে, দুই চক্ষু মুদে স্তর হয়ে রইল। নারায়ণ হঠাতে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে আবার শচীনবাবুর সামনে এসে বসে পড়ল। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা হতভঙ্গ ভাব।

নরেন আবার চক্ষু মেলে মৃদুকষ্টে বললে, ‘স্বাভাবিক মৃত্যুর ভিতরেও যে এমন অস্বাভাবিক যোগাযোগ থাকতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রযুক্তি হয় না। একই মামলার ভার নিয়েই তিনজনে মারা পড়ল একই নিউমোনিয়া রোগে।’

নারায়ণ বললে, ‘বাবা, আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছেই, পেটের পিলেও বিলক্ষণ চমকে গিয়েছে। আজকাল নিউমোনিয়া ব্যাধিও শক্তপক্ষে যোগদান করেছে নাকি?’

pathagor.net

শচীনবাবু বললেন, ‘এখন বলুন দেখি নরেনবাবু, এ রহস্যের তল কোথায়? এগুলো যদি হত্যাকাণ্ড না হয় তাতে এগুলো কী? এই কথা জানবার জন্মেই আমি এসেছি আপনার কাছে।’

নরেন তেমনই মুদ্রারেই বললে, ‘এত তাড়াতাড়ি জোর করে আমি কোনওই মত প্রকাশ করতে রাজি নই। পঞ্চমবাহিনীর নাম আমরা প্রথম শুনেছি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরও হবার পর থেকেই। প্রথম প্রথম পঞ্চমবাহিনীর অর্থ বুতেও কষ্ট হত, এখন খবরের কাগজে তার উদাহরণ পেয়ে বুদ্ধি কতকটা খুলেছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধেও তথাকথিত পঞ্চমবাহিনীভূত একজাতীয় জীবের অভাব ছিল না। তাদের অধিকাংশ ইতিহাসই প্রকাশিত হয়েছে, আর আমিও তা পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। আমার শ্বরণ হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরনেরই কোনও ঘটনা ঘটেছিল।’

শচীনবাবু সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঘটনাগুলো কী রকম?’

—‘আপাতত তা শুনে কাজ নেই। কারণ, গোড়া থেকেই কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলে আমরা অন্যায়সেই বিপথে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। এখন আপনার কী কর্তব্য জানেন?’

—‘বলুন।’

—‘আপনি আজই প্রচার করে দিন যে, এই মামলার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছি আমি।’

—‘তাতে আপনার কিছু সুবিধে হবে?’

—‘যথেষ্ট। আমি দেখতে চাই, আমার সন্দেহ সত্য কি না। অর্থাৎ এই তিনটে মৃত্যুর মধ্যে কোনও গুরুতর অপরাধের নির্দর্শন আছে কি না। আমি অপরাধীদের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। আজ আর কোনও কথা নয়, আমাকে এখন কিছু ভাববার সময় দিন।’ নরেন আবার তার দুই চক্ষু মুদ্দে ফেলে ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

শচীনবাবুর হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু তিনি নরেনের স্বতাব জানতেন। তিনি বুবলেন, আপাতত সে কিছুতেই ভঙ্গ করবে না তার মৌনত্বত। অতএব আর দ্বিক্ষণি না করে সেদিনের মতন বিদায়-গ্রহণ করলেন।

১৩৩

দ্বিতীয়

পকেটমারের কীর্তি

শচীনবাবু ঘরের ভিতর থেকে যেই অদৃশ্য হনেন, নরেন অমনি আবার চাকু চুলচ্ছে বললে, ‘নারায়ণ, অবিলম্বে গাত্রোথান করো।’

নারায়ণ তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘তারপর?’

—‘তারপর সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হও।’

‘আমি প্রস্তুত। কিন্তু কারণ?’

—‘কারণ, জানলার ভিতর দিয়ে আমি বারবার লক্ষ করেছি, রাস্তার ওধারের ফুটপাথের উপরে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে একটি উদ্রলোক মৃত্যির মতো চৃপ করে দাঁড়িয়েছিল। ওর ওই উদাসীনতা সন্দেহজনক, কারণ শচীনবাবুর গাড়ি চলে যাওয়ার পরেই ও-লোকটিরও পদযুগল রীতিমতে সচল হয়ে উঠল। এখন আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না! তুমি তার পিছনে ধাবমান হতে পারবে?’

—‘অনায়াসে। কিন্তু তাকে চিনব কেমন করে?’

—‘সে ও-ফুটপাত ধরে এইমাত্র উত্তর দিকে গিয়েছে। তার পায়ের দিকটা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তার গায়ে আছে একটি নীল রঙের পাঞ্জাবি, ঢেকে আছে চশমা, ঠোঁটে আছে গোফের রেখা, মাথায় আছে গাঙ্কি-টুপি আর হাতে আছে মোটা মালাকা বেত। মাথায় সে মাঝারি আর তার গায়ের রং তোমার ঢেয়ে ফরসা হলেও রীতিমতো কালো। যাও।’

নারায়ণ দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন হঠাতে গলা চড়িয়ে বললে, ‘নারায়ণ, আর একটা দরকারি কথা শুনে যাও।’ এবং একে নিজের মন্তব্য মুখখানা বাড়িয়ে নারায়ণ বললে, ‘কী হ্রস্ব হ্রস্ব?’

—‘লোকটা এখনও আমাদের উপরে হয়তো কোনও সন্দেহ করতে পারেন। খুব সন্তুষ্ট তৃষ্ণি ওর আড়ার সক্ষান পাবে। যদি পাও, ওর আড়ার উপরে পাহারা রাখবার ব্যবস্থা করে এসো।’

—‘আছা’ বলে নারায়ণের মুখ আবার আড়ালে চলে গেল।

নরেন নিজের মনেই ভাবতে লাগল, কিছুকাল আগেও এদেশি অপরাধীদের সঙ্গে বিলাতি অপরাধীদের তফাত ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল এদেশেও মাঝে মাঝে এমন অপরাধের দৃষ্টিক্ষণ দেখা যায়, যার আদর্শ আছে সাত সাগরের ওপারে। জানি না, আজ যে মামলাটার তার গ্রহণ করলুম, সেটাও ওই জাতীয় কি না!

ঘন্টা-তিনি পরে নারায়ণ আবার ফিরে এল।

নরেন তখন বসে বসে খান-কয়েক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ তুলে বললে, ‘কী খবর নারায়ণ?’

—‘খবর ভালো। আমি একেবারে লোকটার ডেরা পর্যন্ত না-দেখে ছাড়িনি। লোকটা থাকে রঞ্জনী বোস স্ট্রিটের একখানা প্রকাশ ব্যারাকবাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সে-বাড়িতে নানা জাতের লোকের বাস। তাদের অনেকেই কেউ কারুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সেখানে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে; বাংলার নানা জেলার লোকও আছে, আবার পশ্চিমের নানাদেশি মানুষেরও নমুনা আছে। এমনকি দু-ঘর মাদ্রাজিরও খোঁজ পেয়েছি।’

—‘সেখানে কোনও পাহারার ব্যবস্থা করে এসেছ?’

—‘করেছি বই কি! বাড়ির সামনে বিজয়কে দাঁড় করিয়ে বেশে অপেক্ষা।’

—‘কোন বিজয়? চোর বিজয়, না পকেটমার বিজয়?’

—‘পকেটমার।’

—‘বেশ করেছ। ছোকরা যেমন চালাক, তেমনি চটপটে।’

এইখানে একটুখানি ব্যাখ্যার দরকার। আপনি আপন চেহারার বিচিত্র বিশেষত্বের জন্য নরেন্দ্র ও নারায়ণ বৃহৎ জনতার ভিতারে থেকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কোনওরকম ছদ্মবেশই নরেনের বালকের মতন দেহের ক্ষুদ্রত্ব এবং নারায়ণের দানবের মতন দেহের বিপুলতা ঢেকে রাখতে পারত না। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাকর।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে তারা একটি উপায় অবলম্বন করেছিল। তারা মাহিনা দিয়ে পুর্যেছিল এমন কয়েকটি জীবকে, যাদের পেশা ছিল রাহাজানি, গুণামি, চুরি ও পকেটকাটা প্রভৃতি। এ-শ্রেণির লোক পুনিশে চাকরি না নিলেও গোয়েন্দাগিরির বহু বিশেষত্বের সঙ্গে সুপরিচিত থাকে।

সর্বদা পুলিশের ও জনসাধারণের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে তাদেরও দৃষ্টি হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এবং প্রকাশে থেকেও কী কৌশলে আঘাতগোপন করতে হয়, তারা ভালো করেই জানে সে গুপ্তকথা।

এরা নব-নারায়ণকে দেখত প্রভুর মতো। তাদের সংসর্গে এসে তারা পুরোদস্ত্র সাধু না হলেও অসৎ পথের দিকে সহজে পা বাড়াতে চাইত না। অস্তত তাদের পক্ষে থেকে এইটুকু বলা যেতে পারে, নরেন ও নারায়ণকে তারা কোনওদিন ঠকাবার চেষ্টা করেনি, বরং প্রশংসনে আদেশ অনুযায়ী কাজ করে নিম্ফের র্ঘ্যাদা বক্ষা করবার চেষ্টা করে এসেছে। এ-শ্রেণির লোকের চরিত্র ছিল নরেনের নথদর্পণে। তাদের বশ করবার কৌশল সে জানত।

সেইদিনই সঙ্ক্ষ্যার সময় পকেটমার বিজয় নরেনের সামনে এসে সেলাম ঝুকে দাঁড়াল।

নরেন বিবরণ ভাবে বললে, ‘বিজয়, তুমি পাহারা ছেড়ে এখানে কেন?’

বিজয় দুই হাত জোড় করে বললে, ‘হজুর, আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে সেখানে নসীরামকে পাহারায় রেখে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।’

—‘কী কথা?’

—‘গোড়া থেকেই বলি, শুনুন হজুর। সেই ব্যারাকবাড়িখানার সামনে আমার এক আলাপী লোকের একখানা পানের দোকান ছিল। সারাদিন আমি সেইখানেই বসেছিলুম। যে-লোকটার উপরে আমাকে নজর রাখতে বলা হয়েছে, বিকেলবেলায় দেখি সে হঠাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েই হন হন করে একদিকে এগিয়ে চলল। আমিও তার পোষা কুতুর মতন লোকটার পিছু নিলুম। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে তার সঙ্গে আমিও একখানা বাসে উঠে বসলুম। রাসবিহারী আভিনিউয়ের মোড়ের কাছে লোকটা বাস থেকে নেমে পড়ল। তারপর টালিঙ্গের দিকে হেঁটে খানিকটা গিয়ে একখানা বড়ো বাড়ির ভিতরে চুকে গেল, আমি চূপ করে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আন্দজ আধ ঘণ্টা পরে বাড়ির বাইরে এসে সে আবার উঠল ধর্মতলার এক টামে। আমিও উঠলুম। টামে এত ভিড় যে আমাদের দুজনেরই বসবার জায়গা হল না। তার গায়ে গা মিশিয়েই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর হজুর—’

—‘বলো থামলে কেন? তারপর?’

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বিজয় বাধো-বাধো গলায় লজ্জিত ভাবে বললে, ‘তারপর হজুর, কেন জানি না, আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না।’

নরেন একটুখানি হেসে বললে, ‘বুঁদোছি। তুমি লোকটার পকেট মেরে দিয়েছ?’

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিজয় বললে, ‘কী আর বলব হজুর, হাতদুটো কেমন যেন নিশ্চিপ করে উঠল! পোড়া মনকেও কত যে বোঝাই, মন তবু বশ মানতে চায় না। তাই—’

নরেন বাধা দিয়ে অধীর স্বরে বললে, ‘অত আর ওজর দেখাবাৰ দৰকার নেই, আসল কথা বলো।’

বিজয় কাঁচুমাচু মুখে বললে, ‘তার পকেট থেকে পেয়েছি একটা মানিব্যাগ, একখানা চিঠি, আর ওয়ধু-ভৰা ছেট্ট একটা কাচের নলচে। আমার মনে হল এগুলো হজুরের কাজে লাগতে পারে। তাই আমি এখানে ছুটে এসেছি।’

নারায়ণ বিজয়ের পিঠের উপরে এক থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চিংকার করে বলে উঠল, ‘ত্যালা মোর ঝাপ রে, জিতা রহো।’

নরেন গভীর ভাবে বললে, ‘আছা, চিঠিখানা আর শুধুর নলচেটা আমার হাতে দাও। মানিব্যাগটা তুমি রাখতে পারো। আর তোমাকে দরকার নেই।’

বিজয় একটা সেলাম ঠুকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

ছেট্টি একটি কার্ডবোর্ডের বাস্তুর ভিতরে পুরু তুলো জড়িয়ে একটি কাচের চুঙ্গি সংযোগে রাখা হয়েছে। চুঙ্গিটির দু-মুখই বক্ষ, ডাঙ্কারুরা ইনজেকশন দেবার সময় এই রকম শুধু-ভরা কাচের চুঙ্গি ব্যবহার করেন।

নরেন সেটিকে আলোর দিকে ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, ‘চুঙ্গির ভিতরে এই জলীয় পদার্থটা যে কী, আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না। দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা দরকার।’

চুঙ্গিকে আবার যথাস্থানে রক্ষা করে নরেন চিঠি-ভরা খোলা খামখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর খামখানা উলটেপোলটে ভালো করে দেখে বললে, ‘দ্যাখো নারায়ণ, খামের ওপরে ডাকঘরের ছাপ নেই। পত্রলেখক বোধ হয় ডাকঘরকে বিশ্বাস করে না, তাই চিঠি বিলি করেছে অনা কোনও লোকের হাত দিয়ে। খামের এক কোণে খালি একটি নাম লেখা রয়েছে—‘নৃপেশ’। আছা, এইবার চিঠিখানা বার করে পড়ে দেখা যাক।’

চিঠিখানা এই

‘নৃপেশ,

শচীন দন্তের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সন্ধান নেবে, সে আর-কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে কি না। যদি কোনও নতুন খৌজবর পাও, তাহলে তখনই আমাদের তিনি নস্বর বাড়িতে চলে আসবে। আমি দিন-তিমেকের জন্যে ওই বাড়িতে থাকব। তারপর আমাকে পাবে হশ্পাখানেকের জন্যে আমাদের চার নস্বর বাড়িতে।

ছোটোবাবু।’

নরেন বললে, ‘চিঠির উপরে তারিখ লেখা রয়েছে তেসরো। আজ হচ্ছে পাঁচ তারিখ। তাহলে পত্রলেখক আজই তিনি নস্বরের বাসা ভ্যাগ করবে। ধরে নেওয়া যাক, বিজয় আজ টালিগঞ্জের যে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল, সেই-খানাকেই তিনি নস্বরের বাড়ি বলা হয়েছে। তাহলে এর পরেও আছে চার নস্বরের বাড়ি, যার ঠিকানা আমরা জানি না।’

নারায়ণ বললে, ‘যদিও তুমি আমার মষ্টিষ্ঠের অস্তিত্ব শীকার করো না, তবু আমার মনে হচ্ছে, এই চিঠিখানার ভেতরে আছে যেন কোনও ষড়যন্ত্রের গন্ধ।’

নরেন বললে, ‘তোমার মষ্টিষ্ঠ না থাকুক, ঘোশণাক্ষেত্রে আছে একথা আমি কোনওদিনই অস্বীকার করি না। হ্যাঁ, এই পত্রে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বই কি! এই ছোটোবাবু নামক মহায়াটি যে কে তা আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, এই লোকটি আমাদের শচীনবাবুর পিছনে নিযুক্ত করেছে গুপ্তচর। কোনও একটি মামলার জন্যে শচীনবাবু আর কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন কি না, এটা জানবার জন্যে তার যথেষ্ট আগ্রহ। মাঝলাটা কোন জাতীয় সেটা তুমি কিছু আন্দজ করতে পারছ কি?’

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, ‘আন্দজি চিল ছোড়ার অভ্যাস যে আমার নেই, তুমি একথা জানোই তো নরেন!

নরেন বললে, ‘কিন্তু আমার সে অভ্যাস আছে। এই কথাগুলো লক্ষ করো—‘আর কোনও নতুন

গোয়েন্দা'। এখেকে কি এই বুঝায় না যে, এটা হচ্ছে এমন কোনও মামলা যার জন্যে শচীনবাবু আগে এক বা একধিক গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন, পরে আবার নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে পারেন? কিন্তু সেই বিশেষ মামলাটি কী? শচীনবাবুর নিজের মূখেই আমরা শুনেছি, পঞ্চমবাহিনীর অপরাধীদের অবিষ্কার করবার জন্যে পুলিশ থেকে পরে পরে তিনজন গোয়েন্দাকে কাজে লাগানো হয়েছিল, আর তিনজনই একে একে মারা পড়েছে। হ্যাঁ নারায়ণ, এ সেই পঞ্চমবাহিনীর মামলা না হয়ে যায় না।'

নারায়ণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

নরেন বললে, 'ব্যাপারটা গোড়া থেকে আরও ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। পুনরুক্তি আমি ভালোবাসি না, কিন্তু তোমার মাথার ভিতরে জটিল কিছু ঢুকতে গেলে পুনরুক্তি ছাড়া উপায় নাই। শোনো।

'পুলিশ টের পেয়েছে ইউরোপের মতন এদেশেও পঞ্চমবাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। তারা এখানকার সামরিক শুণুকথা সংগ্রহ করে শক্রপঙ্কের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কী উপায়ে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে আর কী উপায়েই বা তা যথাস্থানে প্রেরণ করে, আমরা এখনও সেসব জানতে পারিনি। আর সত্য সত্তাই এখানে পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্ব আছে কি না, তাও জোর করে মানা যায় না। আমাদের কাজ করতে হবে কেবল পুলিশের সন্দেহের উপরেই নির্ভর করে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে হয়তো দেখব, আমরা ছুটে মরেছি কোনও মরীচিকির পিছনে পিছনে।'

'কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে, পুলিশ হাওয়ার উপরে কোনও মামলা খাড়া করেনি, পুলিশের সন্দেহের মূলে বস্তু আছে। পুলিশ দেখেছে, এখানকার সামরিক তথ্য বাইরে প্রকাশ পাবার আগেই জাপানিদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই আশ্চর্য রহস্যের তল খোজবার জন্যে পুলিশ একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে। হঠাৎ সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ল। অবশ্য এজন্যে বিশ্বিত হবার দরকার নেই, কারণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'তারপর নিযুক্ত হল দ্বিতীয় গোয়েন্দা, আর সে-ও মারা পড়ল ওই নিউমোনিয়া রোগেই! পুলিশ কিঞ্চিৎ চমকিত হল বটে, কিন্তু তখনও ভাবলে এ হচ্ছে দৈবের খেলা। তারপর তৃতীয় গোয়েন্দার প্রবেশ এবং ওই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে সে-ও করলে ইহলোক থেকে প্রস্থান! পুলিশ এবার দ্রুতর মতো ভীত হয়ে উঠেছে, কারণ এরকম অসম্ভব দৈব বিদ্যম্বনা করলাও করা যায় না। পুলিশ তাই তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসেছে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যে। এই মামলায় নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত হলেই সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ে কেন? তিনি ভিরু বেগে তারা মারা পড়লে হয়তো পুলিশ এতটা সজাগ হয়ে উঠত না—যদিও একই মামলায় মিস্কিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপর-উপরি তিন-তিন গোয়েন্দার মারা পড়াটাও হচ্ছে যথেষ্ট সন্দেহজনক।'

'বুঁৰু দাখো নারায়ণ, এইবাবে এই মামলায় নিযুক্ত হয়েই আমরা দৈবক্রমে একথানা অদ্ভুত পত্র হস্তগত করেছি। পত্রলেখক তার এক চরের উপরে আদেশ দিয়েছে, পুলিশ কোনও নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে কি না সে যেন সেই সন্ধান নেয়। এখন তোমার কী মনে হয়? অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছ কি?'

টেবিলের উপরে সশ্নে মুষ্টি প্রহর করে নারায়ণ বলে উঠল, 'ঠিক! ঠিক! এইবাবে আমারও চোখ ফুটল।'

নরেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'শেষ পর্যন্ত তোমার চোখ ফুটেছে দেখে পরম আশ্রম্ভ হলুম। হ্যাঁ! শচীনবাবু আবার একজন নতুন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়েছেন—আর সে হচ্ছি আমি। তারপরে

তাববাব কথা হচ্ছে, রাস্তা থেকে আজই একটি উদাসীন ভদ্রলোক দেখে গিয়েছে, আমার সঙ্গে শচীনবাবুর মিলন। তাই সে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্যে টালিগঞ্জের পত্রলেখকের সেই তিন নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে কী পরামর্শ হয়েছে, আমরা তা জানি না। তবে এইচুকু অনুমান করতে পারি, রিপোর্ট পেয়ে ছোটোবাবু নিশ্চয়ই খুব চনমনে হয়ে উঠবেন। অতএব এখন আমাদের যে-কোনও ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।'

বিপুল উৎসাহে একটি লক্ষ্যত্বাত্মক করে সোফার ওপাশ থেকে এপাশে এসে পড়ে নারায়ণ বলে উঠল, 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে! হ্যাঁ বস্তু, আমি চাই ঘটনা—ঘটনার ঘোর ঘটা! মুহূর্তে নতুন নতুন বিপদ আর বিশ্বায় আর উভেজন! আমার এ দেহ হচ্ছে দস্তরমতো পুরুষের দেহ, সোফায় নরম কুশনে হেলান দিয়ে বসে থাকবার জন্যে ভগবান এ দেহ নির্মাণ করেননি।'

নরেন কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়ে বললে, 'এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, এই ছোটোবাবুটির নাম আর পরিচয় কী? দলের মধ্যে সে কোন স্থান দখল করে বসে আছে? সেই কি দলপতি, না ছোটোবাবু আর বড়োবাবু আছেন? এই দলটি চালনা করছে কোন মস্তিষ্ক? যদি তারা পঞ্চমবাহিনীর লোকই হয়, তাহলে কোন উপায়ে শক্তদের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান করছে? প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলি, তাড়াতাড়ি সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে করি না।'

নারায়ণ বললে, 'কোনও ভাবনা নেই।' ইচ্ছা করলেই আমরা আজই সব প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পারি।'

— 'কেমন করে?' ১১৩

— 'চলো, আজই সেই ব্যারাকবাড়ি থেকে নৃপেশকে ক্যাক করে ধরে আনি।'

— 'তারপর?' ১১৪

— 'তারপর আর কী, নৃপেশ যদি সহজে বশ না মানে, আমার দু-চারটে কিল আর চড় খেলেই মনের কথা উগরে দেবার পথ পাবে না। এক-একটি কিলে তার এক-একখানা হাড় আমি গুঁঁড়ে করে দেব।'

নরেন মদু হেসে বললে, 'তোমাকে কেবল হাতির মতন দেখতে নয়, তুমি হচ্ছে হস্তীমূর্খ! নৃপেশ যদি পাকা অপরাধী হয়, তাহলে তুমি কিল মেরে তার মুখ ডেঙে দিলেও সে পেটের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। আর নৃপেশকে আমরা ধরে আনবই বা কোন আইনের জ্যোরে? তাকে আইনের ফাঁদে ফেলা যায়, তার এমন কোনও অপরাধের কথা এখনও আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। বরং আইনত অপরাধ করেছি আমরাই, কারণ তার পিছনে পকেটমার খেলিয়ে দিয়ে আমরা তার পকেটে যা ছিল সব হস্তগত করেছি।'

নারায়ণ চোখ ও ভুরু নাচিয়ে বললে, 'সত্যি কথাই তো। এতক্ষণ আমার এ খেয়ালটা হয়নি। তবে তুমি কী করতে চাও?' ১১৫

— 'আপাতত নৃপেশের উপরে কড়া পাহাড়া রাখতে চাই। গোপনে তার পিছনে লেগে থাকলে শক্তদের আরও অনেক খবর পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দুঃখিত হবার কোনওই কারণ নেই, এক দিনেই আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা অভাবিত সৌভাগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। আর এর মূলে আছে প্রধানত আমাদের পকেটমার-চালা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র। তাগে সে পকেট কেটেছিল! এজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলেও অন্যায় হবে না।'

নারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'বিজয়ছোকরাকে কাঙ্গাই আমি নিমন্ত্রণ করে ভালো করে এক পেট খাইয়ে দেব।'

নরেন ঘাড় নেড়ে বললে, ‘অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে। পাপীদের উৎসাহিত করলে বিপদের ভয় আছে।’

ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে সাড়া এল, ‘হজুর, ভেতরে যেতে পারি কি?’

—‘কে?’

—‘আজ্ঞে, আমি নসীরাম।’

—‘ভেতরে এসো। তুমি আবার কী বলতে চাও?’

নসীরাম ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললে, ‘হজুর, বিজুর কথায় আজ আমি ব্যারাকবাড়ির একটা লোকের ওপর নজর রেখেছিলুম। বিজু চলে আসবার পরই লোকটা হস্তদণ্ডের মতো বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে এসেই একখানা ট্যাঙ্গিতে উঠে কোথায় চলে গেল। সেখানে আর কোনও ট্যাঙ্গি ছিল না বলে আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না। আমি সেইখানেই চূপ করে বৃত্তি ছুঁয়ে বসে রইলুম। তারপর বিজু আবার ফিরে এল। আর সেই লোকটাও খানিকক্ষ হল ট্যাঙ্গিতে চড়েই আবার ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারে সে একলা নয়, তার সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে। এই খবরটা আপনাদের জানাবার জন্মেই বিজু আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। এখন আমাদের ওপর কী হ্যাতুর হ্যাতুর হ্যাতুর হ্যাতুর?’

‘তোমরা দুজনেই সেই বাড়িখানার ওপরে পাহারা দাও গে যাও। খুব সাবধান, লোকটাকে এবার আর এক মিনিটের জন্মেও চোখের আড়ালে যেতে দিয়ো না।’

নসীরাম ভক্তিভরে আবার একটি নমস্কার ঢুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন আসম ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর বললে, ‘নারায়ণ, ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছ কি?’

—‘আবার আমাকে আন্দাজ করতে বলছ? আমি আন্দাজ-ফান্দাজের ধারি ধারি না।’

—‘কিন্তু, একটা শিশুও এ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। নৃপেশ বাড়িতে ঢুকেই নিজের কাটা পক্কে আবিষ্কার করে ফেলেছে আর তখনই খবর দেবার জন্মে ট্যাঙ্গিতে চড়ে সেই তিন নম্বরের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছে। তিন নম্বরের বাসিন্দারা খবর শুনে বোধ হয় যথেষ্ট বিচলিত হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এতটা বিচলিত হল? তার কারণ কি এই কাচের ছাঁত, না এই চিঠিখানা? তাদের চোখে এ দুটোর মধ্যে কোনটা হচ্ছে বেশি মূল্যবান? আর নৃপেশের সঙ্গে যারা এসেছে তারা কে? একসঙ্গে ছোটোবাবু আর বড়োবাবু নয় তো?’

নারায়ণ মন্তব্য একটা হাই তুলে মুখের কাছে ভুক্তি দিতে দিতে বললে, ‘ওসব ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘায়াবার সময় আমার নেই। আমার উদরে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।’

নরেন রাগ করে বললে, ‘তোমার বিশ্বগামী স্নূর্ধা নিয়ে তুমি রসাতলে গমন করো। আমি আজ একেবারেই আহার করব না।’

নারায়ণ চক্ষু বিশ্ফোরিত করে বললে, ‘আহার করবে না মানে? উপোস করে থাকবে?’

—‘ঠিক তাই। তোমাকে তো কতবারই বলেছি, পেট ভরা থাকলে মন্তিক্ষের ধারণ ভোঁতা হয়ে থাকে? শূন্য উদর মন্তিক্ষেকে দান করে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি।’

নারায়ণ তুন্দমেরে বললে, ‘চুলোয় যাক তোমার চিন্তাশক্তি! আমি চাই বাহবল, আমি চাই পেট-ভরা খোরাক।’

তৃতীয়

২৩।

৬৭৯ মাই

১০৫ টাঙ্কি

চিঠি আর চুঙি

সেই রাত্রির কথাই বলছি।

নারায়ণ উদরস্থ খাদ্যের ভারে কিঞ্চিৎ কাবু হয়ে নিজের শয়নগৃহের ভিতরে অদৃশ্য হল।

নরেন খানিকক্ষণ দোতলার বারান্দার উপরে পায়চারি করে বেড়ালে। তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে যেন মনে মনে কী চিন্তা করছে। মিনিট কয়েক পরে সে আবার নীচে নেমে গেল। তার বাড়ির পিছন দিকে ছিল ছোটো-বড়ো গাছে তরা খানিকটা জায়গা। তারা শুনটিকে বাগান বলেই ডাকত, কিন্তু ‘ও-জায়গাটি’ ‘বাগান’ আর্খা লাভ করবার যোগ্য নয়। সেখানে ফুলগাছ চোখে পড়ত না একটাও, কিন্তু আগাছার ছড়াভড়ি ছিল যত্নত।

নরেন কোথা থেকে একটা বড়ো চাঙড়ি সংগ্রহ করে এনে তাদের বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। জমির সর্বত্রই পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতা। সেই শুকনো পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে চাঙড়ির ভিতরে রাখতে লাগল। চাঙড়ি পূর্ণ হলে পর সেটা নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপরে প্রত্যেক সিঁড়ির উপরে সেই শুকনো পাতাগুলো ছড়াতে ছড়াতে নরেন তাদের দ্বিতীয় বাড়ির ছান পর্যন্ত গিয়ে উঠল। চাঙড়ি খালি হলে পর সে আবার নেমে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

নরেন আর নারায়ণ পাশাপাশি বাস করত দুটি ঘরে। মাঝখানের একটি দরজা দিয়ে তারা পরস্পরের ঘরে আনাগোনা করতে পারত।

নরেন নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে নারায়ণের বিরাট নাসিকার বিকট গর্জন। সে আগে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে, তারপর মাঝের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে নারায়ণের ঘরে।

এর মধ্যেই নারায়ণ মৃত্যুবাদান করে গভীর নিদায় অচেতন হয়ে পড়েছে। তার নিদাকে নাম দেওয়া যেতে পারে ‘ইচ্ছানিদ্রা’—অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই সে একেবারে নিদ্রা-সাগরে তলিয়ে যেতে পারত।

নরেন সেই ঘরের বাইরে যাবার দরজাটির খিল ভিতর থেকে খুলে রাখলে। আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর একখানা ইজিচেয়ার টেনে এনে এমন জায়গায় রাখলে, আতে করে সেই চেয়ারে বসে মাঝের দরজা দিয়ে নারায়ণের শয়াটি ভালো করে দেখা যায়।

নারায়ণের ঘরের অঙ্ককার। নরেন নিজের ঘরের আলোও মিথিয়ে দিলে। তারপর ইজিচেয়ারের উপরে বসে হেলান দিয়ে অর্ধশয়ন অবস্থায় স্থির হয়ে উঠল।

রাত্রি ক্রমে বাড়ছে, শহরের নানান রকম গোলমাল ক্রমেই কমে আসছে। আরও খানিকক্ষণ কাটল। কলকাতার মুখ প্রায় বোবা হয়ে এল। টুং, টুং, টুং! ঘরের ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনিটো। শহর একেবারে নিসাড়। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায়, হঠাতে একটা পাঁচা বা কুকুরের চিৎকার। আকাশে বাতাসে বাজছে যেন বিম বিম বিম নীরবতার বীণা। এবং তারই মধ্যে ফাঁক পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভালো করে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঘরের ঘড়ির টিক টিক শব্দ।

ঘরে ঘরে ঘুমেচ্ছে শহরের জীবরা। কিন্তু নরেন তখনও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত—তার চক্ষে ঘুমের অতুকু আমেজ নেই।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। নরেন যখন ভাবছে আজকের মতো অনিদ্রাকে বরণ করা বোধ হয় ব্যর্থ

হয়ে গেল, তখন হঠাৎ সে সচমকে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল!

তার কান যা শুনতে চাইছিল, শুনতে পেয়েছে তা! এক রকম শব্দ হচ্ছে—মড় মড়, মড় মড়! কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে দোতলার ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

উৎকর্ষ হয়ে নরেন বসে রাইল পাথরের পুতুলের মতন। সিঁড়ির উপর শুকনো পাতার আর্টিলাদ। তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই পত্রমর্মর তার কানে করছে যেন মধুবৃষ্টি! অলঙ্কণ পরে সব চুপচাপ।

তারপরেই শোন গেল একটা কর্কশ শব্দ—যেন কেউ ধীরে ধীরে ঠেলে ও-ঘরের একটা দরজা খুলছে এবং আওয়াজ হচ্ছে দরজার তৈলহাইন কজ্জা থেকে। নরেন জানত, ও-ঘরের দরজা কেউ নিঃশব্দে খুলতে পারে না। তাই সে আজ নিজের হাতেই নারায়ণের ঘরের দরজার খিল খুলে রেখে এসেছে। সে আগেই অনুমান করেছিল, আজ এখানে কাকুর ভয়াবহ আবির্ভাবের সভাবনা আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, তার অনুমান যথ্য নয়।

নরেন উঠে দাঁড়াল এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে নিজের ঘরের ইলেক্ট্রিক সুইচের উপরে আঙুল রাখলে। তার ঢান হাতে একটি ছেটি রিভলভার। তারপর সে ঝাসকুদ্ব করে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা তখনও কার হাতের ঠেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তারপর দরজা হল নীরব। নরেন আরও আধ মিনিট অপেক্ষা করলে, তারপর হঠাৎ টিপে দিলে তার ঘরের আলোর সুইচটা। এ-ঘরের আলোটা ছিল এমন জায়গায় যে, সেটা জুললেই তার খানিকটা শিখা মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে।

আলো জ্বলেই নরেন দেখলে, নারায়ণের শয়াশায়ী দেহের উপরে ঝুকে রয়েছে একটা মৃতি এবং তার উদ্যত হাতে একখানা মস্ত চকচকে ছোরা!

পরমুহুর্তেই ছোরাখানা বোধ হয় নারায়ণের বক্ষ ভেদ করত কিন্তু নরেন হত্যাকারীকে অন্ত্র ব্যবহারের কোনওই সুযোগ দিলে না, লক্ষ হ্রির না করেই সে নিজের রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলে!

গুলিটা গিয়ে লাগল ও-ঘরের দেওয়ালের উপরে। সচকিত মৃত্যুটা হল বিদ্যুতের মতো অদ্যুৎ! এবং রিভলভারের গর্জে ঘূম ভেঙে গেল নারায়ণের। প্রথমটা সে হতভন্নের মতন চারিখারে তাকাতে লাগল। তারপর খাটের নীচে লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, ‘কী হয়েছে নরেন? তুমি রিভলভার ছুড়লে কেন?’

নরেন শাস্ত ভাবে সহজ স্বরে বললে, ‘তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।’

ওঁ। নঁ।

—‘সে আবার কী?’

বন্ধ।

—‘আর একটু হলেই খুনির ছোরা বিধিত তোমার বুকে।’

এবং ক্ষয়।

—‘আমি কিছুই বুবাতে পারছি না।’

—‘বোঝাবুঝি পরে হবে—এখন শীত্র আমার সঙ্গে এসো! সিঁড়ির ওপরে পাতার শব্দ শুনেই বুবেছি, খুনি আবার ছাদের দিকে উঠে গিয়েছে।’ বলেই নরেন বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং নারায়ণও ছুটল তার পিছনে।

ছাদে উঠে নরেন পকেট থেকে টর্চ বার করে চারিদিকে আলোক নিষ্কেপ করতে লাগল, কিন্তু কোথাও কারুকে দেখা গেল না।

নরেন বললে, ‘বুবেছি। এইদিকে এসো।’ সে দৌড়ে ছাদের একদিকে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে আলো ফেলে দেখলে, ছাদের জল বেক্ষণার লোহার পাইপ ধরে একটা মূর্তি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নারায়ণও মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তারপরেই প্রচণ্ড এক হঙ্কার দিয়ে সে-ও তাড়াতাড়ি পাইপ ধরে নীচের দিকে নামতে গেল। নরেন টপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, ‘করো কী নারায়ণ, করো কী! তোমার ওই বিপুল দেহের ভার এই তুচ্ছ পাইপটা কি সহ্য করতে পারবে? তুমি কি পাগল হয়েছ?’

তার কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার উপরে জাগল বিষম এক আর্তনাদ! কে চেঁচিয়ে উঠল—‘খুন করলে, আমাকে খুন করলে! হজুর, আমাকে রক্ষা করুন!’

—‘সর্বনাশ, এ যে বিজয়ের গলা!’ বলেই নরেন আবার ছাদের আলসের উপরে হমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখবার চেষ্টা করলে!

কিন্তু নিশ্চন্দ্র আকাশ ও ব্ল্যাকআউটের রাত্রি। দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় রস্তাহীন অন্ধকার। তবু যাতে কারুর গায়ে না লাগে এমন ভাবে নরেন বার-দুয়েক রিভলভার ছুড়লে—হত্যাকারীকে ভয় দেখবার জন্য। তারপর টর্চের আলো রাস্তার উপরে ফেলে দেখলে, ধূলোয় শুয়ে ছটফট করছে একটা মৃত্তি। সেখানে আর কারুকে দেখা গেল না, হত্যাকারী নিশ্চয়ই পলায়ন করেছে।

নরেন বললে, ‘নীচে নেমে চলো নারায়ণ, দেখি বিজয়ের আবার কী হল!’

দুজনে দ্রুতপদে সেই শুষ্কপর্ণে পরিপূর্ণ সোগানকে শব্দিত করতে করতে নেমে এল একতলায়। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

বিজয়ের স্থীর স্বর শোনা গেল, ‘হজুর, আর আমি বাঁচব না!’

নরেন বললে, ‘নারায়ণ, টর্চটা ধরো তো, আমি একবার বিজয়কে পরীক্ষা করে দেখি।’

নরেন টর্চটা নিয়ে বিজয়ের উপরে আলো ফেলে দেখলে, তার মুখ যন্ত্রণাবিকৃত এবং তার কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ।

নরেন লক্ষ করলে বিজয় ছোরার ঘা খেয়েছে কাঁধের উপরে। অল্পক্ষণ ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে সে বললে, ‘ভয় নেই বিজয়, এ-যাত্রা তোমাকে মরতে হবে না। তোমার আঘাত সাংঘাতিক নয়।’

বিজয় কিঞ্চিং আশ্চর্ষ স্বরে বললে, ‘ঠিক বলছেন হজুর? আপনি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছেন না তো?’

—‘না বিজয়, আমার কথা বিশ্বাস করো। কিন্তু তুমি এখানে কেন?’

বিজয় আস্তে আস্তে উঠে বসে বললে, ‘আপনার হস্ত তামিল করবার জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।’

—‘সংক্ষেপে সব কথা শুনিয়ে বলো।’

—‘হজুর বলেছিলেন, নৃপেশকে আমি যেন একবারও চোখের আড়াল না করি। আমি সেই ব্যারাকবাড়ির দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলুম। হঠাৎ দেখলুম অনেক রাতে দুটো লোক ছায়ার মতন সেই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন চারিদিকে ঘৃঘৃট করছে অন্ধকার, তারা যে কারা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই একটা লোক সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি জুললে, আর সেই আলোতে দেখা গেল নৃপেশের মুখখানা। তারপর তারা অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল, কেবল শোনা যেতে লাগল তাদের পায়ের জুতোর শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতেই আমি তাদের পিছু নিলুম, এপথ-ওপথ ঘুরে শেষটা তারা এসে দাঁড়াল আপনাদের এই বাড়ির কাছে। তারপর তাদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারা যে অন্ধকারে কী করছে না করছে কিছুই বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলুম। এগুলে ভরসা হল না, পাছে তাদের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ি।

এমনইভাবে খানিকক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ বাড়ির ভিতরে শুনলুম রিভলভারের আওয়াজ। আমি তো ভয়ে একেবারে হতভস্ত হয়ে গেলুম, ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারলুম না। তার খানিক পরেই দেখলুম ছাতের ধারে জলে উঠেছে আপনার টর্চের আলো আর জলের নল ধরে তড়বড় করে নীচের দিকে নেমে আসছে একটা লোক। রাস্তায় পড়েই লোকটা ছুটতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হঁশ হল। সে যেই আমার সামনে এসে পড়ল, আমি তখনই তাকে দৃষ্টি হাতে জড়িয়ে ধরলুম। খানিকক্ষণ বাটাপটির পরেই লোকটা আমাকে ছুরি মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে আবার পালিয়ে গেল।’

নারায়ণ কুদ্দ স্বরে গর্জন করে বললে, ‘ব্যাটা যদি পড়ত আমার হাতে, তাহলে ছোরাসুন্দ হাতখানা ঢুকিয়ে দিতুম তার পেটের ভিতরে! একেবারে কীচক-বধ করে ছাড়তুম?’

নরেন একটু চুপ করে থেকে বললে, ‘বিজয়, তুমি ঠিক দেখেছ তো, আমার বাড়ির সামনে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল?’

বিজয় বললে, ‘অঙ্ককারে ঠিক দেখেছি কি না কী করে বলব হজুর? তবে এইটুকু শুনেছি, দু-জোড়া পায়ের শব্দ আপনার বাড়ির সামনে এসেই থেমে গিয়েছিল।’

নরেন ভাবতে ভাবতে বললে, ‘তাহলে আর একটা লোক কোথায় গেল?’

নারায়ণ বললে, ‘ওসব কথা পরে ভাবলেও চলবে। বিজয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে এখনও রক্ত বেকচে, আগে ও-জায়গাটা ব্যাকেজ দিয়ে বেঁধে রাখা দরকার।’ বলেই সে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের দেহ পথ থেকে তুলে নিলে শিশুর মতো।

বিজয়ের ক্ষতস্থান ধূয়ে ও বেঁধে দিয়ে একটা ঘরে তাকে সে-রাতের মতো শুইয়ে রেখে তারা দুজনে আবার উপরে গিয়ে উঠল।

নরেন নিজের ঘরে চুকেই দেখলে, চারিদিকে একটা বিশ্বালার দৃশ্য এবং তার বড়ো টেবিলের দেরাজগুলো সব খোলা! সে ছুটে গিয়ে একটা খোলা দেরাজের ভিতরে হস্ত সঞ্চালন করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ‘নারায়ণ, আমার ঘরেও চোর এসেছিল।’

—‘সে কী! কখন এল?’

—‘খুব সম্ভব একটা লোক নল বেয়ে উঠেছিল ছাতের উপরে আর একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল পাহারা দেবার জন্য। প্রথম লোকটা বিজয়কে ছোরা মেরে পালিয়ে যাবার পর আমরা যখন সদর খুলে রাস্তায় আসি, দ্বিতীয় লোকটা সেই সময়ে আঁধারে গা ঢুকি দিয়ে বাড়ির ভিতরে এসে চুকেছিল। তারপর আমরাও রইলুম বিজয়কে নিয়ে বাস্ত, আর শে-ও আমার ঘরে চুকে কাজ হাসিল করে আবার দিলে লম্বা! নারায়ণ, এ হচ্ছে অসভ্য-ব্রহ্ম দুসাহসী চোর! চোর যে কে, তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।’

—‘কে সে?’

—‘নৃপেশ ছাড়া আর কেউ নয়।’

১৪

—‘কেমন করে জানলে?’

—‘বিজয় ঘচক্ষে দেশলাইয়ের আলোতে দেখেছে নৃপেশের মুখ। কিন্তু আমি দেখেছি ছোরা নিয়ে তোমার বুকের উপরে যে-লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, সে নৃপেশ নয়। সূতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে-লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল সেই হচ্ছে নৃপেশ।’

—‘কিন্তু সে কী চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে?’

নরেন চোয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, ‘সেই কাচের কুণ্ডি আঁশ চিঠিকানা।’

নারায়ণ খুশি হয়ে বললে, ‘বাঁচা গেল! কাচের চুঙি আর চিঠি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই! আমি ভেবেছিলুম, চোর বাটা বুঝি কোনও দায়ি জিনিস নিয়ে সরে পড়েছে।’

চেয়ারের হাতলের উপরে আঙুল দিয়ে মৃদু আধাত করতে করতে নরেন বললে, ‘উষ্ণ, তোমার কথা মানতে পারবু না। ও-দুটো জিনিস নিশ্চয়ই মূল্যবান! নইলে ও-দুটোর জন্যে ওদের এটটা মাথাব্যথা হবে কেন? হয়তো ওই চুঙি আর চিঠি যে আমাদের হাতেই পড়েছে, ওরা নিশ্চিতরাপে সেকথা জানত না। হয়তো ওরা এসেছিল আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে, তারপর দৈবগতিকে পথ খোলা পেয়ে নৃপেশ বাড়ির ভিতরে চুকে দেখতে এসেছিল তার সন্দেহ সত্য কি না—অর্থাৎ চুঙি আর চিঠি আমাদের কাছেই আছে কি না।’

—‘তাহলে তুমি জানতে যে ওরা আজ এখানে আসবে?’

—‘জানতুম বলা ঠিক হবে না, তবে আন্দাজ করেছিলুম আজকালের মধ্যেই ওদের এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।’

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, ‘আশ্চর্য তোমার আন্দাজ! এরকম আন্দাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।’

নরেন দৃঢ় শ্বরে বললে, ‘নিশ্চয়ই পাওয়া যায়! এইটুকু মনে রেখো, এরা সাধারণ অপরাধী নয়। এরা হচ্ছে শক্রপক্ষের গুণ্টুর। বাংলা দেশের ভিতরে এরা একটা প্রকাণ্ড দল গঠন করেছে। এরা জানে, খুব গোপনে আর তাড়াতাড়ি কাজ করতে না পারলে ধরা পড়তে হবে, আর ধরা পড়লে সকলকেই চড়তে হবে ফঁসিকাটে। আমার দৃঢ় ধারণা, ওই চিঠি আর চুঙির ভিতরেই এই মামলাটার সমস্ত রহস্যের চাবি লুকানো আছে। ওরা যে-মুহূর্তে সন্দেহ করতে পারলে যে, এই মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছি আমরা আর মামলার ভার পেয়েই আমরা হস্তগত করেছি ওদের বধ করবার ব্রহ্মাণ্ড, সেই মুহূর্তেই স্থির করে ফেললে, ভিতরের কথা প্রকাশ পাবার আগেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের পথ থেকে সরাতে নয় চিঠি আর চুঙি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ওদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—চিঠি আর চুঙি গিয়েছে আবার ওদের পকেটেই। নারায়ণ, এখন বুবাতে পারছ, কেন আমি আন্দাজ করেছিলুম যে, আমাদের বাড়িতে আসতে ওরা বিলম্ব করবে না?’

—‘হ্যাঁ, তুমি বুঝিয়ে দিলে, তাই বুবালুম। কিন্তু আর একটা ব্যাপার এখনও বোঝা যাচ্ছে না। চিঠিখানা আমি পড়ে দেখেছি, কিন্তু ওই চুঙির ভিতরে কী আছে সেটা তুমি জানতে পেরেছ কি?’

—‘পরীক্ষা করে জানতে পেরেছি বই কি?’

—‘কী জেনেছ শুনি?’

রহস্যময় হাসি হেসে নরেন বললে, ‘এখনও তোমাকে বলবার সময় হয়নি।’

নারায়ণ চট্টে বললে, ‘তুমি চুলোয় যাও!’

চতুর্থ ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ

দিন-তিনেক পরেকার কথা। ডন-বৈঠক দেওয়া এবং মুণ্ডুর ভাঁজা শেষ করে নারায়ণ বারান্দার উপরে হাত-পা ছাড়িয়ে বসে হাঁপ ছাড়ছিল। এমন সময়ে নরেনের আবির্ভাব। নারায়ণ ভুক্ত কুঁকে

বিরক্ত কষ্টে বললে, ‘আজ তিন দিন ধরে দেখছি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একলাই হাওয়া খেতে যাচ্ছ’।

নরেন বললে, ‘হাওয়া খেতে নয় ভাই, কিছু কিছু খোঁজখবর নিতে।’

—‘কীসের খোঁজখবর? পঞ্চমবাহিনীর?’

—‘তা ছাড়া আবার কী।’

নারায়ণ মেঝের উপরে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে ক্রুদ্ধ হ্বরে বললে, ‘না, না, এসব ব্যাপারে তোমার একলা যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না।’

—‘কেন?’

—‘ওরা হচ্ছে ভয়ানক বিপজ্জনক লোক! একলা ওদের হাতে পড়লে কিছুতেই তুমি আর বেঁচে ফিরে আসবে না! তুমি যতবড়ে চালাক লোকই হও না কেন, হাতাহাতির সময় তুমি হচ্ছ একটি সামান্য শিশু! তোমার রক্ষকর্তা হতে পারি একমাত্র আমি। এর পরে আমাকে ছেড়ে তুমি রাস্তায় এক পা বেরতে পারবে না।’

নরেন হেসে বললে, ‘তথাস্ত! কিন্তু ভায়া, আর একটা কথাও ভেবে রেখো। যে-দলের পিছনে আমরা লেগেছি, সে-দলে গুভা আর ডাকাতও থাকতে পারে, আর সময়ে সময়ে তারা গায়ের জোরে বা সাধারণ অন্তর্ভুক্ত চালিয়েও নরহত্যা করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপত্রির নরহত্যার আসল পদ্ধতি হচ্ছে আরও সূক্ষ্ম! সেখানে তোমারও গায়ের জোর কোনও কাজেই আসবে না।’

—‘ভাই নাকি?’

—‘হ্যাঁ। এই রকমই আমি আন্দাজ করছি।’

—‘নরেন, তোমার আন্দাজের ধাক্কা সহ্য করা ক্রমেই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। তোমাকে নিয়ে আর আমি পারব না, তুমি স্তুত হও।’

—‘উত্তম! তোমাকে একটা খবর দিয়েই আমি মৌনব্রত অবলম্বন করব।’

—‘কী খবর?’

বারান্দার কোণ থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে নারায়ণের সামনে বসে পড়ে নরেন বললে, ‘তুমি জানো, এই মামলায় আমার আগ আরও তিনজন গোয়েন্দা একই নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়েছে? আমি খবর নিয়ে জানলুম বে, ওই তিন গোয়েন্দারই চিকিৎসার ভার গোয়েছিল একই ডাক্তার।’

সামনের একখানা রেকাবি থেকে এক মুঠো ভিজে ছোলা তুলে নিয়ে নারায়ণ নিজের বদন-গহুরে নিষ্কেপ করলে। তারপর চৰ্ণ করতে করতে বললে, ‘তাকে হয়েছে কী?’

—‘হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। ডাক্তারটির নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ, বিলাত ফেরত। ডাক্তারটি একবার জাপানেও বেড়িয়ে এসেছেন। পুলিশ মহলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাই পুলিশ বিভাগের অনেকেই অসুখে পড়লে তাঁকেই আহ্বান করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে একটি ব্যাপার।’

—‘কী?’

—‘একই নিউমোনিয়া রোগে তিন গোয়েন্দার মৃত্যু, আর একই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষের চিকিৎসা।’

নারায়ণ একটু ভেবে বোঝবার চেষ্টা করে বললে, ‘আমি তো এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো কলকাতায় নিউমোনিয়া রোগের প্রদুর্ভাব হয়েছে।’

—‘না, তা হ্যানি। সে খোঁজও আমি নিয়েছি। কলকাতায় এখন নিউমোনিয়া রোগের বাড়াবাড়ি

নেই। আর বাড়িবাড়ি হলেও পরে পরে একই মামলায় নিযুক্ত তিনজন গোমেন্দাই যদি একই ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে নিউমোনিয়ায় মারা পড়ে, তাহলে শুনতে যেন কেমন কেমন লাগে না?’

নারায়ণ হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, ‘বন্ধু, তুমি একটি মৃত্যুমান হেঁয়ালি। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’

—‘বুঝেও কাজ নেই। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসা হচ্ছে ডাহা বোকামি।’ উঠে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলতে বলতে নরেন নিজের ঘরে গিয়ে চুকল।

সে জামাকাপড় ছেড়ে সবে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হলেন শচীনবাবু। আসন প্রহণ করবার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘মামলাটার কোনও হদিশ করতে পারলেন?’

নরেন বললে, ‘কী যে বলেন! এতবড়ো একটা মামলা, আপনাদের মতন মস্ত মস্ত সব মাথা থাকতেও তিনি বেচারা গোমেন্দার প্রাণ গেল, আর আমি এর মধ্যেই কিনারায় গিয়ে পৌঁছোব? তাও কখনও হয়।’

শচীনবাবু একখানা আসনের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে হাসতে হাসতে বললেন, ‘ভগবান সহায় থাকলে সবই হতে পারে নরেনবাবু! আমরা এখনও মামলাটার ঠিক কিনারা না করতে পারলেও ভাগাঞ্চে হঠাৎ দু-একটা গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।’

জিজ্ঞাসু চোখে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে নরেন বললে, ‘হঠাৎ?’

—‘হ্যাঁ, হঠাৎ। একরকম দৈবগতিকে আর কী! ব্যাপারটা শুনবেন?’

—‘নিশ্চয়ই।’

—‘যেখানে বাধের ভয় সেখানেই সংকে হয়। আজ সকালে আমার এক বন্ধুকে ফোন করে শুনলুম অচেনা দুজন লোকের গলা! অর্থাৎ cross connection আর কী! প্রথম ব্যক্তি বলছে, ‘ছোটোবাবু, নর-নারায়ণকে আপনি বোধহয় এখনও ভালো করে চেমেননি। তারা যে মামলার ভার হাতে নেয়, তার শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ে না।’ দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, ‘ন্যশেশ, থো করো তোমার নর-নারায়ণের কথা! আমিও তাদের শেষ না করে ছাড়ব না।’ ন্যশেশ নামধারী ব্যক্তি বললে, ‘তাহলে আমার উপরে কী হ্রক্ষম হয় বলুন?’ সেই ছোটোবাবু বললে, ‘আসছে অমাবস্যার রাত্রে ঠিক বারোটার সময় চার নম্বরের বাড়িতে একটা বড়ো পরামর্শ-সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় আমাদের দলের সবাইকে যোগ দিতে হবে। তোমরাও যেন ভুলো না।’ ন্যশেশ বললে, ‘আমাদের বড়োবাবুও কি সেখানে হাজির থাকবেন?’ ছোটোবাবু বললে, ‘নিশ্চয়ই।’ তিনিই তো সভ আহ্বান করেছেন আর সভাপতি হবেন তিনিই।’ ন্যশেশ খুশি গলায় বললে, ‘তাহলে এতদিন পরে বড়োবাবুকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাব?’ ছোটোবাবু বললে, ‘মূর্খ! আমি ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ বড়োবাবুর মুখ দেখেনি, কখনও দেখতেও পাবে না। বড়োবাবু সভায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ ঢাকা থাকবে কালো কাপড়ের মুখোশে। খালি বড়োবাবু নয়, তোমাকে আমাকে আর অন্য সবাইকেও সেদিনকার সভায় যেতে হবে মুখোশে মুখ দেকে। যথাসময়ে তোমাদের সবাইকেই এক একটি মুখোশ উপহার দেওয়া হবে।’ ন্যশেশ বললে, ‘নিজেদের আস্তানায় এতটা লুকোচুরির কারণ কী ছোটোবাবু?’ জবাব হল, ‘ন্যশেশ, আমরা যে কাজে নেমেছি, তাতে পদে পদে মৃত্যু-ভয়। আমাদের দলে লোক আছে অনেক। ভয়ে বা অর্থলোভে বা বাধ্য হয়ে পরে হয়তো কেউ বিশ্বাসঘাতকও হতে পারে। সেইজনেই এই সাবধানতা। বড়োবাবু চান না যে, তাঁর দলের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমরা আসবে, কেউ কারকে চিনবে না, অর্থ এক জায়গায় বসে বড়োবাবুর সমস্ত উপদেশ শুনতে পাবে।’ ন্যশেশ বললে, ‘বড়োবাবুর হ্রক্ষম

তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্বদা শুনতে পাই! তবে হঠাতে এতবড়ো সভার আয়োজন কেন?’ ছোটোবাবু বললে, ‘নৃপেশ, তুমি জানো, বড়োবাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কাকর কোনওই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিষ্ণুত্ব লোক বলেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বক্তু জাপানিরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানিরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কৌ করতে হবে তানো? তখন আমাদের’ ... এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে cross connection-এর পালা হঠাতে সাঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম বটে, তবু যত্নুকৃ শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?’

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ করে শচীনবাবুর কপাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্চসিত কঠিনে বলে উঠল, ‘নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টেরও বেশি!’

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চূপ করে পসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, ‘আসছে অমাবস্যার রাত বারোটার সময়। তার মানে, ঠিক আর সাত দিন পরে। চার নম্বরের বাড়ি। চার নম্বরের বাড়ির কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়?’

শচীনবাবু বিশ্বিত ঘরে বললেন, ‘চার নম্বরের বাড়ির কথা আপনারাও জানেন?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বরের নয়, তিন নম্বরের বাড়ির কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।’

—‘তাহলে এ মামলার ভিতরে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন? কিছু কিছু সূত্রও পেয়েছেন?’

—‘হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বটে। ওই নৃপেশ বাবাজির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটোবাবুর নামও আমরা শুনেছি, আর বড়োবাবুরও অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করেছি।’

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিশ্ফারিত করে বললেন, ‘বটে, বটে, বটে! অথচ এমন সব জবর খবর এখনও আমাকে দেননি?’

—‘এখনও দেবার সময় হয়নি শচীনবাবু! এতক্ষণ আমরা দুজনে ছিলুম ত্রয়াক নাটকের প্রথম অঙ্কে। আপনার cross connection-এর মহিমায় এখন আমরা এসে পড়েছি দ্বিতীয় অঙ্কে। এইবারে আশা করি তৃতীয় অঙ্কের শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আর আমাদের বেশি দেরি নাগবে না। কী বলো হে নারায়ণ?’

নারায়ণ মস্তকান্দোলন করে বললে, ‘ধেং, আমি কিছুই বলি না—যতক্ষণ না ব্যাটাদের মুণ্ডগুলো হাতের কাছে পাই, ততক্ষণ আমি একেবারে বোবা হয়ে থাকতে চাই! আমি কথার মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজের মানুষ!’

শচীনবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচার্যিতে চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে নিজের বুকের উপরে হাত রেখে যন্ত্রণাবিকৃত ঘরে বলে উঠল, ‘উঃ!’

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে নরেনবাবু? অমন করছেন কেন?’

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণ ঘরে বললে, ‘কেন জানি না, বোধহয় আমার বিষম সর্দি লেগেছে। বুকে দারুণ বাথ। মাঝে মাঝে যাতান আর সহ করতে পারছি না।’

নারায়ণ বিশ্বিত কঠিনে বললে, ‘কই নরেন, তোমার অসুবের কথা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি?’

নরেন তেমনি ভাবেই বললে, ইচ্ছা করেই বলিনি। কারণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠো। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমার নিশ্চাস ফেলতেও কঠ হচ্ছে।’

শচীনবাবুর দৃই চক্ষে রীতিমতো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্ত কষ্টে বললেন, 'আ এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাঙ্কার ডাকাননি কেন?' ১

নরেন বললে, 'হ্যাঁ, আমার ডাঙ্কার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাঙ্কারকে ডাকতে এ তয় হয়! আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু?'

—'কেন, আমাদের চন্দনাথকে ডাকুন না! পুলিশের অনেকেই বলে, তাঁর মতন তালো ড নাকি খুব কমই আছেন।'

—'চন্দনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন?'

১ ছবি

—'বছকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে কর্মায় গিয়েছিল।'

—'কেন?'

—'এক ধরী রোগীর আহসানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা বর্মা আ করে। তারপর থেকে কিছুদিন চন্দনাথের আর কোনও খোজ খবর পাওয়া গেল না, আমরা অ করলুম সে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দনাথের দেখা আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দনাথ বললে, জাপানিরা দেশে দখল করবার আগেই সেখান সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে অনেক বনজঙ্গল পাহাড় নদী পার বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে। তার মুখে জাপানিদের নিষ্ঠ যেসব বর্ণনা শুনেছি তা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।'

নরেন বললে, 'চন্দনাথবাবু জাপানিদের উপরে নিশ্চয়ই বুব ঢেটে আছেন?'

—'সে কথা আর বলতে? জাপানিদের কাছে পেলে চন্দনাথ বোধ হয় খালি হাতেই মাথা ফেলে।'

—'চন্দনাথবাবু বুঝি সর্বদাই জাপানিদের নিন্দা করেন?'

—'জাপানিদের নিন্দা ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটেই শাভাবিক। জাপানিদের জন্যে তো কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানিদের অনেক কথাই স্পাবেন। চন্দনাথকে খবর দেব কি?'

—'শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধ হয় মিউনোনিয়া হবে। কলকাতায় ই নিউমোনিয়া এবারে মারাঞ্জক কাপে দেখা দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরও অদ্বলোক এই রোগে মরা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাঙ্কা চন্দনাথ ঘোষই চিকিৎসা করে তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর উপরে আমি চিকিৎসার তার দিলে কোনও বিপণনা তো?'

—'নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত—ডাঙ্কার হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায় ডাঙ্কার কাকুকেই বাঁচাতে পারে না।'

নরেন অধিকতর ক্রিয় কষ্টে বললে, 'সেকথা আমিও মানি। বেশ তবে চন্দনাথকেই খবর।'

নারায়ণ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'না, না, না! ওই চন্দনাথকে ডাকা হতেই পারে না! হাতে পড়ে তিনজন...' বলতে বলতে হঠাৎ খেমে গেল, কারণ সে আরও কিছু বলবার আগেই গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষম এক চিমটি কেঁটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, 'আপনি কী বলছিলেন নারায়ণবাবু?'

নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, 'নারানের কথা নিষ্ঠে আপনি শাখা ধারাবে

তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্বদা শুনতে পাই! তবে হঠাতে এতবড়ো সভার আয়োজন কেন?’ ছোটোবাবু বললে, ‘ন্যূণেশ, তুমি জানো, বড়োবাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কাকর কোনওই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক বলেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বস্তু জাপানিরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানিরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কী করতে হবে তানো? তখন আমাদের’... এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে cross connection-এর পালা হঠাতে সঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তিত হলুম বটে, তবু যত্কূ শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?’

‘ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ করে শচীনবাবুর কথাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্ছুসিত কঠে বলে উঠল, ‘নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টেরও বেশি!’

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, ‘আসছে অমাবস্যার রাত বারোটাৰ সময়। তার মানে, ঠিক আৱ সাত দিন পৰে। চার নম্বৰের বাড়ি। চার নম্বৰের বাড়ির কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়?’

শচীনবাবু বিশ্বিত স্বরে বললেন, ‘চার নম্বৰের বাড়ির কথা আপনারাও জানেন?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বৰের নয়, তিন নম্বৰের বাড়ির কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।’

—‘তাহলে এ মামলার ভিতৱ্যে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন? কিছু কিছু সূত্রও পেয়েছেন?’

—‘হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বটে। ওই ন্যূণেশ বাবাজিৰ সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটোবাবুৰ নামও আমরা শুনেছি, আৱ বড়োবাবুৰও অস্তিত্ব আমরা কলনা কৰেছি।’

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিশ্ফারিত করে বললেন, ‘বটে, বটে, বটে! অথচ এমন সব জবৰ খবৰ এখনও আমাকে দেননি?’

—‘এখনও দেবাৰ সময় হয়নি শচীনবাবু! এতক্ষণ আমরা দুজনে ছিলুম ত্ৰ্যাক নাটকেৰ প্ৰথম অংকে। আপনার cross connection-এৰ মহিমায় এখন আমৰা এসে পড়েছি দিতীয় অংকে। এইবাবে আশা কৰছি তৃতীয় অক্ষেৰ শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আৱ আমাদেৱ বেশি দেৱি লাগবে না। কী বলো হে নারায়ণ?’

নারায়ণ মস্তকাদোলন কৰে বললে, ‘ধৈৰ্য, আমি কিছুই বলি না। যতক্ষণ না ব্যাটাদেৱ মৃগুগুলো হাতেৰ কাছে পাই, ততক্ষণ আমি একেবাৰে বোৰা হয়ে থাকুন্ত চাই! আমি কথাৰ মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজেৰ মানুষ!’

শচীনবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচত্বিতে চেয়াৰেৰ উপৰে হেলে পড়ে নিজেৰ বুকেৰ উপৰে হাত রেখে যন্ত্ৰণাৰিকৃত স্বৰে বলে উঠল, ‘উঃ!’

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে নরেনবাবু? অমন কৰাছেন কেন?’

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণ স্বৰে বললে, ‘কেন জানি না, বোধহয় আমাৰ বিষয় সদি লেগেছে। বুকে দাঁৰণ বাথা। মাৰে মাৰে যাতনা আৱ সহজ কৰতে পাৰেছি না।’

নারায়ণ বিশ্বিত কঠে বললে, ‘কই নরেন, তোমাৰ অসুখেৰ কথা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি?’

নরেন তেমনি ভাবেই বললে, ‘ইচ্ছা কৰেই বলিনি। কাৰণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠো। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমাৰ নিশ্চাস ফেলতেও কঠ হচ্ছে।’

শচীনবাবুর দুই চক্ষে রীতিমতো আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্ত কঢ়ে বললেন, ‘আপনার এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাক্তার ডাকাননি কেন?’

নরেন বললে, ‘হ্যাঁ, আমার ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাক্তারকে ডাকতে আমার তয় হয়! আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু?’

—‘কেন, আমাদের চন্দনাথকে ডাকুন না! পুলিশের অনেকেই বলে, তাঁর মতন ভালো ডাক্তার নাকি খুব কমই আছেন।’

—‘চন্দনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন?’

চন্দন

—‘বহুকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে বর্মায় গিয়েছিল।’

—‘কেন?’

—‘এক ধনী রোগীর আহসানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা বর্মা আক্রমণ করে। তারপর থেকে কিছুদিন চন্দনাথের আর কোনও খোঁজ খবর পাওয়া গেল না, আমরা আন্দাজ করলুম সে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দনাথের দেখা পেলুম। আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দনাথ বললে, জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করবার আগেই সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে অনেক বনজঙ্গল পাহাড় নদী পার হয়ে বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে। তার মুখে জাপানিদের নিষ্ঠুরতার যেসব বর্ণনা শুনেছি তা শুনলে আপনার গায়ে কঁটা দেবে।’

নরেন বললে, ‘চন্দনাথবাবু জাপানিদের উপরে নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন?’

—‘সে কথা আর বলতে? জাপানিদের কাছে পেলে চন্দনাথ বোধ হয় খালি হাতেই মাথা কেটে ফেলে।’

—‘চন্দনাথবাবু বুঝি সর্বদাই জাপানিদের নিম্না করেন?’

—‘জাপানিদের নিম্না ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটৈই শাভাবিক। জাপানিদের জন্যে তাকে তো কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানিদের অনেক কথাই শুনতে পাবেন। চন্দনাথকে খবর দেব কি?’

—‘শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধ হয় নিউমোনিয়া হবে। কলকাতায় হয়তো নিউমোনিয়া এবারে মারাঘৃক রাপে দেখা দিবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরও তিন ভদ্রলোক এই রোগে মারা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাক্তার চন্দনাথ ঘোষাই চিকিৎসা করেও ওই তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেননি। তাঁর উপরে আমার চিকিৎসার ভাব দিলে কোনও বিপদ হবে না তো?’

—‘নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত—ডাক্তাররা হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায় ফুরুলে ডাক্তাররা কারুকেই বাঁচাতে পারে না।’

নরেন অধিকতর ক্রিয় কঢ়ে বললে, ‘সেকথা আমিও মানি। বেশ তবে চন্দনবাবুকেই খবর দিন।’

নারায়ণ হঠাৎ চিংকার করে বলে উঠল, ‘না, না, না! ওই চন্দনবাবুকে ডাকা হাতেই পারে না! ওরই হাতে পড়ে তিনজন...’ বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল, কারণ সে আরও কিছু বলবার আগেই নরেন গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষয় এক চিমটি কেটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, ‘আপনি কী বলছিলেন নারায়ণবাবু?’

। নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, ‘নারায়ণের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না।

ও হচ্ছে একটি আস্ত পাগল! আমি কিন্তু আর কষ্ট সহিতে পারছি না। হয়তো এখনও চিকিৎসার সময় অতীত হয়ে যায়নি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখনই একবার চন্দ্রবাবুকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি অতিশয় বাধিত হব।’

শচীনবাবু তৎক্ষণাত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমার যাবার পথেই চন্দ্রবাবুর বাড়ি পড়ে। আমি তাঁকে সব কথা জানিয়ে এখনই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাকে হারালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরাই।’ বলেই তিনি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নারায়ণ ক্ষুঁ স্বরে বললে, ‘নরেন, তুমি হঠাতে অত জোরে আমাকে চিমটি কাটলে কেন?’

নরেন কৃক্ষ কঠে বললে, ‘কেন? সেকথা পরে শুনো অখন। তুমি খালি হস্তীমূর্খ নও, তুমি হচ্ছ গণমূর্খ!’

নারায়ণ কাঁচুমাচু মুখে বললে, ‘তুমি আমাকে এমন শক্ত শক্ত গালাগাল দিছ কেন নরেন? আমি কী মূর্খতা প্রকাশ করেছি?’

—‘তুমি কিছু করোনি। তুমি এখন দয়া করে নিজের ঘরে যাও। তারপরে যত-খুশি খাবারের পাহাড় খণ্ড খণ্ড করে কোঁৎকোঁৎ করে গিলে নিজের উদ্দরকে হিণুণ, ত্রিণুণ বা চতুর্ণুণ করে তোলো। আজ আর আমি তোমাকে কোনও বাধা দেব না। আজ কেবল দয়া করে এইটুকু মনে রেখো, এখনই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে দেখতে আসবেন। যতক্ষণ তিনি থাকবেন, এ ঘরে যেন তোমার চিকিৎসা দেখতে না পাই। আমার এ অনুরোধ রাখবে কি?’

নারায়ণ দস্তরমতো হতভেবের মতন নরেনের দিকে তাকিয়ে রাইল কিছুক্ষণ। তারপর একটিমাত্র কথা উচ্চারণ না করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন নিজের মনেই মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিলে। তারপর একটা টেবিল টেনে নিজের খাটের পাশে এনে রাখলে। টেবিলের উপরে হাপন করলে একই রকমের ছোটো ছোটো চার-পাঁচটা গেলাস—যে-রকম গেলাসে সোকে তরল ওষুধ পান করে। একটা ছোটো কাচের ঢাকান আগে নিজের বালিশের তলায় রেখে খাটের উপরে উঠে শয়ন করলেন। তারপর দুই চক্ষু মুদ্রিত করে নিস্পন্দ হয়ে ওয়ে রাইল।

মিনিট-পাঁচিশ পরেই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ মৃত্তি, রং ফরসা, পরনে কোট-পেন্টলুন। চক্ষুদুটি ছোটো হলেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে তৌকু বুদ্ধির দৈশ্বি। নাক দেখলে মনে পড়ে শুকচপ্প। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসির প্লেপ ফ্রেন কখনও শুকোয় না।

সচমকে চক্ষু মেলে নরেন বললে, ‘কে? কে আপনি প্রাপনি কি চন্দ্রবাবু শচীনবাবু এইমাত্র যাঁর কথা বলে গেলেন?’

বিমীত ভাবে দৈবৎ অবনত হয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ। শচীনবাবুর মুখে শুনলুম, আপনি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ?’

যন্ত্রণা-ভরা কঠে নরেন বললে, ‘হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, বড়েই কষ্ট পাচ্ছি। আমার কী হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার নিশ্চাস ক্রমেই যেন বন্ধ হয়ে আসছে।’

চন্দ্রবাবু কোনও কথা না বলে একখানা চেয়ার টেনে এনে নরেনের শ্যায়ার পাশে আসন প্রস্তুত করলেন। তারপর গাঁটার ভাবে স্টেথসকোপটি বার করে নরেনের পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওষ্ঠাধর মৃদু হাসো রাঙ্গিত করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন, ‘আপনার কোনও ভয় নেই।

যথাসময়েই আমায় ডেকেছেন—যদিও আরও-কিছু আগে ঘবর গেলে আরও শীঘ্ৰ আপনাকে নিরাময় করতে পারতুম। আপনার পীড়া গুৰুতর হয়ে ওঠবাব উপক্ৰম কৰাছে বটে, তবু যাতে আপনি দৃতিন দিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ কৱেন আমি সেই-ৱকমই একটি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।'

নৱেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দিন ডাঙ্গারবাবু, আমি চিৰদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

চন্দনাথের অমন নিষ্ক হসিমাখা গুষ্ঠাধৰের দুই প্রাপ্ত হঠাতে কেমন কঠিন হয়ে উঠল—কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে! তাৱপৱেই তিনি রোগীৰ দেহেৰ উপৰে ঝুকে পড়ে প্ৰশান্ত হৰে বললেন, 'কোনও ভয় নেই নৱেনবাবু। আপনার পীড়া এখনও গুৰুতৰ হয়ে ওঠেনি।' চন্দ্ৰবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশেৰ টেবিলেৰ উপৰ থেকে একটি ওষুধ পান কৱবাব ছোটো কাচেৰ গেলাস সামনেৰ দিকে ঢেনে আনলেন। তাৱপৱ তিনি নিজেৰ ব্যাগেৰ ভিতৰ থেকে একটি বড়ো শিশি বাব কৱে সেই গেলাসেৰ ভিতৰে ঢাললেন খানিকটা তাৰল পদাৰ্থ। তাৱপৱ সেই ছোটো ঔষধেৰ গেলাসটি তুলে নিয়ে নৱেনেৰ দিকে পিছন ফিৰে দাঁড়িয়ে কী যে কৱলেন, সেটা বোৰা গেল না।

মুখেৰ উপৰ থেকে সমস্ত যন্ত্ৰণাৰ চিহ্ন মুছে ফেলে নৱেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ চোখে চন্দনাথেৰ পিছন দিকে তাকিয়ে রইল। ডাঙ্গাৰ যেই আবাৰ সামনেৰ দিকে ফিৰলেন অমনি মুখেৰ ভাৱ বদলে ফেলে কাতৰ কঠে নৱেন বললে, 'ডাঙ্গারবাবু, বড়ো কষ্ট হচ্ছে।'

চন্দ্ৰবাবু ঔষধেৰ গেলাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা থেয়ে ফেলুন, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে।'

নৱেন থৰ থৰ কম্পিত হস্তে ঔষধেৰ পাত্ৰিটি গ্ৰহণ কৱে ক্লান্ত কঠে বললে, 'ডাঙ্গারবাবু, আপনাদেৱ আ্যালোপ্যাথিক ওষুধ থেকে আমাৰ বড়ো ভয় হয়! যদি আপনি কিছু মনে না কৱেন, একটি অনুৰোধ কৱতে পাৰি কি?'

—'নিশ্চয়ই পাৱেন! বলুন, আপনি কী বলতে চান?'

—'ঘৰেৱ বাইৱে ওই বারান্দাৰ ডান পাশেই যাকে আমাৰ তোয়ালে টাঙানো আছে। আ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আমি কখনও খাইনি—কী জানি যদি বমন হয়? আপনি অনুগ্ৰহ কৱে তোয়ালেখানা একবাৰ এনে দেবেন কি?'

—'একথা আবাৰ বলতে! নিশ্চয়ই আমি এনে দেব!' বলেই চন্দ্ৰবাবু ঘৰেৱ বাইৱে গেলোন।

সেই মুহূৰ্তে নৱেনেৰ সমস্ত জড়তা এবং অসহায়তাত ভাৱ অদৃশ্য হয়ে গেল। চন্দ্ৰবাবুৰ দেওয়া ঔষধেৰ পাত্ৰিটি বিদ্যুৎৰেগে সে হেঁট হয়ে খাটেৰ তলায় রেখে দিলৈ এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিশেৰ তলা থেকে ঢাকনিটি বাব কৱে তাৰ উপৰে দিলৈ চাপা। তাৱপুৰ খাটেৰ পাশেৰ টেবিলেৰ উপৰ থেকে ঠিক সেই-ৱকম দেখতে আৱ একটি ঔষধ পান কৱবাবু শৃণ্য গেলাস তুলে নিয়ে আবাৰ বিছানাৰ উপৰে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাৰ মুখেৰ উপৰে ফুটে উঠল দাঁৱণ যন্ত্ৰণাৰ চিহ্ন।

চন্দ্ৰবাবু তোয়ালে হাতে কৱে ঘৰেৱ ভিতৰ ঢুকে নৱেনেৰ হাতেৰ দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে, ওষুধটা থেয়ে ফেলেছেন দেখছি! বেশ, বেশ! তাৰ মুখেৰ উপৰে ফুটে উঠল পৰিত্থিৰ ভাৱ।

নৱেন ঢোক গিলতে গিলতে বললে, 'থেয়েছি ডাঙ্গারবাবু! বড়ো গা বমি বমি কৱছে?'

চন্দ্ৰবাবু বললেন, 'কোনও ভয় নেই, ওটা এখনই সেৱে যাবে।' তাৱপৱ আৱও মিনিট-পাঁচেক কথাবাৰ্তা কয়ে 'কাল সকালে আবাৰ আসব' বলে তিনি সেদিনকাৰ মতন বিদায় নিলেন।

নৱেন আৱও কিছুক্ষণ চুপ কৱে শুয়ে রইল, তাৱপৱ হঠাতে শয়া তাগ কৱে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে ভাকলে, 'ওহে নাৱায়ণ, ওহে বস্তুবৰ, একবাৰ দয়া কৱে এদিকে আসবে কি?'

নারায়ণ ঘরের ভিতরে এসে বিশ্বিত ঢোকে দেখলে, নরেনের মুখের উপরে রোগের আর কোনও চিহ্নই নেই! জিজ্ঞাসা করলে, ‘আজ তোমার ব্যাপারখনা কী বলো দেখি? দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কোনও অসুখ হয়েছে?’

নরেন কৌতুক-হাস্যে উচ্ছিসিত হয়ে বললে, ‘অসুখ? অসুখ আবার কীসের? অসুখ হোক শক্র! নারায়ণ মৃচ্ছের মতন বললে, ‘তাহলে সত্তিই তোমার কোনও অসুখ হয়নি?’

—‘উহু!’

—‘তবে ডাক্তার ডেকেছিলে কেন?’

—‘কিঞ্চিং ঔষধ সেবন করব বলে।’

—‘অসুখ হয়নি, অথচ ওষুধ খাবে?’

—‘খাব কেন? আমি দেখতে চেয়েছিলুম, ডাক্তারবাবু আমাকে কী ওষুধ দেন।’

নারায়ণ মুখ্যভঙ্গি করে বললে, ‘তোমার কথার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এতক্ষণ ধৰ্মের রোগের অভিনয় করলে, ডাক্তারবাবু কী ওষুধ দেন কেবল তাই দেখবার জন্যে?’

—‘ঠিক তাই।’

—‘ওষুধ পেয়েছে?’

—‘হ্যাঁ, ওই দ্যাখো! নরেন খাটের তলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

নারায়ণ হেঁট হয়ে ঔষধের প্লাস্টা মেবার জন্যে হাত বাড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে নাঞ্জল সংকলন তার হাতখনা চেপে ধরে বলে উঠল, ‘আরে আরে, করো কী।’

—‘হ্যাঁ! অমন করে উঠলে কেন?’

—‘খবরদার, ও ওষুধের গেলাস ছুঁয়ো না।’

নারায়ণ অধিকতর বিশ্বিত হয়ে বললে, ‘কেন বলো দেখি?’

—‘ওর ভেতরে ভীষণ বিষ আছে।’

—‘বিষ?’

—‘সেইরকমই তো আন্দাজ করছি। ওই ওষুধটা এখনই কোনও জীবাণুত্ববিদের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে আছে নিউমেনিয়ার জীবাণু। নারায়ণ, ওই চন্দ্রবাবুটি আজ এখানে এসেছিলেন আমার দেহের ভিতরে নিউমেনিয়া রোগের বীজ বপন করতে।’

নারায়ণ খানিকক্ষণ স্তুতিতের মতন আড়ি হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ‘তাহলে ওই ডাক্তারটি হচ্ছে হত্যাকারী?’

—‘হ্যাঁ, সে বিষয়ে কেনও সন্দেহ নেই। এই অস্তুত উপায়ে চন্দ্রবাবু আমার আগেই আরও তিনজন হত্তাগাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি করেছেন হত্যা, অথচ আইন বলবে ওদের মতৃ হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। আমিও গোঁড় থেকেই এই সন্দেহই করে আসছি। কাচের চুঙ্গিটা পেয়ে সন্দেহ আমার দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমি জানি, জার্মান গুল্চররা এইভাবে অনেক শক্ত নিপাত করেছে।’

নারায়ণ বললে, ‘হ্যাঁ! এখন বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত হচ্ছেন পঞ্জমবাহিনীর দ্বারাই?’

—‘সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই।’

—‘ওই ভয়ানক লোকটাকে তো এখুনি প্রেপ্তার করা উচিত?’

—‘না, এখনও প্রেপ্তারের সময় হয়নি। এখন ওকে প্রেপ্তার করলে দলের আর-সবাই সাবধান হয়ে

যাবে। খালি ওকে নয়, আমি গ্রেপ্তার করতে চাই সমস্ত দলটাকে। জালে শিকার পড়েছে, আর পালাতে পারবে না। আপাতত আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, চার নশ্বরের বাড়িখানাকে আবিষ্কার করা। এই নাটকের শেষ-দৃশ্যের অভিনয় হবে সেই বাড়ির ভিতরেই।'

পঞ্চম

জাগো নারায়ণ

দু-দিন পরে ফোনে শচীনবাবুর গলা পাওয়া গেল—'কেমন আছেন নরেনবাবু? আপনার জন্যে আমার মন বড়ো উৎস্থিত হয়ে আছে।'

নরেন বললে, 'কেন?'

—'শুনলুম আপনার দেহে নাকি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে?' ১১৩

—'কে বললে?' ১১৪

—'চন্দ্রনাথ!'

নরেন হেসে বললে, 'কালও ডাঙ্গারবাবু এসেছিলেন। তাহলে তাঁরও বিশ্বাস যে আমি নিউমোনিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি?'

—'তার তো তাই মত!'

—'জানি না আমার নিউমোনিয়া হয়েছে কি না। তবে আমার বুকের ভিতরটা বিষম টাটিয়ে উঠেছে, আর একটু একটু জ্বরও হচ্ছে বটে। হয়তো গোয়েন্দাদের ভিতরে আমিই হব চতুর্থ বলি।'

—'বড়োই আশ্চর্য কথা মশাই, এমন যোগাযোগ যে হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না।'

—'শচীনবাবু, আমি কী হিঁর করেছি জানেন?' ১১৫

—'কী?' ১১৬

—'আমি আর চন্দ্রনাথবাবুর চিকিৎসায় থাকব না। নতুন কোনও ডাঙ্গারকে ডাকব।'

একটু চুপ করে থেকে শচীনবাবু বললেন, 'আমারও মনে হচ্ছে আপনার তাই করাই উচিত। এবারে আমারও বিষয় সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী সন্দেহ?' ১১৭

—'বেছে বেছে পুলিশের লোকের উপরে নিউমোনিয়ার এই আক্রমণ, এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কি না।'

—'সেটা পরে বোধ যাবে। শচীনবাবু, আপাতত আপনাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে। চন্দ্রবাবুকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন যে, আমি এখন শয্যাগত আর নতুন ডাঙ্গার আমার চিকিৎসা করছেন। তাঁকে আর কষ্ট করে আমার এখানে আসতে হবে না।'

—'জানিয়ে দেব। অবশ্য চন্দ্রনাথ মনে মনে বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হবে। তা আর কী করা যাবে? সকলের সব ডাঙ্গারের ওপর বিশ্বাস থাকে না।'

নরেন বললে, 'না শচীনবাবু, ঠিক তাই নহ। চন্দ্রবাবুর উপরে আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি।'

—'তবে?' ১১৮

—‘আমার বিশ্বাস নিউমোনিয়া রোগ সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু অনেক নতুন তথ্যই জানেন। এদেশের অনেক ডাক্তারের চেয়ে এ-বিভাগে তাঁর জ্ঞান বোধ হয় খুব গভীর।’

শচীনবাবু বিশ্মিত কষ্টে বললেন, ‘তবু আপনি তাঁর চিকিৎসায় থাকতে চান না কেন?’

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নরেন বললে, ‘কিন্তু অতি-বুদ্ধির মতন অতি-জ্ঞানও যে সময়ে সময়ে মারাত্মক হতে পারে, চন্দ্রবাবু হচ্ছেন তারই একটি মৃত্মান প্রমাণ।’

শচীনবাবু হতভম্বের মতন বললেন, ‘আপনি কী বলতে চান নরেনবাবু?’

—‘আমি খালি বলতে চাই, চন্দ্রবাবুর অতি-জ্ঞানের মহিমায় উপর-উপরি চারজন পুলিশ কর্মচারী একই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকের টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছে। চন্দ্রবাবু যারই চিকিৎসার ভার নেন তাকেই ধরে নিউমোনিয়ায়। আপনিই বলুন, কোন ভরসায় এমন ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিব?’

শচীনবাবু উত্তেজিত থরে বললেন, ‘নরেনবাবু, নরেনবাবু, আপনি কি বলতে চান যে—না, না, অসম্ভব!’

তাড়তাড়ি ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলে, ‘চার নম্বরের বাড়ির ঠিকানাটা আদায় করতে পেরেছেন?’

—‘কেমন করে পারব?’

—‘খুব সহজেই। নৃপেশের উপরে কড়া পাহাড়া রাখুন। আসছে অমাবস্যার রাতে নিশ্চয়ই সে চার নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাতির হবে।’

—‘এ যে আপনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে বলছেন! আমি নৃপেশের নামই খালি শুনেছি তার চেহারাও কখনও দেখিনি, আর সে কোথায় থাকে তাও জানি না।’

—‘নৃপেশের ঠিকানা আমি আপনাকে বাতলে দেব।’

—‘কী অশ্রয়, আপনি তার ঠিকানা জানেন?’

—‘জানি বই কি! আমার লোকেরাও তার উপরে নজর রেখেছে যে! আপনি আরও ভালোরকম পাহাড়ার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, আপনাদের ফাঁকি দিয়ে সে যেন লুকিয়ে চার নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাতির হতে না পারে।’

শচীনবাবু মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, ‘বেশ, বেশ! এই এক চালেই বেঁধয় কিসিমাত করতে পারব! আপনি বাহাদুর ব্যক্তি দেখছি! কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন নরেনবাবু, আপনাকে আমরা হারাতে পারব না। আজ তাহলে আসি, নমস্কার।’

একে একে কয়েকটা দিন কেটে গিয়ে এল কালো অমাবস্যার রাত্রি। টেলিফোন যত্নের সামনে বসে নরেন ও নারায়ণ কথাবার্তা কইছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনের ঘণ্টা।

বিসিভারটা তুলে নিয়ে নরেন শুয়োলে, ‘হ্যালো, কে আপনি?’

উত্তেজিত কঠম্বরে শোনা গেল, ‘আমি শচীন। আপনার কথাই ঠিক! আজ রাত নয়টার সময় নৃপেশ একখানা ট্যাঙ্কিতে চড়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একখানা মস্ত বড়ো কিন্তু সেকলে বাগানবাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। নিশ্চয়ই ওইখানা হচ্ছে তাদের চার নম্বরের বাড়ি। আমরা একটু পরেই বাড়িখানা ঘেরাও করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না?’

—‘নিশ্চয়ই পারব।’

- ‘বলেন কী মশাই! ওই অসুস্থ শরীরে?’
 —‘আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। নিউমোনিয়া চুলোয় যাক, আমার কোনও অসুস্থই হয়নি।’
 কোন খানিকক্ষণ মৌন। বোধ হয় শচীনবাবু এত বেশি বিশ্বিত হয়েছিলেন যে তাঁর আর কথা বলবার শক্তি ছিল না। তারপর রিসিভার পুনর্বার বহন করে নিয়ে এল শচীনবাবুর কঠ্যর—‘আপনার নিউমোনিয়া হয়নি।’
 —‘উহঁ।’
 —‘কিন্তু চন্দ্রনাথও যে বললে, আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে।’
 —‘চন্দ্রবাবু বোধ হয় মনে করেন নিউমোনিয়া রোগটি তাঁর অনুগত ত্বর্য।’
 —‘মানে?’
 —‘ক্রমশ প্রকাশ পাবে।’
 —‘তাহলে আপনি শয্যাগত হয়ে আছেন কেন?’
 —‘ওটা যথ্য রটন। আমি শক্রদের ভোলাতে চেয়েছি।’
 —‘আঃ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম! তাহলে আপনি আসছেন?’
 —‘আমরা প্রস্তুত। আমি আর নারায়ণ। আমরা দলে বেশ ভারী হয়ে যাব তো?’
 —‘সেকথা আর বলতে! চার নম্বরের বাড়ি থেকে আজ একটা ইন্দুরও বাইরে বেঙ্গলীর পথ পাবে না। আজই আমরা বুঝতে পারব, বড়োবাবু আর ছেটোবাবু এ দুই মহাশ্বার আসল পরিচয় কী? তাহলে এখনই চলে আসুন। একটু আগে থাকতেই ঘটনাস্থলে পৌছেনো দরকার। নমস্কার!’
 রিসিভারটা রেখে দিয়ে নরেন বললে, ‘জাগো নারায়ণ, যুদ্ধাত্মক আয়োজন করো।’
 নারায়ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, ‘যথি আজ্ঞা, সেনাপতি।’
 —‘হ্যাঁ নারায়ণ, এইবারে রঙমঞ্চের উপরে তুমিই হবে প্রধান অভিনেতা।’
 —‘কেন?’
 —‘কারণ আমার মন্ত্রিক্ষের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার হয়তো দরকার হুবু তোমার বাহ্যিক।’
 —‘বাহ আমার বহুক্ষণ থেকেই তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।’
 —‘আদেশ তো পেলে। হে বীরবাহু, এখন অগ্রসর হও।’

ষষ্ঠ আমাবস্যায়

অমাবস্যার রাত।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড অদৃশ্য হয়ে গেছে নিবিড় অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে।

অন্ধকারের সঙ্গে পাপের বন্ধুত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধুরা তাকে তয় করে, কিন্তু পাপীরা খৌজে অন্ধকারের আশ্রয়।

সেই বিল্লিমন্ত্রিত, জোনাকিখচিত অন্ধকারের ভিতরে মাঝে শোনা যাচ্ছে এক-একখানা গাড়ির শব্দ। কোনও গাড়ির শব্দ কাছে এসেই আবার দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে, আবার কোনও কোনও

গাড়ির শব্দ যাচ্ছে হঠাৎ বঙ্গ হয়ে। এখন চোখ দিয়ে কিছুই দেখা যায় না, ধৰনি শুনে কান দিয়ে সব অনুমান করে নিতে হয়।

রাত বারোটা বাজল। এইবাবে আমাদের প্রবেশ করতে হবে একখানা বাগানবাড়ির মধ্যে। বাহির থেকে তার মধ্যে কোনও জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই আমরা দেখতে পাব, মস্ত একখানা হলঘরের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছে একদল লোক।

একদিকে রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো এবং আর একদিকে প্ল্যাটফর্মের উপরে আছে একটি টেবিল ও দুইখানা চেয়ার। প্ল্যাটফর্মের উপরে ও নীচে কোনও চেয়ারই খালি নেই। এ যেন একটা সভার দৃশ্য—কিন্তু কোনও সভ্যেরই মুখ দেখবার জো নেই। প্রত্যেকেরই মুখের উপরে বিবাজ করছে একটা করে কালো কাপড়ের মুখোশ বা মাস্ক। ঘরের ছাদের মাঝখান থেকে বুলছে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প, তার আলো এমন অপ্রচূর যে চারিদিকেই দেখা যায় আবহায়ার লীলা!

প্ল্যাটফর্মের উপরে যে দুজন লোক বসেছিল, তাদের একজন ফিসফিস করে আব-একজনকে সম্মোহন করে বললে, ‘ছোটোবাবু, আজ আমাদের এখানে কজন সভ্য আসবার কথা ছিল মনে আছে?’

—‘মনে আছে বড়োবাবু! তিবিশ জন’

—‘একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ কি?’

—‘কী ব্যাপার?’

—‘আমরা কজন এখানে আছি একবার গুণে দ্যাখো দেখি?’

ছোটোবাবু মনে মনে গণনা করে সবিশ্বায়ে বললে, ‘এখানে সভ্য তো দেখছি বত্রিশ জন!’

—‘তাহলে এই বাড়তি সভ্য দুজন কেমন করে এখানে এল?’

ছোটোবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ‘কিছুই তো বুঝতে পারছি না।’

—‘কিন্তু আমাদের বুঝতে হবেই। মাঝখানের দরজার কাছে ওই যে দুটি লোক বসে আছে, ওদের দেখে কী বুঝছ?’

—‘দেখছি তো একজন ভয়ানক লম্বা-চওড়া, আর একজন হচ্ছে ভয়ানক বেঁটে আর রোগা।’

—‘ওদের দেখে আমার কাদের মনে পড়ছ জানো? নর-নারায়ণকে?’

—‘কিন্তু তা—তা কেমন করে হবে বড়োবাবু? আমরা তো সকলেই জানি, নরেন এখন নিউমোনিয়া রোগে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। আর তার বিছানার পাশে দিনরাত বসে আছে তার বন্ধু নারায়ণ।’

—‘ধরনুম নর-নারায়ণের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব। তবে ওরা কে? ব্যাপারটা তালো বোধ হচ্ছে না। ওদের পাশের ঘরে ধরে নিয়ে চলো। আগে ওদের প্রৱীশ্বা না করে কোনও কাজই করা চলবে না।’

ছোটোবাবু ইঙ্গিত করে ডাকতেই দুজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে তাদের কানে কী কথা বললে কিছুই শোনা গেল না। লোকদুটো পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রথমেই সেই বৃহৎ মূর্তিটির দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দুদিক থেকে তার দুই হাত চেপে ধরে বললে, ‘তোমাকে একবার পাশের ঘরে যেতে হবে।’

অকশ্মাং মূর্তিটা একলাকে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর ঝটকান মেরে মুক্ত করে নিলে নিজের হাত-দুখান। পরমহৃতে যারা তার হাত ধরেছিল, তারা দুজনেই দূরে শিয়ে ঠিকরে পড়ল।

ইতিমধ্যেই ছোটোখাটো লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে খুব জোরে ফুঁ দিলে এবং ডান হাত দিয়ে আর এক পকেট থেকে বার করলে রিভলভার। বড়ো মূর্তিটিও আর একটি রিভলভার বার করতে দেরি করলে না।

সভার সকলেই বিপুল বিষয়ে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমটা হতভম্বের মতো হয়ে রইল।

তারপরেই বাহির থেকে জাগল কার উচ্চ সর্তরবাণী—‘পালাও, পালাও! পুলিশ!’ সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো ছুটো-পরা পায়ের দোড়াদোড়ির শব্দ।

তারপরই বেধে গেল মহা গোলমাল। সকলেই সভায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে।

বড়োবাবু ও ছোটোবাবুও প্লাটফর্মের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথা থেকে ঘয়ং শচীনবাবু এসেই বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন ছোটোবাবুর কঠদেশ! বড়োবাবু বিদ্যুৎবেগে আদৃশ্য হল একটা দরজার ভিতর দিয়ে। নরেন ও নারায়ণ তখন টান মেরে নিজেদের মুখোশ খুলে ফেললেছে। তারা ছুটল বড়োবাবুর পিছনে পিছনে।

নরেন ও নারায়ণ বাইরের বারান্দায় এসে পড়েই দেখলে, বড়োবাবু দোড়ে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে সশব্দে বক্স করে দিলে দরজা। নারায়ণ ছুটে গিয়ে দরজার উপরে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগল। সে প্রচণ্ড আঘাত দরজার পাল্লা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলে না, খিল ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। নরেন ও নারায়ণ অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজেদের টর্চ জ্বলে ফেললে, কিন্তু ঘরের কোনওদিকে কেউ নেই!

এক কোণে ছিল ছোটো একটা তক্কাপোশ। তা ছাড়া ঘরের ভিতরে আর কোনও আসবাবই নেই। নারায়ণ ভাবাচাকা খেয়ে বললে, ‘কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? ফুসমন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?’

নরেন বললে, ‘মানুষের দেহ কর্পুর দিয়ে গড়া নয়, আর কর্পুরও এত তাড়াতাড়ি উবে যেতে পারে না।’

—‘তবে সে গেল কোথায়? আমরা যে স্বচক্ষে তাকে এই ঘরে চুক্তে দেখেছি! এঘর থেকে তো বেরুবার আর কোনও পথ নেই।’

নরেন বললে, ‘ওই তক্কাপোশখানা টেনে সরিয়ে আনো দেবি! নারায়ণ তক্কাপোশখানা হিড়হিড় করে একদিকে টেনে আনলে। তারপরেই দেখা গেল, তক্কাপোশের ঠিক ঝুলায় মেঝের উপরে রয়েছে ছোটো একটা কাঠের দরজা।

নরেন বললে, ‘বড়োবাবু তক্কাপোশ সরিয়ে এই দরজা খুলে পাতাল-প্রবেশ করেছেন। ভিতরে নেমে দরজা বন্ধ করবার আগে তক্কাপোশখানা আবার যথাস্থানে টেনে এনে রেখেছেন। এইবাবে আমাদেরও পাতাল-প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।’

ততক্ষণে শচীনবাবুও কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে ছুটে এসে বললেন, ‘এখানে আবার কী ব্যাপার?’

নারায়ণ বললে, ‘দলের সর্দার এই দরজার আড়ালে কুসে বিশ্রাম করছে। দরজাটা ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন।’

পাহারাওয়ালারা খানিকক্ষণ চেষ্টা করবার পরই দরজার পাল্লা দুইখানা খুলে নীচের দিকে খুলে পড়ল। নীচের দিকে উকি মেরে দেখা গেল কয়েকটা ছোটো সিঁড়ির ধাপ। তারপর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ সুড়ঙ্গের ভিতরে জাগল রিভলভারের গর্জন এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা ভারী জিনিসের পতন-শব্দ। তারপর আবার সব চূপচাপ।

শচীনবাবু বললেন, ‘এখন কী করা উচিত? লোকটা দেখেছি মশান্ত্র।’

১৯৩৩

নরেন মাথা নাড়তে নাড়তে সহাস্যে বললে, ‘আমার বিশ্বাস, সুভঙ্গের ভিতর ঢুকলে এখন দেখতে পাওয়া যাবে বড়োবাবুর মৃতদেহ। সে বোধ হয় আঘাতাত্তা করেছে।’

নরেনের অনুমতি সত্য হল। পাহাড়াওয়ালারা সুভঙ্গের ভিতর থেকে বার করে নিয়ে এল একটা রক্তাক্ত দেহ।

কিন্তু সে তখনও মারা পড়েনি। নারায়ণ টান মারতেই তার মুখের আবরণ গেল সরে। শচীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, ‘এ কী! এ যে ডাঙ্কাৰ চন্দ্ৰনাথ যোষ!’

নরেন হাস্যমুখে বললে, ‘চন্দ্ৰনাথকে চিনতে পেৱেছেন দেখে খুশি হলুম। হাঁ শচীনবাবু, এই চন্দ্ৰনাথ প্রকাশ্যে সাজে পুলিশের প্ৰিয় ডাঙ্কাৰ, আৱ যবনিকাৰ অস্তৱালে বসে চালনা কৰে গুপ্তচৰেৱ এই বৃহৎ দলটি!

শচীনবাবু তখনও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারেননি। হতভন্ত তাবে বললেন, ‘চন্দ্ৰনাথ পঞ্চমবাহিনীৰ সৰ্দার!

—‘এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।’

—‘অথচ এই চন্দ্ৰনাথ মুখের কথায় আমাদেৱ বুবিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড়ো শক্ত জাপানিদেৱ আৱ কেউ নেই।’

—‘আপনাৰ মতো পাকা পুলিশেৱ চোখে যখন ধূলো দিয়েছে তখন চন্দ্ৰনাথকে একজন প্ৰথম শ্ৰেণিৰ অভিনেতা বলে শীকীৱ কৰতেই হৰে।’

নারায়ণ বললে, ‘কিন্তু চন্দ্ৰনাথ কেমন কৰে জাপানিদেৱ গুপ্তচৰ হল?’

নরেন বললে, ‘আমাৰ বিশ্বাস চন্দ্ৰনাথ যখন বৰ্যায় ছিল তখনই সে এই সুযোগ পেয়েছিল। তাৱপৰ সাধাৱণ পলাতকেৱ মতোই আৰাৰ ভাৱতবৰ্বেৱ ভিতৱে প্ৰৱেশ কৰেছে আৱ শক্তদেৱ টাকায় গড়ে তুলেছে এই মস্ত গুপ্তচৰ সমিতি।’

নরেনেৱ একখনা হাত চেপে ধৰে শচীনবাবু বললেন, ‘নরেনবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ! আপনি না থাকলে চন্দ্ৰনাথ আজ ধৰা পড়ত না।’

চন্দ্ৰনাথ আস্তে আস্তে দুই চোখ মেলে একবাৰ সকলেৱ মুখেৱ দিকে তাৰিষ্ণে দেখলে। অতি মদু হাসি হেসে অস্পষ্ট স্বৰে বললে, ‘কিন্তু তোমোৱা আয়াকে ধৰে রাখতে পাৱৰে না। আমি এখনই তোমাদেৱ ফাঁকি দেব।’

সে ফাঁকিই দিলে। যিনিটো দশকেৱ মধ্যেই তার মৃত্যু হল।

কিন্তু তার দলেৱ সকলেই ধৰা পড়ল।

পৱে জানা গেল, চন্দ্ৰনাথেৱ সঙ্গে আৱও কয়েকজন বিপ্ৰগুৰী ভাৱতবাসীকে নিয়ে একখনা জাপানি সাবেৱিন ব্ৰহ্মদেশ থেকে সমুদ্রপথে সুন্দৱন স্কুলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

তাৱেৱ বিভিন্ন আড়া খানাতলাশ কৰে পাওয়া গেল কাচেৱ চুঙ্গিৰ ভিতৱে সুৱক্ষিত বিভিন্ন মাৰাঘাক ব্যাধিৰ জীবাণু, ভাৱতবৰ্বেৱ নানাদেশেৱ বড়ো বড়ো মানচিত্ৰ, অনেকৱকম আঘেয়াত্মা আৱ বোমা ও ডিনামাইট এবং শক্রপক্ষেৱ কাছে খৰেৱ পাঠাবাৰ জন্মে বেতাৱযন্ত্ৰ প্ৰভৃতি আৱও অনেক জিনিস।

নরেন বললে, ‘দাক্ষো নারায়ণ, অপৱাধীৱা অতি-চালাক হলেও প্ৰায়ই ধৰা পড়ে অতি-ৰোকামিৰ জন্মে। চন্দ্ৰনাথেৱ কাছে আৱও কতৱকম জীবাণু ছিল! কিন্তু সে যদি বারবাৰ একই নিউমেনিয়া রোগেৱ জীবাণু ব্যবহাৰ না কৰত, তাহলে আমাদেৱ সন্দেহ এত শীঘ্ৰ তার উপৰে গিয়ে পড়ত না।’

নারায়ণ সভয়ে মুখভঙ্গি কৰে বললে, ‘বাপু! এ অস্বীকৃত নয়, মন্তব্যুক্ত নয়, এ হচ্ছে জীবাণুযুক্ত! এসব বোৱাৰাম মতন বুদ্ধি বা বিদ্যে আমাৰ নেই।’

ଅନୁବିଶେର ଅଭିଶାପ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି

ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ

ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ

କୁଳମ ଉଠି ଲକ୍ଷମ୍ୟ ଆପଣାମ ଚାହିଁବାରୀ



କୁଳମ ଉଠି

ଲକ୍ଷମ୍ୟ ଆପଣାମ

ଚାହିଁବାରୀ

ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ

କୁଳମ ଉଠି

ଲକ୍ଷମ୍ୟ ଆପଣାମ

কিন্তু না অস্তু ? কিংবা এ আসল ভূত ?

এটা প্রায়ই দেখা যায়।

হয়তো বহুকাল রামের পাতা নেই। ধার্মিও তাকে ভুলেছিলুম। আচমকা একদিন অকারণেই তার কথা স্মরণ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রামের দেখা পেলুম পথেয়াটে বা অন্য কোথাও।

আজকের ব্যাপারটাও অনেকটা ওই রকম!

প্রভাতি চায়ের আসর তেমন জমেনি, কারণ সুন্দরবাবুর অনুপস্থিতি। আন্দাজ করা গেল, সুন্দরবাবু যখন চা ও তৎসহ রসনাবোচক খাদ্যসামগ্ৰীৰ লোভ ছেড়েছেন তখন জড়িয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই কোনও জটিল মামলার জালে।

চায়ের পালা চুকিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম। দৃষ্টি আকর্ষণ কৰল একটা অস্তু ঘটনার বিবরণ। ঘটনাটা ভৌতিক। পুরানো বাড়িতে নতুন ভূতের ওষ্ঠাদি! অর্থাৎ উত্তর কলিকাতার একখানা দেড়শো বছরের বুড়ো বাড়িতে হঠাত ভূতের ভেলকি খেলা শুরু হয়েছে।

বাড়িখানা মন্ত বড়ো। তার ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা বিভিন্ন উদ্বাস্তু পরিবার। ভূতের হামলা চলছে তাদেরই উপরে।

জয়স্ত বললে, ‘তাহলে কি অনুমান করতে হবে যে, এই ভূতও বাস্তুহারা? কোথাও কোনও রোজা তার আড়া ভেঙেছে, আর সে-ও সোজা এসে মাথা গুঁজেছে উদ্বাস্তুদের বাসাবাড়িতে?’

—‘না জয়, ঠাণ্ডা নয়। ভূতের পান্নায় পড়ে এক ব্যক্তি নাকি মারা যেতে যেতে কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছে।’

—‘পুলিশ খবর পেয়েছে?’

—‘নিশ্চয়! কিন্তু পুলিশ কিছুই করতে পারছেন না। কে যে আততায়ী, কেউ জানে না। পুলিশ সদলবলে ঘটনাস্থল ঘিরে বসে আছে, অথচ কোথা থেকে যে রাশি রাশি ইট-পাটকেল বৃষ্টি হচ্ছে কেউ তার হৃদিস পাছে না।’

জয়স্ত বললে, ‘পুলিশ যদি বিদেহ ভূতকে না খুঁজে দেহী মানুষকে খুঁজত, তাহলে হয়তো তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত।’

—‘তোমার এমন বিশ্বাসের কারণ?’

—‘দেড়শো বছরের পুরানো বাড়িতে কেউ কখনও ভূতের গুঁপ পায়নি, সেখানে ভূত আজ হঠাত হান দিতে আসবে কেন?’

আমি উত্তর দেবার আগেই ভিতরে আচম্বিতে মুখে হৃষি-হাম ও পায়ে দুষ-দাম শব্দ সৃষ্টি করে ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুর প্রবেশ এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর এক অচেনা ভদ্রলোক।

আমি বললুম, ‘কী সুন্দরবাবু, আজ চায়ে চুমুক দিতে আসেননি, হঠাত এই আশ্চর্য বিরাগের কারণ কী?’

—‘হ্যম! চায়েই চুমুক দেব বটে! যে ভৌতিক মামলার প্যাচে পড়েছি চিত্ত একেবারে চড়কগাছ আর কী!’

আমি বললুম, ‘ভৌতিক মামলা? খবরের কাগজে আজ যার কথা বেরিয়েছে?’

জয়স্ত বললে, ‘উদ্বাস্তুদের উপরে বাস্তুহারা ভূতের অত্যাচার?’

—‘না হে, না! এ মামলার সঙ্গে বাস্তুহারা ভূত কি বস্তুতাত্ত্বিক মানবের কোনও সম্পর্ক নেই।’

—‘তবে কি আর-একটা আনকোরা ভৌতিক মামলা? কী আশ্চর্য! আজকাল কি লোকে ভূত ধরবার জন্যে রোজার বদলে পুলিশ ডাকে?’

—‘যেখানে খুনোখুনি হয় বা হবার সন্তাবনা থাকে, সেখানে লোকে পুলিশ না ডেকে কী আর করবে বলো? খুনি ভূত না মানুষ সেটা তদন্ত না করলে তো চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না!’

—‘খন-টুন হয়েছে নাকি?’

—‘কিছুকাল আগে একটা খুন হয়েছে আর খুনিও ধরা পড়েনি বটে, তবে আমার এলাকায় নয়, কাজেই তা নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু সম্প্রতি আমারই এলাকায় রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তোড়জোড় চলছে—’

জয়স্ত বাধা দিয়ে বললে, ‘কিন্তু তার সঙ্গে ভূতের সম্পর্কটা কী?’

—‘খুনটা যিনি করতে চান তিনি নাকি সেকালে দেবতা বলে পূজা পেয়েছেন কিন্তু একালের ভাষায় তিনি দেবতা নন, উপদেবতা।’

আমি সবিশ্বায়ে বলে উঠলুম, ‘বলেন কী দাদা, সেকেলে দেবতা একেলে পৃথিবীতে উপদেবতার ভূমিকায় দেখা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন?’

—‘ঠিক তাই। ভূমি শুনলে আরও অবাক হবে যে, এই উপদেবতাটির সাক্ষিত হচ্ছে প্রাচীন মিশর।’

শুনেই তো আমি একেবারে ‘ফ্ল্যাট’!

জয়স্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, ‘সুন্দরবাবু, আপনার এই উপদেবতার উপকথা শুনে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত হবে বলে সন্দেহ হচ্ছে না। অতঃ কিম?’

—‘তারপর? এই দেবতা বা উপদেবতার নাম হচ্ছে অনুবিস।’

আমি বললুম, ‘অনুবিসের কথা আমি কেতাবে পড়েছি। প্রাচীন মিশরিদের মতে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেবতা ও সিরিসের পুত্র, মানুষ মারা গেলে পরে তিনি তার অভিভাবক হন।

জয়স্ত বললে, ‘কিন্তু প্রাচীন মিশরিয়া তো তাদের সভ্যতা, ধর্ম আর কুসংস্কার নিয়ে মহাকালের মহাসাগরতটে জলের লিখনের মতো করে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবলুম তাদের দেবতা ও উপদেবতাদের মৃত্যু নেই। কিন্তু অনন্ত নিদৃসুখ উপভোগ না করে আজকে এই সর্বনেশে অ্যাটমবোমার যুগে তারা কি আবার জেগে উঠে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে সাহস করবে?’

সুন্দরবাবু একটু অধীর ভাবে বললেন, ‘ভাই জয়স্ত, ফ্ল্যাটেই কথাসরিংসাগরে সন্তুরণ দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ঘটনাটা ভাসা ভাসা শুনেই চমকে গিয়েছি। এ মামলা গ্রহণযোগ্য কি না মনে সন্দেহ হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে এই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি, এর প্রযুক্তি আসল ঘটনা শ্রবণ করো। এর নাম যতীন্দ্রনাথ সেন, ইনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।’

তখন আগস্তকের দিকে ভালো করে ফিরে তাকালুম।

মাথায় খানিক সাদা খানিক কালো অযত্ববিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ, সৌম্য মুখ, দাঢ়ি গোঁফ বোধ করি তিনি-চার দিন কামানে হয়নি, মোটা কাচের চওড়া ফ্রেমের চশমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে চিন্তিত দৃষ্টি, সাদাসিংহে আধময়লা জামাকাপড়ে প্রসাধন-পারিপাঠের কোনও চিহ্নই নেই, পায়ে বার্নিশ না করা পাদুকা। শ্যামবর্ণ, মাঝারি আকার। হাতে একগাছা যষ্টি, তার স্তুলতা দেখলেই বোঝা যায় তাকে ধারণ করা হয়েছে শোভার্থে নয়, আত্মরক্ষার্থে।

জয়স্ত বললে, 'যতীনবাবু, নমস্কার। আপনার নাম আমি শুনেছি, আপনি অবিখ্যাত ব্যক্তি নন। বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ের পূরাতত্ত্ব নিয়ে পত্রিকায় আপনার সুলিখিত আলোচনা আমি পড়েছি। কিন্তু আপনার মতো নিরীহ প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে অমন একগাছা বেমানান বাঘমারা লাঠি কেন?'

- এতক্ষণ পরে মুখ খুলে যতীনবাবু বললেন, 'তয়ে মশাই, ভয়ে' ।
- মঃ—'ভয়ে! কার ভয়ে?' ।
- 'অনুবিসের!' ।
- 'তাহলে অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?' ।
- ঘঃ—'করি। বিশ্বাস আগে করতুম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি' ।
- ঞঃ—'কেন বাধ্য হয়েছেন?' ।
- 'অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি' ।
- 'যতীনবাবু, আপনার কথা শুনলে লোকে হাসবে।'
- ঘঃ—'আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসতে পারবেন না।'
- ঞঃ—'উত্তম, বলুন আপনার সব কথা! এমনকি আপনার বিষয়সম্পত্তি আরি শারিবারিবলোর কথাও শুনতে চাই।'

যাদুকরের মন্ত্র কয়— শুকনো মড়া জ্যাণ্ট হয়!

যতীনবাবু বলতে লাগলেন

'অল্লিপ্টির বিষয়আশয় আর ব্যাংকের খাতার মহিমায় আমার জীবন কাটে সুখে-স্বচ্ছদে। লোকের মতে, আমি ধনী! আর পরিবারবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমি বিবাহ করিনি, পরিবারবর্গ বলতে আমার সংসারে আপাতত আর কেউ নেই।

দুই বিধবা সহোদরা ছিল, তারাও এখন পরালোকে। তাদের প্রত্যেকেরই শ্রেষ্ঠটি করে পুত্র। তারাই এতদিন আমার সঙ্গে বাস করত। একজনের নাম মূরলীধর, আর একজনের সনৎকুমার। কিন্তু সনৎ মারা পড়েছে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় আর মূরলীধর থেকেও নেই, চরিত্রদোষের জন্যে তাকে আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। তাকে আমি নিজের মনের মতো শিক্ষা দিয়ে মানুষ করবার চেষ্টায় ছিলুম। প্রত্ততত্ত্বের কাজে সে ছিল আমার সহকারী। কিন্তু দিনে দিনে তার মতিগতির অধোগতি দেখে তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়েছি। আজ চার বৎসর তার মুখ দেখিনি। সে-ও একরকম নিরুদ্দেশ হয়েই আছে—তবে কাফুর কাফুর মুখে ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছি, ভবযুরের জীবন যাপন করতে করতে সে এখন নাকি আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে গিয়ে পড়েছে।

কাজেই সংসারে আমি এখন একলা। কিন্তু সেজন্যে আমার দুঃখ বা অভিযোগ নেই। আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকদের একক জীবনই সুবিধাজনক। এই প্রত্নতত্ত্বের দুর্জয় নেশায় মেতে শিলালিপি, তাত্ত্বিক বা প্রাচীন ধর্মসন্তুপ খোঝিবার জন্যে আমাকে দেশবিদেশে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কখনও গিয়েছি উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহেঝেদাড়ো বা হরপ্রা বা অন্য কোথাও—অধুনালুপ্ত প্রাচীন সভ্যতার নষ্টোদ্ধার করতে; কখনও গিয়েছি আফগানিস্তানে—পুরাতন বৌদ্ধকীর্তিকে বিশ্বৃতির গর্ভ থেকে

পুনরাবিষ্কার করবার জন্যে; কখনও গিয়েছি আদি সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র মিশরের নীল নদের তীরে। এ হচ্ছে প্রায় যায়াবর জীবন, সংসারধর্ম পালনের পক্ষে উপযোগী নয় আদৌ।

আমার দুর্ভাগ্যের স্তুপাত ওই নীল নদের তীরেই—যেখানে আকাশহৌয়া পিরামিডের সমাধিস্থৃতিজড়িত স্ফ্র-কুজ্বটির দিকে চির-অনিয়েনন্তে তাকিয়ে স্তুপিত হয়ে আছে নারসিংহী শিঙ্কস-এর বিরাট শিলাঘূর্ণি।

মিশরের 'মরি' বা মশলার দ্বারা সুরক্ষিত মানুষের মৃতদেহের কথা আজ আর কাকুর কাছেই অবিদিত নেই। প্রাচীন মিশরিদের মতে, এক চরম বিচারের দিনে বিচারকর্তা দেবতার সামনে এই মৃতদেহগুলিকে আবার মন্ত্রাঙ্কিত দ্বারা জীবন্ত করে তোলা হবে।

আধুনিক মানুষেরা মিশরের নানাঞ্চানে কবর খুঁড়ে অসংখ্য মরি আবিষ্কার করেছে। মরি আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ববিদরা অসংখ্য মরি ক্রয় করেছেন, কলকাতার যাদুঘরেও একটি নারী-মূর্তির প্রায়-নষ্ট মরি আছে।

মেফিস নামক জয়াগায় গিয়ে দেখি এক বহুবৃক্ষত সমাধিক্ষেত্র। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি চার হাজার বৎসরের মরি কেনবার লোভ সামলাতে পারলুম না। খিস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর আগে একাদশ রাজবংশের চতুর্থ মেনতুহোতেপে যখন মিশরের অধিপতি, তখন তাঁর রাজসভায় ছিলেন তানুতামেন নামে এক সন্তান ব্যক্তি, এটি হচ্ছে তাঁরই সুরক্ষিত মৃতদেহ।

শোনা যায়, মরিকে কবরস্থ করবার আগে পুরোহিতরা এমন জাদুমন্ত্র পড়ে দিতেন, কখনও মন্দিভূত হত না যার প্রভাব। ফলে কোনও অবিষ্কাসী ব্যক্তি মরিকে ঠাইনাড়া করলে সমৃহ বিপদে পড়ত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হাওয়ার্ড কাটার ও তাঁর সাঙ্গোপাদ্ররা রাজা তৃতানখামেনের মরি স্থানান্তরিত করেছিলেন। মন্ত্রগুণে সেই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নাকি মারা পড়েছিলেন অভাবিত ও আকস্মিক দৃঢ়টনায়। পুরোহিত কিংবা দেবতার অভিশাপ গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল এসব হচ্ছে বাজে কুসংস্কার, বিশ্বাসের অযোগ্য একজন মিশরি ভদ্রলোক আমাকেও মরি কিনতে মানা করে তায় দেখিয়েছিলেন যে, এই মৃতদেহ মিশরের বাইরে নিয়ে গেলে আমাকেও মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা আমি হচ্ছেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। মরিটিকে নিয়ে যদেশে ফিরে এসে আমি নিজের সংগ্রহশালায় রক্ষা করেছি।

দেশে ফেরবার পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু তারপরেই মিশরের রাজধানী কাইরো থেকে আমার কাছে আসে ইংরেজ ভাষায় টাইপরাইটারে লেখা একখনা বেনামি চিঠি। তাতে এই বলে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, আমি যদি এক মাসের মধ্যে তানুতামেনের মরিকে পুনরায় মিশরে পাঠিয়ে না দি, তবে আমাকে বিষম বিপদের আবর্তে পড়তে হবে। পত্রের তলায় প্রেরকের নামের পরিবর্তে শুধু লেখা ছিল—‘শুভার্থী বন্ধু’।

কিন্তু তথাকথিত শুভার্থী বন্ধুর উপদেশ মানতে পারিনি। প্রচুর মূল্য দিয়ে মরিটি কিনেছিলুম, কোনও ধার্মাবাজের উড়োচিঠিতে তায় পেয়ে হারাতে রাজি হলুম না। দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস। তারপরেই খটল প্রথম দৃঢ়টনা।

মুরলীবরকে ত্যাগ করবার পর থেকেই আমার দিতীয় ভগীর পুত্র সনৎকুমার আমার বাড়িতেই বাস করত। সে ছিল অত্যন্ত সংস্কৃত, বিনয়ী ও অধ্যয়নশীল। আমার সেবায় ছিল তার পরম আনন্দ। তাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উন্নতাধিকারী করব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েছে। সনৎকুমার অপঘাতে মারা পড়েছে এবং তার অস্থাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে রহস্যাবৃত।'

এই পর্যন্ত শুনে জয়স্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আপনার ভাগনের মৃত্যুকে রহস্যাবৃত বলছেন কেন?'

—'কারণ তার সঙ্গে অপার্থিব ব্যাপারের সম্পর্ক আছে।'

—'অপার্থিব ব্যাপার বলতে আপনি কী বোঝেন জানি না। কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

তাত্ত্বিক

৫৩

জ্ঞান

মিত্রাক্ষর নয়, চিত্রাক্ষর, মৃত্যুদুতের লেখা নিজ-স্বাক্ষর!

৫ মার্চ ১৯৫৯

৫

জয়স্ত বললে, 'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সনৎবাবু কতদিন আগে মারা 'পড়েছেন?' ১০০ টাকা
—'ঠিক এক মাস আগে রাত্রিকালে।'
—'পুলিশের মতেও কি এটা হত্যাকাণ্ড?'
—'নিশ্চয়! এ সমস্কে মতান্বে হতে পারে না। কেউ বিষাক্ত তির ছুড়ে আকেহত্যা করেছো বলকে
তিরবিদ্ব অবস্থায় সনতের মৃতদেহ পাওয়া যায়।'

—'এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চাই।'

—'সনতের মৃতদেহ পড়ে ছিল ঘরের মেঝের উপরে উপরে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।'

—'জানালা?'
তাত্ত্বিক ১০১
জ্ঞান ১০১

—'খোলা ছিল।'

—'ঘরে আলো জুলছিল বোধ হয়?'
তাত্ত্বিক ১০২
জ্ঞান ১০২

—'আজ্ঞে হাঁ।'

—'সব বুতে পারছি। কেউ বাহির থেকে তির ছুড়ে সনৎবাবুকে হত্যা করেছে।'

—'পুলিশও তাই বলে।'

—'পুলিশ কাকুকে সন্দেহ করেছে?'
তাত্ত্বিক ১০৩
জ্ঞান ১০৩

—'কার উপরে সন্দেহ করবে? সনৎ ছিল অজাতশক্তি। তার মৃত্যুতে স্ফতিগ্রস্ত হয়েছি কেবল আমি। বোধ করি হত্যাকারীর উদ্দেশ্যেও ছিল তাই।'

—'এইবার আসল প্রশ্নে আসা যাক। যদিনবাবু আপনার ক্ষেত্রে সনৎবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে অপার্থিব রহস্যের সম্পর্ক আছে। এমন বিষ্ণুসের কারণ কী?'
তাত্ত্বিক ১০৪
জ্ঞান ১০৪

—'প্রথমত, সনতের বুকে যে তিরগাছ বিদ্ধ ছিল, তা আধুনিক নয়। হাজার হাজার বৎসর আগে প্রাচীন মিশরিয়া সেইরকম তির ব্যবহার করত। সেরকম অনেক তির প্রাচীন ধৰ্মসন্ত্পের মধ্যে আজও পাওয়া যায়।'

—'তারপর?'
তাত্ত্বিক ১০৫
জ্ঞান ১০৫

—'বিতীয়ত, তিরের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল একখানা কাগজ। কিন্তু সেখানা সাধারণ কাগজ নয়।'

—'তবে?'
তাত্ত্বিক ১০৬
জ্ঞান ১০৬

—'সেকেলে বাঙালিরা লিখার জন্যে ব্যবহার করত তালপাতা। মিশরে আজও 'প্যাপাইরাস' নামে একরকম জনজ তৃণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরিয়া সেই তৃণ থেকে কাগজ তৈরি করে লেখাবার জন্যে ব্যবহার করত।'

- ‘এ কথা আমরাও জানি।’
 — তিরের সঙ্গে সংলগ্ন কাগজখানা ছিল সেই রকম আর তার উপরে লেখা ছিল দুটি শব্দ।’
 —‘প্রাচীন মিশরিয়া লিখত তো চিত্রাক্ষরে, যাকে ‘হায়ারগ্রাফিক্স’ বলা হয়।’
 —‘আজ্ঞে হ্যাঁ, সে হচ্ছে একরকম সাংকেতিক ভাষা, বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারে না।’

- ‘আপনি পড়তে পারেন তো?’
 —‘নিশ্চয়।’
 —‘সেই কাগজে কী লেখা ছিল?’
 —‘অনুবিসের অভিশাপ।’
 —‘অর্থাৎ তানুতামেনের মমি চুরি বা ঠাইনাড়া করেছেন বলে অনুবিসের অভিশাপে আপনার ভাগিনীয়ে নিহত হয়েছেন?’
 —‘ওছাড়া আর কী অর্থ হবে বলুন?’
 —‘কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা কি উদোর পিণ্ডি বুঝোর ঘাড়ে নয়? দোষ করলেন আপনি, শাস্তি পেলে অন্য লোক।’
 —‘তারপর শুনুন। সনতের মৃত্যুর হণ্টাখানকে পরে আবার এক উড়োচিঠি আসে—সেইরকম টাইপরাইটারে লেখা। লেখক সেই ‘শুভার্থী বন্ধু’।’
 —‘এবারের চিঠির খামের উপরেও কি মিশরের ডাকঘরের ছাপ ছিল?’
 —‘না, কোনও ছাপ থাকবার কথা নয়। কারণ এবারের চিঠিখানা কেউ স্বহস্তে আমার বাড়ির ডাকবাস্তে ফেলে দিয়ে শিয়েছিল।’
 —‘বটে, বটে! বড়েই চিন্তাকর্ক কথা।’
 —‘এবারের চিঠিতে লেখা ছিল—এখনও সাবধান হোন। তানুতামেনের মমি যথাহ্রানে পাঠিয়ে দিন। নইলে এবারে আপনার নিজের পালা। অনুবিসের সম্পত্তি আপনি হরণ করেছেন, অনুবিস আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আর সাত দিন মাত্র সময় দেওয়া হল।’
 —‘আপনার অভিপ্রায় কী? মিহ্নিটকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দেবেন?’
 —‘প্রাণ থাকতে নয়। ওই মমির সঙ্গে চিত্রাক্ষরে লেখা একখানা দলিল পেয়েছি। তাতে বহু দুর্লভ তথ্য আছে, পুরাতত্ত্ববিদের কাছে যা অমূল্য। তবে নিরাপদ হবার জন্যে বস্তবাড়ি ছেড়ে আমি নিজের বাগানবাড়িতে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসেও আবার পেয়েছি বিপদের সাড়া।’
 —‘তাই নাকি? কিন্তু আপনার নতুন বিপদের কথা শোনের আগে আর একটা কথা জানতে চাই। প্রাচীন মিশরি তির আর চিত্রাক্ষরে অনুবিসের নাম সেইবৈই কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, এইসব ঘটনার সঙ্গে আছে অলৌকিকের সম্পর্ক?’
 যতীনবাবু জোরে মাথানাড়ি দিয়ে বললেন, ‘নিশ্চয়ই নয়। অলৌকিককে আমি যে দেখেছি।’
 —‘কাকে দেখেছেন?’
 —‘অনুবিসকে।’
 —‘স্বচক্ষে?’
 —‘আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বচক্ষে। সে হচ্ছে ভয়াবহ মূর্তি।’
 জয়স্ত উদ্বেগিত কঠে বললে, ‘প্রাচীন মিশরের কথা আজ পরিগত হয়েছে সুদূর অতীতের স্বপ্ন

কাহিনিতে। আর আপনি কিনা বলতে চান, সেই বিশ্বত পৌরাণিক যুগের ভূতুড়ে দেবতা অনুবিসকে খচক্ষে দেখেছেন এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায়।'

—‘আজ্জে হাঁ, আমি তাই বলতে চাই।’

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্ম, আপনি একটা বিটকেল স্বপ্ন দেখেছেন।’

আমি বললুম, ‘সব কথা না শুনে কোনও মত প্রকাশ না করাই উচিত। যতীনবাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি।’

জ্যোতি বললে, ‘ঠিক। যতীনবাবু, আপনার আশচর্য দর্শনের কথা শেষ করুন।’

কী ভীষণ! কার মুখ? নরদেহে জপ্তুক!

যতীনবাবু আবার শুরু করলেন তাঁর কাহিনি:

‘গতকল্যাকার কথা বলছি।

আমার বাগানবাড়ি একতলা। চারিদিকে যোলো বিঘা জমির উপরে আছে ফল-ফুলের গাছ, লতাপাতার ঝাড়, আলবাঁধা ছোটো ছোটো খোলা জমি এবং পুরু। বাগানে পাঁচিল মেই বটে, কিন্তু মেদী ও তারের বেড়া দিয়ে সব দিকে যেরা। চারখানি ঘরের একখানিতে আমি শয়ন করি। বাগানের পিছনে মালির এবং ফটকের পাশে দারোয়ানের ঘর।

প্রথম রাতটা ছিল ওটট, রাত বারোটার পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাঢ়া পড়ে, কনকনে বাতাস বইতে থাকে। শীত শীত করায় ঘূম ভেঙে যায়, মাথার কাছেকার জানালাটা বন্ধ করে দেবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

জানালার কাছে গিয়ে বুঝি তখনও থামেনি বুরবুরে ইলশেঁগুড়ুনি। এত হালকা যে শব্দ শোনা না গেলেও হাওয়ায় উড়ে এসে গায়ে লাগে। আচম্বিতে নিয়ম অন্ধকারের বুক চিরে ও আমার চোখে চমক লাগিয়ে বলকে উঠল এক তীর ও সুরীর্য বিদ্যুৎ শিখা এবং তারপরেই আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়ে গমগম করে কানে বাজতে লাগল যন্ত্রের গত্তীর গর্জন।

কিন্তু সেই গর্জন বজ্রধনি শুনতে শুনতেই আর একটা কর্মনীতীত দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল আমার অস্তরাঙ্গা পর্যান্ত।

জানালা থেকে অল্প তফাতেই হাসনহানার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত দীপ্তচক্ষু মৃতি!

মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতোই তুরস্ত প্রশ্ন খেলে গেল—কে ও, কে ও, কে ও?

তারপর কান থেকে বজ্রধনির প্রতিধ্বনি মিলোতে না মিলোতেই বিছানা থেকে খপ করে ইলেক্ট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে জুলে ফেলে স্তুতি নেত্রে দেখলুম, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নিকষ-কালো মনুষ—দেহের উপরে বিরাজমান প্রকাণ্ড এক শৃঙ্গালের মুখ আর সেই আশচর্য শেয়াল মুখেই দপ দপ করে জুলছিল দু-দুটো নীলাভ আঙ্গন-চোখ! অত্যন্তি নয়, চোখ দুটো সত্ত্বসত্যই অগ্রিময়! কিন্তু টর্চের আলো জুলত্বেই নিবে গেল সেই চোখের আঙ্গন! আমি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম।

ধরা পড়েই সেই ভয়ংকর অমানুষিক মৃত্তিটা বিকট এক হংকার দিয়ে অদৃশ্য হল ঝোপের আড়ালে।

আমার চিৎকারে লোকজন ছুটে এল। তারপর শুনতে পেলুম কাব ধাবমান মোটরের শব্দ। বেয়ারা ও দারোয়ানরা তম তম করে খুঁজেও বাগানে বাইরের কাকরকে দেখতে পেলে না।

তারপর বাকি রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে ভোর হতেই থানায় এসে হাজির হয়েছি।' সব শুনে জয়স্ত চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বলো তো জয়স্তভায়া, এমন উষ্ট্রট মামলা নিয়ে পুলিশ কী করতে পারে? হ্ম, শেয়ালমুখো আগুনচোখো মানুষখেকো ভূত! কেন বাপু, ভূত কি অন্য কোনও রকম ভদ্রমৃতি ধারণ করতে পারলে না? দেহ মানুষের, মুখ শেয়ালের, চোখ আগুনের! ধোঁ যা নয় তাই!

যতীনবাবু বললেন, 'মশাই, প্রাচীন মিশরের দেবতা অনুবিসের মুখ ছিল শৃঙ্গালের!

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেবতার এমন যাচ্ছতাই জানোয়ারি বৃদ্ধি হয়, আমি একথা বিশ্বাসই করি না! শেয়ালমুখো দেবতাকে কেউ আবার পুজো করে নাকি? কক্ষনো না—হ্ম!

যতীনবাবু বললেন, 'সেকালের মিশরের এমন সব দেবতাও পুজো পেতেন যাদের মুখ ছিল কারুর ডেড়া, কাকুর গোকু, কাকুর সিংহ, কাকুর বক বা বাজপাখির মতো।'

—'আরে ছি ছি, এ যে দেবতাদের অপমান!'

—'তাহলে আমাদের—অর্থাৎ হিন্দুদেরও তো দোষী বলতে হয়। গগেশের হাতির মতো মুখের কথা ভুলে যাবেন না। তারও উপরে আছেন নৃসিংহবতার! আবার পুরাণে মন্দিরে বিষ্ণুর নরবরাহ মৃত্তি দেখা যায়।'

আমি বললুম, 'ওসব বাজে কথা যেতে দিন। হ্যাঁ যতীনবাবু, ওই শেয়ালমুখো বিদেশি দেবতাকে দেখতে গিয়ে ভয়ে আপনার চোখের ব্রহ্ম হয়নি তো?'

—'ভ্রম? অস্ত্রব! প্রাচীন চিত্রে আর ভাস্কর্যে আমি অনুবিসের যেরকম আঁটসাট ছোটো জামা আর বিশেষ ধরনে তৈরি হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝোলানো খাটো কাপড় দেখেছি, আমার বাগানের শেয়ালমুখো মৃত্তির পরনেও ঠিক সেই রকম পোশাকই ছিল। মুখ, দেহ, সাজপোশাক সব হ্বহ মিলে গেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার কথা মানলে বলতে হয় ওই অনুবিস হচ্ছে মডাদের রক্ষক—অর্থাৎ গোরস্থানের দেবতা। এমন বিচ্ছিরি ভূতডে দেবতাকে ঘাঁটিয়ে লাভ কী মশাই, তানুতামেনের শুকনো মডাটা মানে মানে ফিরিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—আপনারও প্রাণক্ষেত্র হয়, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!'

যতীনবাবুর মুখে ফুটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে প্রতিমনি বললেন, 'ফিরিয়ে দেব? বলেন কী? তাহলে প্রত্বত্তবিদদের গোঁ আপনি জানেন না, গোঁ বজায় রাখবার জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।'

সুন্দরবাবু বিরক্তমুখে বললেন, 'অর্থাৎ আমাদের জালিয়ে আর খাটিয়ে মারবেন? না মশাই, পুলিশ ভূত-ধরার বেসাতি করে না, আপনি ভালো রোজার তল্লাশ করুন। কী বলো জয়স্ত?'

সুন্দরবাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়স্ত বললে, 'যতীনবাবু, মমিটা প্রত্যাপণ করবার জন্যে আপনাকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সাত দিনের কয় দিন আর বাকি আছে?'

—'বাকি নেই। গতকাল ঠিক সাত দিনের মাথায় অনুবিসের দেখা পেয়েছি।'

—'তাহলে পত্রলেখকের কথায় বিশ্বাস করলে বলতে হয়, এখন যে-কোনও মৃহুর্জে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে?'

—'আজ্জে হ্যাঁ।'

—‘কাল রাত্রে সেই শেয়ালমুখো মূর্তিটাকে আপনি বাগানে হাসনুহানার ঝোপের কাছে দেখেছিলেন?’

—‘হ্যাঁ’

—‘মূর্তিটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা চলস্ত মোটরের শব্দ শনেছিলেন?’

—‘শনেছিলুম’

—‘শব্দটা আসছিল বাগানের কোন দিক থেকে?’

—‘পিছন দিক থেকে।’

—‘সেদিকে মোটর চলবার উপযোগী রাস্তা আছে?’

—‘একটা সুর কঁচা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু দিনেও সেদিকে গাড়িতে চড়ে বা পায়ে হেঁটে কাকুকে বড়ো একটা যাতায়াত করতে দেখিনি। আর রাত্রে তো নয়ই। সেদিকে আছে কেবল পোড়ো জঙ্গুলে জমি।’

—‘যতীনবাবু মূর্তিটার দেখা পাবার আগেই তো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ এক পশলা।’

জয়স্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘সুন্দরবাবু, গা তুলুন। আমরা যতীনবাবুর বাগানবাড়িতে যাত্রা করব।’

—‘কেন হ্যে, তুমি কি এই আজগুবি মামলাটার ভার নিতে চাও?’

—‘তা চাই বই কি!’

—‘কিন্তু মনে রেখো, শেষটা এ ভার দুর্বহ আর দুঃসহ হতে পারে।’

—‘হলেও সে ভার নামাবার শক্তি আমার আছে। উঠুন।’

তুলুন

তুলুন

তুলুন

১০৮ চৰকাৰ চৰকাৰ

তুলুন

তুলুন

অনুবিসের বিষের রীষে জুললে, শেষে বাঁচবে কীসে?

কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়—মাত্র মাইল বাবো পথ। তারপরেই যতীনবাবুর বাগানবাড়ি। বেশ সাজানো বাগান, বাড়িখানি বাংলো ধরনের, ছোটো হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একেবারে শয়নগৃহে চুকে জয়স্ত জিজ্ঞাসা করলে, যতীনবাবু, কেমনে জানালা থেকে আপনি সেই মূর্তিটা দেখেছিলেন?’

যতীনবাবু অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলেন।

জয়স্ত জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিচালনা করে বললে, ‘কালকের এক পশলা বৃষ্টি গাঢ়পালার ময়লা ধুয়ে দিয়েছে। সোনালি রোদের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওই হাসনুহানা ঝোপটার শ্যামলতা সুন্দর দেখাচ্ছে। যতীনবাবু, ওইখানেই কি সেই বিভাষিকার আবির্ভাব হয়েছিল?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

—‘উত্তম। চলুন ওইখানে।’

সুন্দরবাবু অধীর ভাবে বললেন, ‘ভায়া, তুমি কি এখনও ওই ঝোপের মধ্যে কোনও অসম্ভব নৱশৃঙ্গালকে আবিষ্কার করতে চাও?’

জয়স্ত অগ্রসর হতে হতে বললে, ‘দেখা যাক। অস্তত ওখানে একটা কিছু দেখতে পাব বলেই আশা করছি।’

—‘বোধ হয় অশ্বত্তিষ্ঠ?’

জয়স্ত জবাব দিলে না। আমি কিন্তু সুন্দরবাবুর মেজাজকে গরম করবার এমন সূযোগ ছাড়তে পারলুম না। হেসে বললুম, ‘ওখানে অশ্বত্তিষ্ঠ পাওয়া গেলে আমি তার ওমলেট বানিয়ে আপনার জঠরাপি নেবাবার চেষ্টা করব।’

সুন্দরবাবু রেগে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হ্যানে-অঙ্গানে তোমার ফাজলামি ভালো লাগে না মানিক।’

—‘কিন্তু ওমলেট? ওমলেট আপনার ভালো লাগে তো? বিশেষ অশ্বত্তিষ্ঠের ওমলেট। মন্ত্র বড়ো।’

সুন্দরবাবু নিরস্তর ক্ষেত্রারক্ত মুখে গট গট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে হাসনুহানার বোপের কাছে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে জয়স্ত বললে, ‘সুন্দরবাবু, এখানে ঘাসজমির ওপরে দেখবার কিছুই নেই।’

—‘সেটা আমি এখানে না এলেও ভবিষ্যত্বাণী করতে পারতুম।’

জয়স্ত বোপের ওপাশে গিয়ে বললে, ‘বোপের নীচে আদৃত কাঁচা মাছিল দিকে তাকিয়ে দেখুন।’
‘দেখব আবার কী ছাই?’

—‘ছাইত্ত্ব নয়, দেখবেন কাকুর একখানা বাঁ পায়ের ছাপ।’

—‘পায়ের ছাপ?’

—‘হ্যাঁ। কাল রাতে এখানে যে মৃত্তিমান হয়েছিল, যতীনবাবুর চিংকার শুনে সে তাড়াতাড়ি সরে এসেছিল বোপের এইখানে। পায়ের ছাপটা তারই অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে।’

—‘হ্যাঁ! বিশ্বিত সুন্দরবাবুর মুখ দিয়ে আর কেনও শব্দ নির্গতি হল না।

জয়স্ত বললে, ‘মৃত্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত পুরুষেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল শুনেই আমি আদৃজ করতে পেরেছিলুম যে, আগস্টক বাগানের কোথাও না কোথাও তার আগমনের চিহ্ন রেখে যাবে। তাই তো তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসেছি! আমি আরও কিছু দেখবার আশা করি।’

—‘আরও কী?’

—‘সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত এই ছাপটাই পর্যবেক্ষণ করুন। এটা হচ্ছে একপাটি রবারের জুতোর ছাপ। সাত নম্বরের জুতো। ছাপের নকশা দেখেই বলে দেওয়া যায়, বাট্টাকোম্পানির জুতো। যতীনবাবু, বাট্টা কোম্পানির রবারের জুতো পরে, আপনার বাড়িতে এমন কেউ আছে?’

—‘কেউ না।’

—‘সুন্দরবাবু, ছাপটার ছাঁচ তোলবার ব্যবস্থা করবেন, প্রফুল্ল হচ্ছে মূল্যবান সূত্র। পরে কাজে লাগবে। যতীনবাবু, রাত্রে মোটরের আওয়াজ শুনেছিলেন কেন দিকে?’

—‘বাগানের ওই পিছন দিকের রাস্তায়।’

—‘চলুন, ওইদিকে পা চালাই।’

বাগানের পশ্চাদ্ভাগ। কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা। তার ওপাশে পোড়ো জমি, এন্দো পুকুর, আগাছা আৱৰ কঁটাঝোপ, বাঁশখাড়, অয়ত্ববর্ধিত তাল, নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের ভিত্তি।

বাগানবাড়ির ঠিক পিছনে পথের কানায় মোটরগাড়ির চাকার দীর্ঘ একটানা রেখা।

সুন্দরবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ, ফায়ারস্টেন টায়ারের ছাপ। এরও ছাঁচ তুলে রাখতে হবে। মোটরখানা যে এইখানে বাগানের বেড়ার ধারে এসে থেমেছিল তাও বোৰা যাচ্ছে।’

জয়স্ত বললে, ‘আমি এই ব্যাপারটাই দেখবার আশা করেছিলুম। অতঃপর অনুমান করা যেতে পারে, এইখানে গাড়ি থামিয়ে চালক নিজে কিংবা তার কোনও সঙ্গী কাল রাতে বেড়া টপকে বাগানের ভিতরে করেছিল অনধিকার প্রবেশ। যতীনবাবু, আপাতত আপনার প্রতি আমার এই নির্দেশ। আজ আপনি বাড়ির বাইরে আর মুখ দেখাবেন না। আমি চললুম, সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। তারপর যা করতে হবে, তখনই শুনবেন। সুন্দরবাবু, এখানকার কাজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কিছু গোপন পরামর্শ আছে। এখন নমস্কার।’

ঞ্জনী

১৫১

সন্ধ্যার মুখেই জয়স্তের সঙ্গে আমি আবার বাগানবাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম।

যতীনবাবু একটা ঘরের বাইরের দিককার সব জানালা বন্ধ করে তায়ে জবুথু হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের আবির্ভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ‘আপনাদের দেখে যেন ধরে প্রাণ এল। এতক্ষণ একা বসে বসে দিকে দিকে শুনছিলুম যেন অঙ্গুলের ভয়াবহ পদ্ধতিনি—যেন হাজার হাজার বৎসরের ওপার থেকে মিশরের মৃত্যুষক্ত প্রাচীন সমাধিভূমি ছেড়ে অঙ্গুকারের কোনও ভয়ংকর বাসিন্দা কত সাগর নদী মুক্ত পর্বত ডিঙিয়ে ধেয়ে আসছে আমারই উদ্দেশে।’

আমি সহস্যে বললুম, ‘আপনি যে কবির ভাষায় কথা কইছেন! লোকে ভয়ে কি কবি হয়?’

যতীনবাবু বললেন, ‘ভয়ে কেউ কবি হয় কি না জানি না, কিন্তু আধমরা যে হয় তার প্রমাণ আৰ্মি।’

জয়স্ত বললে, ‘অতএব তার পাবেন না। আমার হাতে এটা কী দেখছেন?’

—‘ওটা তো একটা ব্যাগ। ওর ভেতরে কী আছে?’

—‘মাথামুণ্ড একটা কিছু আছেই।’

—‘মাথামুণ্ড?’

—‘ঠিক তাই। এখন বিনাবক্যব্যয়ে চলুন আপনার শয়নগৃহে।’

শয়নগৃহ। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়স্ত বললে, ‘এইবারে এইখানে একটা ছোটো টেবিল আৰ একখানা সোফা এনে রাখুন।’

কথামতো কাজ হল।

—‘এইবারে চাই দু-চারটে ছোটো বালিশ আৰ একটা তাকিয়া একটা জামা আৰ কিছু ন্যাকড়া।’

বিস্তৃত যতীনবাবু ফরমাশ মতো জিনিস সরবরাহ কৰলেন।

অতঃপর জয়স্ত ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে মেঝে-দিয়ে-গড়া একটা নরমুণ্ড—হঠাতে দেখলে ভ্রম হয় আসল মানুষের মাথা!

সচকিত কষ্টে যতীন শুধোলেন, ‘ও কী ব্যাপার জয়স্তবাবু, ও কী ব্যাপার!’

রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে নিরুত্তর মুখে জয়স্ত প্রথমে সোফার উপরে তাকিয়া রেখে তার উপরে জামা পৰালে, তারপর ন্যাকড়াগুলো ওঁজে দিলে এখানে ওখানে এবং তাকিয়ার উর্ধ্বদেশে স্থাপন কৱলে সেই কৃত্রিম নরমুণ্ডটা। তারপর ঘরের বাইরে বাগানে গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর দিকে তাকিয়ে চুপ কৰে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হতভুব যতীনবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কথা ফুটল। আমাকে শুধোলেন, ‘আপনার বন্ধু কী করতে চান বলুন দেখি?’

আমি বললুম, ‘এখনই শুনতে পাবেন, ধৈর্য ধরন’।

—‘কিন্তু ওই নকল নরমুণ্টা—’

—‘ওটা এসেছে থিয়েটারের সাজঘর থেকে। মঞ্চের উপরে সময়ে সময়ে কাটা নরমুণ্ট দেখানো দরকার হয় কিনা?’

তবু যতীনবাবুর মুখ দেখে মনে হল না, অঙ্ককারের মধ্যে তিনি একফোটা আলো দেখতে পেয়েছেন!

জ্যোৎ ঘরের ভিতরে এসে বললে, ‘বাগান থেকে কী দেখলুম জানেন যতীনবাবু? টেবিলের দিকে মুখ করে সোফার উপরে বসে আছেন ঠিক যেন আপনি!’

—‘আমি?’

—‘তা ছাড়া আবার কে? বালিশ তাকিয়া প্রভৃতি সোফার পিছন দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল না। দেখতে পেলুম কেবল আপনার মাথাটা। এটা আপনার শোবার ঘর। এখানে রাতে আপনি ছাড়া আবার কে থাকবে?’

—‘কিন্তু ঠিকে ভুল হল যে মশাই! ওই বিতিকিছি মুণ্টা কেউ আমার বলে সদেহ করবে না।’

—‘মশাই গো, ভুলে যাচ্ছেন একে রাত্রিকাল, তায় বাগানের দর্শক থাকবে দূরে। তার উপরে অধিকতর সাবধানতার জন্যে ঘরে আজ স্বল্পশক্তির একটিমাত্র ‘ইলেকট্রিক বাল’ জুলাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃত্রিম মুখটাকেও সুমুখ থেকে দেখা যাবে না। ওর মাথার পিছনে আছে ঠিক আপনারই মতো কাঁচাপাকা লস্বা চূল। সুতরাং দর্শকের চোখের ভুল হওয়া অনিবার্য। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেও একবার বাগানে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঙ্গ করে আসুন না।’

যতীনবাবু চোখ কপালে ভুলে শিউরে উঠে ন্যূন, ‘বাপ রে, বলেন কী? সন্দেহ উঠে গিয়েছে, এই অঙ্ককারে আমি যাব বাগানে? সে তো হবে আঘাত্যারই সামিল! না মশাই, আমি না দেখেই আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি। কিন্তু আপনার অভিপ্রায়টা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না! এত তোড়জোড় কীসের?’

—‘আজ রাতে বাগানে আবার যদি অনুবিসের অশুভ আগমন হয়, তবে নাঁগালের ভিতরে আপনার জলজ্যান্ত মাথাটা পেয়ে সে জানালাপথে নিশ্চয়ই বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করতে বিলম্ব করবে না। সাত দিন কেটে গেছে। কাল তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আজ হবে।’

—‘ওরে বাবা, আমি তখন কোথায় থাকব?’

—‘আপনাকে অন্য কোনও ঘরে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে না।

—‘একলা?’

—‘তা নয়তো কী!

—‘আর আপনারা?’

—‘আমরা এখনই বিদায় হব।’

—‘আর আমি এখানে বলির পাঁঠার মতো কেঁপে মরব? কিংবা আমার হাদ্যস্ত্রের ক্রিয়াফর্ম করে বন্ধ হয়ে যাবে? খাসা বাবস্থা! কেন, এখানে আজ কি পুলিশ মোতায়েন রাখা যায় না?’

—‘না, অনুবিস পুলিশকে ভালোবাসে না। তবে আবার আমরা আসব বই কি?’

—‘কিন্তু, আমি পটল তোলবার পরে বোধ হয়?’

—‘ভয় নেই মশাই, ভয় নেই।’

—‘ভৱসাও নেই।’

বুরিয়াছি ভূমি বাপু, শগাল-ধূর্ত, অপরূপ রূপে মতে হয়েছ মৃত!

১০৩

যেন স্তুতি হয়ে আছে রাত্রির আঘাত। কৃষ্ণ নিশীথিনীর উষ্ণ নিষ্ঠাসবায় যেন বনে বনে মুহূর্ত
জগিয়ে তুলছে দুঃসহ যশোগার আর্ত আকৃতি। পথিকুলীন পল্লিপথ মনে আনে ভয়ের শিহরন, কোথাও
নেই মানুষের সাড়া—অঞ্চ বসুন্ধরা এখন যেন পরিণত হয়েছে অমানুষের বিচরণ ক্ষেত্রে! কোনও
কালভৈরবের পদার্পণের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে আছে।

যতীনবাবুর বাগানবাড়িও অঙ্ককারে আছেন—কেবল একটি ঘর ছাড়া। সেখানে জানালা-পথে
অনুজ্জ্বল আলোকে দেখা যায়, একটি আসনে আসীন মনুষ্যমূর্তি বাইরের দিকে পিছন ফিরে টেবিলের
উপরে ঝুকে পড়ে যেন একমনে কোনও পুস্তক পাঠ করছে।

আচম্ভিতে নিশ্চিতের নীরবতাকে ঘর্ষণ শব্দে যেন করাত দিয়ে কাটতে বাগানবাড়ির নিকটস্থ
হয়ে একখানা মোটরগাড়ি হঠাত আবার স্কুর হয়ে পড়ল।

বাগানের একটা খোপ একটু দূলে উঠল, যেন কোনও আসন সন্তানার ইঙ্গিত! কোনও গাছের
পত্রাস্তরালে জাগল একাধিক পঞ্চীর কাতর চিংকার, যেন তারা পেয়েছে অভাবিত, অপার্থিত অমঙ্গলের
সন্ধান! একটা পথচারী কুকুরও হঠাত ভয়ার্ত চিংকার করতে করতে ক্রমে দূরে পালিয়ে গেল! চারিদিকেই কী এক মারাত্মক ঘড়্যাস্ত্রের আভাস!

পুরু-পাড় দিয়ে অঙ্ককারের চেয়েও কালো কী একটা ভয়াল অপচ্ছায়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ির
আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত নিঃশব্দে। তার উপর দিকে আঁধারে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো রোমাঞ্চকর অগ্নিময় বীভৎস চক্ষু! নীলাভ দীপ্তি!

আলো-জ্বালা ঘরের কাছ-বরাবর গিয়ে দীপু চক্ষু ছায়ামূর্তি হঠাত দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত
পরে কী একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঘরের ভিতরকার উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্তির মুণ্ডটা
ঠিকরে পড়ল নীচের দিকে।

পরমুহূর্তে তোলপাড় করে উঠল হাসনহানার খোপ এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগল একটা হিংস পাশবিক
গর্জন, তারপরেই বিষম কোস্তাকৃতি ধ্বনিধ্বনি ও মাটির উপরে একটা ভাস্তু দেহপতনের শব্দ!

জয়স্তরে কঠে শোনা গেল, ‘মানিক, মানিক! ভূমি চটপট এর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও! সঙ্গে
দড়ি এনেছি হতভাগার পাদুটোও বেঁধে ফ্যালো!’

তখনও ঘৃঢ়গুটে অঙ্ককারে নজর ছলে না, কিন্তু দেখা যেতে লাগল দুটো জ্বলজ্বলে আগুনচোখ! মানুষের নাগপাশে বাঁধা পড়ল কি কোনও অমানুষিক শয়তান? তাও কি সন্তুর?

আচমকা বাগানের পিছন দিক থেকে ভেসে এল দুই-দুইবার রিভলভারের শব্দ এবং বহু কঠের
হই হই রই! মহা ধুম্মার! তারপরেই এক তাঁক্ষ বংশীধনি!

জয়স্ত সানন্দে বললে, ‘সুন্দরবাবুর সংকেত শুনেই বুরিছি আরও কেউ বা কারা ধরা পড়ল!
আমাদের ফন্দি সফল!’

এদিকে হট্টগোল শুনে লঠনধারী বেয়ারা ও যষ্টিধারী দারোয়ানদের সঙ্গে বন্দুকধারী যতীনবাবুও
হস্তনেত হয়ে বাগানে ছুটে এসে উৎকৃষ্টত স্বরে বলে উঠলেন, ‘কী হল, কী হল? এত হট্টগোল কেন?’

জয়স্ত হাসিমুখে বললে, ‘হানাদাররা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ওই দেখুন একজনকে!’
লঠনের আলোয় দেখা গেল, মাটির উপরে লম্বান্ত হয়ে হাপরের মতো হাঁপাছে একটা অস্তুত

বিজাতীয় পোশাক-পরা কৃষকায় মৃত্তি—মুখ তার শৃঙ্গালের মতো, কিন্তু সেই শৃঙ্গালমুখের উপর থেকে নিবে গেছে তখন দপদপে নীলাভ দীপ্তি!

যতীনবাবু আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে বললেন, ‘কী সর্বনাশ!’

জয়স্ত বললে, ‘সর্বনাশ নয় মশাই, সর্বরক্ষা! এই দেখুন! সে একটানে মৃত্তির কাঁধের উপর থেকে উপড়ে আনলে মুখ নয়, মুখোশ! শৃঙ্গালমুখের মুখোশ!

চমৎকৃত যতীনবাবু বলে উঠলেন, ‘এ আবার কী?’

—‘ছলনা!’

—‘কে এই লোকটা?’

—‘চিনতে পারছেন না?’

—‘একে জীবনে কখনও দেখিনি?’

এমন সময়ে ঘটনাহলে এসে হাজির হলেন সবেগে ও সদলবলে সুন্দরবাবু। এসেই বলে উঠলেন, ‘এক ব্যাটাকে বাগানের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে আর এক ব্যাটা মোটরে গুম হয়ে বসেছিল। আমরা ধরতে যেতেই ব্যাটা আবার রিভলভার ছুড়তে শুরু করেছিল! সেপাই, ওটাকে ঢেনে নিয়ে আয় তো এখানে! হ্যাম, আমাকে টিপ করে গুলি ছোড়া? পাজি, ছুঁচো, উল্লুক!’

হাতকড়ি-বদ্ধ অবস্থায় যাকে টেনে-হিঁচড়ে কনস্টেবলরা সামনে এনে হাজির করলে, তাকে দেখেই যতীনবাবু বিপুল বিশয়ে একেবারে থ!

—‘কী যতীনবাবু, একে ঢেনেন নাকি?’

—‘এ যে আমার দেশত্যাগী ভাগনে মুরলীধর!’

বেকুল জয়স্তের রোপ্যময় শামুক-নস্যদানি। খুশি মুখে নাকে নস্য গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, ‘যা আন্দাজ করেছিলুম হ্বহ মিলে যাচ্ছে। যতীনবাবু, শয়নগৃহে গিয়ে দেখে আসুন, মুরলীধর প্রেরিত দূতের বাণাঘাতে আপনার নকল মুণ্ডা এখন মেরের উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছে! চেয়ে দেখুন, এখানেও পড়ে রয়েছে ওর হস্তচূত ধনুকখানা!’

যতীনবাবু অভিভূত কষ্টে বললেন, ‘এসব কথা যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—‘কিন্তু বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। শুনুন তবে সব কথা।’

নয় তো কিছুই অমানবিক

পাহাড় প্রসব করে মৃষিক!

জয়স্ত বললে

‘এই মামলাটাকে গোড়াতেই পাঁচালো বলে মনে ধোঁকা লাগে বটে, কিন্তু অন্ত মাথা ঘামানেই ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে আসে।

প্রথম থেকেই ভূতের কথা আমি একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভূত বিযান্তি তির ছুড়ে নরহত্যা করছে, ভৌতিক ইতিহাসেও সে কথা লেখে না। বিবের সাহায্য নেয় কেবল মানুষ খুনি। ভূতের কোনও বন্ধু বা সেক্ষেত্রীর ‘টাইপ-বাইটার’ পত্র লিখে কারুকে শাসাচ্ছে, এটাও হাস্যকর ব্যাপার। প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক প্রেতমৃতি বা ছায়ামৃতি পায়ের শব্দ ঢাকবার জন্য বাটা কোম্পানির পরম আধুনিক

রবারের জুতো পরে এবং তাড়া খেলে মোটরে চড়ে টেনে লস্থা দেয়, ভৃতুড়ে যুক্তিতেও এসব মানা চলে না।

কিন্তু বিনা কারণে হত্যা বা নরহত্যার চেষ্টা হয় না। ভৃত্যাচিত ব্যাপারগুলো যদি অঙ্গীকার করি, তবে সনৎকুমারকে হত্যা আর যতীনবাবুকে মারাত্মক আক্রমণ করার মূলে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

নিজের মনের ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলুম। যতীনবাবু ধনী ও নিঃসন্তান, তাঁর সম্পত্তির লোভেই কেউ ইহসব কুর্কার্য করছে। যতীনবাবু ও সনৎকুমারের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হতে পারে কে? নিশ্চয়ই যতীনবাবুর অন্যতম ভাগিনীয়ে ও সনৎকুমারের মাসতুতো ভাই মুরলীধর।

তার পরিচয় দিয়েছেন যতীনবাবু স্বয়ং। সে এমন কুচরিত্ব ও অমানুষ যে মাতুল তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিষয়-আশয় থেকে বাধিত করতে বাধ্য হয়েছেন। সে নির্বোজ এবং ভবঘূরে।

পরিত্যক্ত হবার আগে সে ছিল মাতুলের প্রিয়পত্র। যতীনবাবুর কাছে থেকেই সে যে প্রত্যত্ত্বের অন্তর্বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, এই তথ্যটা আমার যথেষ্ট কাজে লেগেছে।

আর একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, ভাসা ভাসা খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মুরলীধর নাকি আফ্রিকায় প্রবাসী হয়েছে।

আমি আন্দাজ করলুম, আফ্রিকায় থাকতে থাকতেই সে মাতুলের মমি কেনার কথা জানতে পারে এবং তারপরেই সে শয়তানি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ওই সুযোগটা গ্রহণ করে। মমি শ্বানাস্তরিত করলে মারাত্মক অভিশাপগ্রস্ত হতে হয়, এই চলতি কুসংস্কারটাও সে কাজে লাগাতে ছাড়েনি। কিন্তু প্রত্যত্ত্ববিদ্যাবিশারদ মাতুল যে প্রাণভয়েও মরিকে হাতছাড়া করতে রাজি হবেন না, এটা জেনেই সে আটঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুবিসের ছদ্মবেশে অন্য যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে, সে হচ্ছে তারই আজ্ঞাবহ এবং পাপকর্মের সঙ্গী।

খুনির স্বরূপ যদি কেউ ধরে ফেলে, তাই অনুবিসের ছদ্মবেশে আর রূপকথার প্রয়োজন হয়েছে। ওর মধ্যে পুলিশকেও বিপথে চালাবার গোপন অভিসংহি আছে।

আর অগ্নিয় চশুর রহস্য? ওটা হচ্ছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল—অর্থাৎ ফসফরাস ঘটিত চালাকি, সহজেই সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধানো যায়! সাদা ফসফরাস অঙ্গীকারে জুনে।

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই!

যতীনবাবুর মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না, কেবল কাত্তরভাবে একটা অব্যক্ত শব্দ করে তিনি অবসন্নের মতো বসে পড়লেন।

সুন্দরবাবু বললেন, ‘কথায় কথায় লোকে বলে—‘য়ম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা’! হায় রে, সেই কথাই দেখছি সত্য হয়ে দাঁড়াল!’

জয়স্ত বললেন, ‘কথার কথা ছেড়ে দিন সুন্দরবাবু, এমন ভাগনে হাজারে একটাও হয় না। আসল কথা কী জানেন? সুজনের স্বজন সর্বজন, কিন্তু দুর্ভ কাকুকে স্বজন বলে মানে না!’

পুস্তক প্রক্ষেপ

১৯৩৪ সালের প্রক্ষেপ

পুস্তক প্রক্ষেপ

১৯৩৪ সালের প্রক্ষেপ

হস্তারক নরদানব



পটভূমিকা

ইতিহাস যখন লিখিত হয়নি, জলদস্যু বা বোষেটের অত্যাচার আরজ্ঞ হয়েছে তখন থেকেই। প্রিস্টপূর্ব যুগেও দেখা যায় প্রাচীন মিশন, গ্রিস ও রোমের সমুদ্রযাত্রী জাহাজ বোষেটেদের পাল্লা থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত রোমান দিপিজীয়ী জুলিয়াস সিজারকে পর্যন্ত একবার বোষেটেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল! ইংরেজিতে Pirate বলতে বুবায় বোষেটে এবং গ্রিক Peirates থেকে ওই শব্দটির উৎপত্তি। উপরন্তু পর্তুগিজ Bombardier শব্দটি ভেঙে গড়া হয়েছে বাংলায় চলতি ‘বোষেটে’ শব্দটি।

প্রাচীন ভারতবাসীরাও সাগরযাত্রায় বেরিয়ে যখন-তখন ধরা পড়ত বোষেটেদের ফাঁদে। তারপর অষ্টক শতাব্দীতে ভারতের মাটিতে মুসলমানরা যে প্রথম ইসলামের পতাকা রোপণ করবার সূযোগ পায়, তারও মূলে ছিল ভারত সাগরের বোষেটেরাই। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনি, এখানে বলবার জায়গা নেই।

তারপর মধ্যযুগের ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান বোষেটেদের ভয়াবহ অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এবং জলদস্যুতা পরিণত হয়েছিল একটি রাঁতিমতো লাভজনক ব্যবসায়ে। ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য বোষেটেদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রেও। আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বোষেটেদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে ওঠে যে, তারা জল ছেড়ে ডাঙায় নেমেও দেশের পর দেশে হানা দিতে তার পেত না।

বোষেটেদের সাহস বাড়বে না কেন? বড়ো বড়ো ইংরেজ বোষেটে ইংল্যান্ডের রাজাদের কাছ থেকেও আশকারা পেয়েছে। অনেক বোষেটের জন্ম আবার সন্তুষ্ট পরিবারে। স্পেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে যখন লড়াই চলত, ইংল্যান্ডের রাজারা তখন বোষেটেদেরও লেলিয়ে দিতে লজ্জিত হতেন না এবং তারাও প্রশংস্য পেয়ে স্পেন বা ফ্রান্সের যে-কোনও জাহাজের উপরে হামলা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করত। হেনরি মর্গ্যান ছিল সতরে শতাব্দীর এক কুখ্যাত ইংরেজ বোষেটে। সে কেবল জলপথে নয়, হৃলপথেও শত শত নরহত্যা করেছে এবং নির্বিচার লুঠনের পর বহু জনপদকে করেছে অগ্নিধূমে সমর্পণ। তাকে বন্দি করে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লস ক্রাইর সঙ্গে আলাপ করে এমন মুঝ্ব হলেন যে, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মর্গ্যানকে ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত করে জামাইকা দ্বিপের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

জনৈক ইংরেজ বোষেটে একবার ভারত সাগরে এসে যোগালদের জাহাজের উপরে চড়াও হয়ে বাদশাহ আলমগীরের পরিবারভুক্ত দুইজন রাজকন্যাকেও বন্দিনী করতে ভয় পায়নি।

সুন্দরবন ছিল আগে বর্ধিষ্ঠ লোকালয়, পরে পরিণত হয়েছে বিজন জলা-জলদে। মানুষের বিচরণ-ভূমি দখল করেছে হিংস্র পশুর দল। কারণ? পর্তুগিজ ও মগ বোষেটেদের অত্যাচার।

দুইজন মেয়ে-বোষেটেরও নাম বিখ্যাত—আন বোনি ও মেরি রিড। জাতে ইংরেজ। তাদেরও গুরু অতিশয় চিন্তাকর্ষক, কিন্তু আমরা বোষেটেদের ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূমিকার জন্যে যতকুকু চাই, ততকুকু ইঙ্গিতই দিলুম, আপাতত এ সম্বন্ধে আর বেশি বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। এইবার মূল কাহিনি শুরু করা যাক।

যার কথা বলব তার আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ, কিন্তু 'কালোদেডে' ডাকনামেই সে সর্বত্র পরিচিত (যেমন কুখ্যাত মুসলমান বোম্বেটে উরুজ পরিচিত ছিল 'লালদেডে' ডাকনামে)। সে কেবল স্পেন ও ফ্রান্সের শক্রই ছিল না, নিজের জাতভাই ইংরেজদেরও সুবিধা পেলে ছেড়ে দিত না এবং সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঁজি তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে সারা হত। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার উত্থান এবং পতন। আমেরিকায় তখন ইংরেজদেরই রাজস্ব।

১৯৭৫

২

নায়কের মধ্যে প্রবেশ

১৯৭৫

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঁজি। তারই উত্তরে আছে সাতশো আশি মাইল লম্বা বাহামা দ্বীপপুঁজি—তাদেরও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দিকে যাত্রা করবার পর কলম্বসের চোখে পড়ে সর্বপ্রথমে বাহামা দ্বীপই।

বাহামার অন্যতম দ্বীপ নিউ প্রভিডেস এবং সেখানে ছিল বোম্বেটেদের জাহাজ ভিড়োবার এক মস্ত আড়া। আমাদের কাহিনির সূত্রপাত সেখানেই।

বোম্বেটেদের নিজস্ব এক কালো পতাকার নাম ছিল 'জলি রোজার'—তার উপরে সাদা রঙে আঁকা থাকত কোনাকুনি ভাবে রক্ষিত দুটো অঙ্গুখণ্ডের উপরে একটা মড়ার মাথা। সাগরপথের যাত্রীরা এই কৃষ্ণপতাকা বা 'জলি রোজার'কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ভয় করত। সৌভাগ্যের বিষয়, 'জলি রোজার'র অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

নিউ প্রভিডেস দ্বীপের বোম্বেটে-বহরের জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কাণ্ডেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড। লোকের চোখ ভোলাবার জন্যে তাঁর জাহাজের উপরে উড়ছে এখন ইংল্যান্ডের রাজপতাকা বা 'ইউনিয়ন জ্যাক'। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সেখানে 'ইউনিয়ন জ্যাকে'র জায়গা ঝুঁড়ে বসবে সর্বমে�ে 'জলি রোজার'—কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা জলদস্য!

হর্নিগোল্ড আজ কয়েকদিন জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন একজন সহকারী অধ্যক্ষের জন্য। সহকারী অধ্যক্ষের অভাবে জাহাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন শুভ্রিখানা ও গুণাপাদ্য ঘুরেও তিনি মনের মতো সহকারী খুঁজে পাননি এবং সেই অভাবের জন্যে তাঁর জাহাজ বন্দরের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে।

নিজের মনেই গজ গজ করে তিনি বললেন, 'এমন তরুণ করে খুঁজেও এক বেটা মনের মতো পায়ও গুণ্ঠার পাত্রা পাওয়া গেল না! আমার জাহাজের বুনে বদমাইশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে যে খোদ শয়তানের মতো ধড়িবাজ লোক দরকার।'

আচম্ভিতে কাছ থেকেই কে পাগলের মতো হো হো করে অটুহাসি হেসে উঠল—দস্তরমতো শয়তানি হাসি!

চমকে উঠে নিজের পিস্তলের উপরে হাত রেখে হর্নিগোল্ড রক্ষে ফিরে দাঁড়ালেন—সত্যসত্যই কি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং শয়তান?

কিন্তু কিমার্শ্যর্মতঃপরম! এ যে কবির ভাষায়—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।'

জাহাজ-ঘাটার অন্যান্য লোকদের মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে জেগে উঠেছে দৈত্যের মতো এক অসম্ভব মনুষ্যদেহ—যেমন লস্বা, তেমনি চওড়া! যেন বামনদের মাঝখানে এক বিরাট পুরুষ! তার মহাবলিষ্ঠ

বিপুল বপুর সর্বত্তোই দেখা যাচ্ছে লৌহকঠিন পেশির পর পেশির তরসয়িত গতি। সেই কৃক্ষ কেশকটকিত মুখে আগুনের ফিলকির মতো জলছে দৃঢ়ো কৃচ্ছ্রতে কৃচ্ছ্রতে চঙ্গ। মাথায় পুরু কালো চুল—এবং চোখ-নাকের পাশে ও তলায় সে কৈ কৃষ্ণ ও ঘন শাঙ্কর ঘটা! কয়েকটা যত্নরচিত বেণিতে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকাণ্ড চাপদাঁড়ি ঝুলে পড়েছে একেবারে কোমর পর্যন্ত! কেবল বিউনি বেঁধেই দাড়ির পরিচর্যা শেষ করা হয়নি—তার উপরে তাকে আবার অলংকৃত করা হয়েছে রংচঙ্গে সব বেশমি হিতে দিয়ে! তার বক্ষ-বন্ধনীতে ঝুলছে তিনজোড়া পিণ্টল এবং গলায় আছে সোনা ও কুপায় গড়া হার!

তারপর বিশ্বায়ের উপরে বিশ্বায়! মাথার টুপির তলা থেকে ঝুলে পড়ে কয়েকটা মৃদু-জ্বলনশীল পলিতা সেই ভীষণ মুখখানা অধিকতর ভয়াল ও বাতাসকে ভারাত্তান্ত করে তুলেছে গন্ধকের উগ্র গঞ্জে!

যেন অপচ্ছায়ামূর্তি! খতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে পড়লেন হর্নিগোল্ড! এমন ধারণাতীত দৃশ্য তিনি জীবনে আর দেখেননি।

পরমহন্তেই তাঁর সন্দেহ হল যে, মুর্তি তাঁকে দেখেই হাসছে যেন বিশ্বী ব্যঙ্গের হাসি!

এই কথা মনে হতেই কাষ্ঠেন হর্নিগোল্ড খেপে শিয়ে পিণ্টল বাগিয়ে ধরে কুপিত কষ্টে বললেন, ‘ওরে কালোদেড়ে শয়তান, আমাকে দেখে ঠাট্টা? মজাটা দেখবি নাকি?’

কিন্তু কোনও মজাই দেখানো হল না—ধাঁ করে তাঁর মনে পড়ে গেল একটা কথা। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, ‘চিচ? তুমি কি এডওয়ার্ড চিচ?’

—‘সঠিক আন্দাজ! আমি এডওয়ার্ড চিচই বটে, দেশ আমার বিস্টলে।’

—‘সবাই তোমাকে কালোদেড়ে বলে ডাকে তো?’

পলিতার আগুন তখন দাড়ির উপরে নেমে এসেছে এবং চারিদিক ভরে উঠেছে গন্ধকের গঞ্জের সঙ্গে চুল-পোড়া দুর্গঞ্জে! কালোদেড়ে তার শাঙ্কর বেণিশুলো তাড়াতাড়ি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বললে, ‘হাঁ, আমি কালোদেড়েই বটে! একটু আগেই আপনি যা বলেছিলেন আমি শুনতে পেয়েছি। জাহাজের বেয়াড়া বেহেড় লোকগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে আপনার বেপরোয়া সহকারী দরকার?’

কালোদেড়ে কথা কইতে কইতে মিট মিট করে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে দেখে তপ্ত হয়ে উঠল হর্নিগোল্ডের বুকের রক্ত! এমন দুঃসহ বেয়াদপি দেখলে যে-কোনও বোস্বেটে-জাহাজের মালিক তৎক্ষণাতঃ তার মৃত্যুদণ্ডের বাবস্থা করতেন। কিন্তু এই শ্রেণির একজন দৃষ্ট ও ধৃষ্ট সহকারীর অভাবে তাঁর জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে বলে মনের রাগ মনেই চেপে তিনি বললেন, ‘তাহলে আমার জাহাজের অবাধ্য লোকগুলোর ভার আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম! কিন্তু তোমার ওই যাচ্ছতাই জুলাত পলতেগুলো আর আমি সহজে পোরাই না, ওগুলো নিবিয়ে ফ্যালো!’

—

৩

আগন্তুকের স্বরূপ

উপযোগী বাতাস পেয়ে জাহাজ বন্দর ছেড়ে ভেসে চলল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দু-দিন পরেই কাষ্ঠেন হর্নিগোল্ডের বুকতে বাকি বইল না যে, সহকারীরাপে যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন, দুর্বলতায় সে শয়তানেরই জুড়িদার বটে! কাষ্ঠেনের ঘরের আওতাতেই দাড়িয়ে সে নোংরা, অশ্রাব্য ভায়ায় চেঁচিয়ে, শপথ করে এবং টুপি থেকে ঝুলস্ত পলিতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে যথেচ্ছ ভাবে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ছেড়ে ছয়-ছয়টা পিণ্টল—কেউ হত বা আহত হল কি না তা নিয়ে

মোটেই মাথা ঘামায় না! একে তো সেই বিপুলবপু নরদানবের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে চমকে যায়, তার উপরে তার পাশবিক গর্জন শুনে এবং পিস্তলগুলো নিয়ে মারাত্মক খেলা দেখে মহাপামণ বোম্বেটেগুলো পর্যন্ত আতঙ্কে থরহরি কম্পমান দেহে জাহাজের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দেয় এবং তাদের মুখের ভাব যেন জাহির করতে চায়—ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি!

কালোদেড়ের সামনে গেল সকলেরই অবশ্য হয় ভিক ভেড়ার মতো।

একদিন সে হাঁক ছেড়ে ডাক দিলে, ‘এই রাবিশের দল, আজ আমরা এক নিজস্ব নরক তৈরি করব! দেখব কতক্ষণ আমরা নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি! চল সবাই জাহাজের নীচের তলায়!’

ক্রম, ক্রম, ক্রম! পিস্তলের পর পিস্তলের ধর্মক! ভয়ে কঁচোর মতো বোম্বেটের দল নীচের তলায় গিয়ে হাজির হতে দেরি করলে না। তারপর দৃঢ়-দাম করে বক্ষ করে দেওয়া হল সব দরজা। অগ্নিসংযোগ করা হল বড়ে বড়ে গন্ধকের কুণ্ডে। দাউ দাউ করে আগুন জুলল না বটে, কিন্তু হৃষ করে গন্ধকের ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমেই কুণ্ডলিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে সেই রন্ধ্রাদীন বন্ধ জায়গাটাকে করে তুললে ভয়ংকর দুঃসহ! দৃষ্টি হয়ে যায় অন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে আসে ঝুঁতি, অস্তিমাল মনে হয় আসন্ন! অমন যে বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নরঘাতক বোম্বেটের দল, তারাও হাঁচতে হাঁচতে, কাশতে কাশতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ও মৃত্যুভয়ে কাঁপতে হাঁটু গেডে কালোদেড়ের সামনে বসে পড়ে আর্ত স্বরে চাঁচাতে লাগল—‘প্রাণ যায়, বাঁচাও! দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!’

দুই হাতে দুটো করে পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে কালোদেড়ে বিকট স্বরে অট্টাহাস্য করে নেচে নেচে বলে উঠল, ‘একবার নরকে ভরতি হলে আমার শয়তানদাদা আর তোদের ছুটি দেবে না—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে নরকবাসের অভ্যাসটা করে নে রে?’

—‘গেলুম, গেলুম,—আর নয়! বাবা রে, দম বন্ধ হয়ে এল!’

তখন দরজা খুলে দিয়ে কালোদেড়ে গর্জন করে বললে, ‘কেমন, এখন বুঝলি তো, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?’

জাহাজের উপর থেকে কালোদেড়ের আশ্ফালন শুনতে শুনতে কাপ্টেন হর্নিগোল্ডের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এমন সাংঘাতিক সহকারীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করা অতিশয় বিপজ্জনক। ভাবতে লাগলেন, এখন কোন উপায়ে এই নারকীর পান্ডা থেকে ভালোয় ভালোয় ছাড়ান পাওয়া যায়?

8

কালোদেড়ের বিদ্যায়ী সেলাম

আরও কয়েকদিন যেতে না যেতেই কাপ্টেনের ভয় আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল।

একদিন সমুদ্রে আবির্ভূত হল দুই-দুইখন জাহাজ—তারা আসছে যথাক্রমে হাতানা ও বারমুড়া থেকে।

হর্নিগোল্ডের জাহাজে অমনি উড়িয়ে দেওয়া হল হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা কালো ‘জলি রোজার’ পতাকা।

আগস্তক দুই জাহাজই সেই অশুভ পতাকা দেখে শিউরে উঠে আস্তসমর্পণ করলে বিনা-বাক্যব্যয়ে।

হর্নিগোল্ড জাহাজ দুখনা নিঃশেষে লুঞ্চ করলেন বটে, কিন্তু তাদের লোকজনদের অক্ষত দেহেই ঘৃঞ্জি দিলেন। অকারণে তিনি রক্ষপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে দারুণ ক্রোধে ধৈর ধৈর করে নাচতে নাচতে গর্জন করে উঠল, ‘ওদের সবাইকে ফেলে দাও সমুদ্রে, ওরা মাছেদের খোরাক হোক!’

হর্নিগোল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘এ জাহাজের কাপ্টেন হচ্ছি আমি, তুমি হৃকুম দেবার কেউ নও!’

কালোদেড়ে বললে, ‘মরা মানুষ কথা কয় না, সাক্ষ দিতে পারে না। আমি কাপ্টেন হলে কখনও ওদের ছেড়ে দিতুম না।’

হর্নিগোল্ড বললেন, ‘ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি যাতে কাপ্টেন হতে পারো, শীঘ্ৰই আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।’

কালোদেডের মুখে হাসি ফুটল বটে, কিন্তু সে হাসি হচ্ছে দন্তৰমতো বিষাক্ত।

বাসনা পূর্ণ হল না বলে মনের দুঃখ ভুলবার জন্যে সে সদালৃঢ়িত জাহাজ থেকে একটা মদের পিপে টেনে এনে নিজের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বললে, ‘চলে আয় সব তৃক্ষণার্তের দল! পেট ভরে মদ খা আর প্রাণ-ভরে ফুর্তি কর!’

জাহাজের উপরে বইল যেন মদের চেউ! কালোদেডের টুপি থেকে লম্বমান জুলস্ত পলিতাণুলো দেখাতে লাগল যেন অভিনব দেওয়ালির বাঁধা-রোশনাই! মদে চুমুকের পর চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগল, ‘জানিস তোরা আমার বাহাদুরি? এ অঞ্চলের বারোটা বন্দরে আছে আমার এক ডজন বট—আমি কি যে-সে লোক রে? দু-দিন সবুর করলেই দেখবি আমি হয়েছি নিজস্ব জাহাজের মালিক আর তার নাবিকরা হয়েছে পুরোপুরি আমারই তাঁবেদার!’

তার সাধ পূর্ণ হল দিন কয়েক পরেই।

সমুদ্রে চেউ কেটে এগিয়ে আসছে একখানা বাণিজ্যপোত।

বোম্বেটে জাহাজের কৃষ্ণপতাকা দেখেও তার লোকজনরা দমল না, লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কালোদেডেও তো তাই চায়—মারামারি, রক্তারঙ্গি, খুনোখুনি! কাপ্টেন হর্নিগোল্ডকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সায় দিতে হল।

বোম্বেটে-জাহাজ থেকে হস্কার দিয়ে উঠল কামানের সারি এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল বন্দুকগুলোও! মড় মড় করে ভেজে পড়ল বাণিজ্যপোতের ক্ষয়েক্ষণ তত্ত্ব এবং শোনা গেল আহতদের সকরুণ আর্টনান্দ।

দুই জাহাজ পাশাপাশি হতেই কান-ফাটানো ভৈরব গর্জন করে মহাকায় কালোদেডে মৃত্যুমান অভিশাপের ঘাতো লাক দিয়ে পড়ল বাণিজ্যপোতের উপরে শুরু শূন্যে বন-বন করে ঘূরতে লাগল তার রক্তলোভী, শাশিত ও বৃহৎ তরবারি! যারা বাধা দিতে এল তাদের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

নিজের জাহাজে দাঁড়িয়ে কাপ্টেন হর্নিগোল্ড আশা করেছিলেন শক্রবেষ্টিত কালোদেডে এ-যাত্রা আর আঘাতবন্ধন করতে পারবে না। একথাও ভেবেছিলেন, নিজেই পিস্তল ছুড়ে পথের কাঁটা দূর করবেন—কিন্তু হায়, পিস্তলের শুলি অতড়ুরে পৌঁছোবে বলে মনে হল না।

ব্যর্থ হল হর্নিগোল্ডের আশা! শোনা গেল কালোদেডের বশ-কঠের সঙ্গে অন্যান্য বোম্বেটেদের হই-হল্লোড়, জয়ধ্বনি! বাণিজ্যপোত অধিকৃত এবং তার লোক-লশকর হত আহত বা বন্দি!

বন্দি যাত্রাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কালোদেডে নির্দয় হৃকুম দিলে, ‘ওদের সমুদ্রে ফেলে দে, ওরা মাছেদের উপবাস ভঙ্গ করুক।’

যাত্রাদের কঠে কঠে জাগল গগনভূমি ক্রমনধৰনি, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কালোদেডে

বললে, ‘এইবাবে বন্দি নাবিকদের ব্যবস্থা কর! যারা আমাদের দলে যোগ দিতে না চাইবে, তারাও হবে মাছেদের খোরাক! আহত শক্রগুলোকেও ওই সঙ্গে জলে ফেলে দে!’

চিংকার ও হাহাকার কোনও-বিছুতেই কান না পেতে বোষেটেরা কালোদেড়ের হকুম তামিল করতে লাগল।

কালোদেড়ে চেঁচিয়ে হর্নিগোল্ডকে ডেকে বললে, ‘শুনুন কাপ্টেন! এ জাহাজখানা এখন আমাদের!’

হর্নিগোল্ড বললেন, ‘আমাদের নয় বাপু, খালি তোমার! আজ থেকে তুমি হলে কাপ্টেন চিঃ?’

‘কাপ্টেনে’র পদে উন্নীত হয়ে কালোদেড়ের ওষ্ঠাধরের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে সে সন্তুষ্ট হল না। এখানা হচ্ছে মাত্র ‘স্লুপ’ (এক মাস্তুলের ছোটো জাহাজ), সে চায় বহু বড়ো বড়ো জাহাজের বহর চালনা করতে। হর্নিগোল্ডের জাহাজখানাও ‘স্লুপ’ শ্রেণিভুক্ত।

কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার নতুন শিকারের সন্ধানে সমুদ্রবাতা।

দুই দিনের মধ্যেই জুটুল এক পরম লোভনীয় শিকার—একখানা মস্ত বড়ো ফরাসি জাহাজ!

চোখে-কানে ভালো করে কিছু দেখবার ও শোনবার আগেই বোষেটেদের জাহাজ দুখানা তিরবেগে তার দুই পাশে গিয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি বৃষ্টি করতে লাগল—ফরাসি জাহাজখানার অবস্থা হল টলোমেলো, দলে দলে মাল্লা মৃত বা জখম হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপরই দেখা গেল, এক রোমশ নরদানবের পিছনে পিছনে বোষেটেরা দলে দলে উঠেছে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের উপরে। তখনও যে-সব হতভাগ্য জীবিষ্ঠ ছিল তারাও জাহাজের পাটাতন থেকে নিষ্কিপ্ত হয়ে সশরীরে করলে পাতালপ্রবেশ!

কালোদেড়ে তৎক্ষণাৎ সেই নতুন ও প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখলে—‘প্রতিহিংসা!’

তারপর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিংকার করে বললে, ‘ওহে নরকের খোকা হর্নিগোল্ড! তোমার ওই পুঁকে খেলো জাহাজকে আমি এইখান থেকেই বিদ্যায়ী সেলাম টুকছি! আমি নিজের পছন্দমাফিক জাহাজ পেয়েছি, তোমাকে এর মালপত্তরেরও ভাগ দেওয়া হবে না—হে হে হে, বুখলে বাপু?’

কাপ্টেন হর্নিগোল্ড কোনও জবাব দিলেন না, নিজের জাহাজের মুখ ঘূরিয়ে আবার ফিরে চললেন নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। বোষেটেগিরিতে তাঁর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, তিনি এই নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন।

৫ প্লাতক রণতরী

কালোদেড়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে দেরি লাগল না।

প্রথমেই তার কবলগত হল একখানা ইংরেজ জাহাজ—‘গ্রেট আলেন’।

তারপরেই প্রমাণিত হল কালোদেড়ে যে-সে সাধারণ বোষেটে নয়! সে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম সওদাগরি জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে হাতিয়ার হাঁকড়ায় না এবং রণতরীর সামনে পড়লেই চটপট চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না।

‘স্কারবরো’ হচ্ছে ইংরেজদের বৃহৎ মুদ্র জাহাজ, তার পাটাতনে সাজানো সারে সারে ভারী ভারী কামান এবং তার নৌসৈন্যদের প্রত্যেকেই বন্দুকের অধিকারী।

হঠাৎ ‘স্কারবরো’ গিয়ে হাজির বোম্বেটের ‘প্রতিহিংসা’র সামনে।

যুদ্ধজাহাজের নায়ক বরাবরই দেখে এসেছেন, রণতরীর সম্মুখীন হলেই বোম্বেটেরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সব পাল খাটিয়ে দিয়ে বাখের সামনে ভীরু হরিণের মতো পালাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি আগে থাকতেই নিজের জাহাজের সব পাল তুলে দিয়ে কামান দাগতে দাগতে বেগে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ‘প্রতিহিংসা’ পালাবার কোনও চেষ্টাই করলে না!

মুখভরা হাসি নিয়ে নিজের জাহাজের পাটাতনের উপরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোদেড়ে, তার বেশিবক্ষ শার্ক দুইটাগে বিভক্ত হয়ে দুই ক্ষঙ্গের উপরে নিষিপ্ত, তার তুপিতে সংলগ্ন প্রজ্বলিত পলিতাণুগুলো অগ্নিসপ্তশুর মতো জোর-হাওয়ায় দিকে দিকে ছিটকে পড়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আগনের হলকা!

বোম্বেটে গোলন্দাজরাও কামানে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল।

কালোদেড়ে বললে, ‘আর একটু সবুর করো, এখনও কামান দাগার সময় হয়নি। ওদের আরও কাছে আসতে দাও।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল, দুই জাহাজের মাঝখানকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে! তারা প্রায় সামনাসামনি এসে পড়ল অবশ্যে।

আচম্ভিতে শুন্যে তরবারি চালনা করে কালোদেড়ে হংকার দিয়ে হকুম দিলে, ‘সময় হয়েছে! কামান ছোড়ো।’

‘প্রতিহিংসা’র সমস্ত কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

যুদ্ধজাহাজ ‘স্কারবরো’ প্রথম আক্রমণেই বেধডক মার খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়ল! বিপুল বিস্ময়ে নৌসেনানায়ক কোনওরকমে নিজের রণতরী সামলে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের মানরক্ষা করতে না পারলেও রক্ষা করলেন পৈতৃক প্রাণগুলো!

বোম্বেটে-জাহাজের পিছনকার সব চেয়ে উচ্চ পাটাতনের উপরে দেখা গেল—গগনভোগী চিঁকারে দিগবিদিক কাঁপিয়ে বিরাটবেপু কালোদেড়ে ইংরেজ নৌসেনাদের উপরে গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষণ করছে এবং মাথার উপরে বনবানিয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে কখনও ন্যাক মারছে শূন্যপথে ও কখনও মেতে উঠছে তাঙ্গৰ ন্যাতে।

৬

গৌরবের তুঙ্গশিরে

ইংরেজ রণতরীকে হারিয়ে দেবার পর কালোদেড়ের খাতিরের সীমা রইল না। তার নাম শুনলেই দেহপিঞ্জির ছেড়ে ভয়ে উড়ে যেতে চায় লোকের প্রাণপাখি! বিশেষত মালবাহী জাহাজি কাপ্টেনদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যার দেখা পেলে যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে পিটাটান দেয় ইংল্যান্ডরাজের সশস্ত্র ও সসজ রণতরী, তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নিরস্ত্র ও নির্বল সওদাগরি জাহাজ কতুকু বাধা দিতে পারে?

না, বাধা দিতে পারেনি সত্যসত্য। আর এই সত্য বোঝা গেল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। কারণ উপরি-উপরি কয়েকখানা জাহাজ বলি করে কালোদেড়ে হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো এক নৌবহরের অধিকারী। যেসব জাহাজ উল্লেখযোগ্য মনে হল না, সেগুলোকে সে বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবিয়ে দিলে

মহাসাগরের অতল পাতালে। সফল হল কালোদেডের বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তার তাঁবে এখন এসেছে সত্যসতাই নৌবহর! কোনও সওদাগরি জাহাজ আজ অন্তর্বলে বলীয়ান হলেও তার সঙ্গে আর পাণ্ডা দিতে পারবে না!

বন্দি বা ধৃত জাহাজের অসংখ্য লোক প্রাণ দিলে বোষ্ঠেটেদের বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্রের মুখে। তুলনায় তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কিন্তু যারা মরল না এবং যারা জখম হয়েও বেঁচে রইল তাদের পরিণাম হল মর্মবিদারক। কালোদেডের নির্দেশে সাগরে ঝাঁপ খেতে বাধা হয়ে তাদের প্রত্যেকেই লাভ করলে সজ্ঞানে সলিলসমাধি! ভালোয় ভালোয় আস্থাসমর্পণ করেও বাঁচোয়া নেই, কেঁদে-কেঁটে হাতে-গায়ে ধরে শ্বেত চাওয়াও বার্থ—কালোদেডের পায়াগ-হাদয়ে কেউ দেখেনি দয়া-মায়ার ছিটেফেঁটাও! তার মুখে শোনা যায় একই ধরনের উচ্চি, ‘ওদের জোর করে ছুড়ে ফেলে দে সমুদ্রে! হোক ওরা মাছেরে খোরাক—করুক ওরা হাঙ্গরদের উদ্রপূরণ!’

সে সময় অসীম সাগরের আকাশ-বাতাস কাপিয়ে কত জাহাজ মানুষের তৌত্র ক্রন্দনধরনি শুনে চমকিত হয়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, কোথাও তার কোনও হিসাব লেখা নেই!

তার দুষ্কর্মের সাক্ষ হতে পারে এমন কোনও মানুষ বা জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কালোদেডের কাছে ছিল দস্তরমতো নিবৃদ্ধিতার কাজ।

৭

কালোদেডের নতুন বউ

এক জাহাজের অধ্যক্ষকে বলে ‘কাপ্টেন’ এবং একাধিক জাহাজের অধ্যক্ষ ‘কমোডোর’ নামে পরিচিত। কালোদেডে গ্রহণ করলে উচ্চতর ‘কমোডোর’ উপাধি।

সে বললে, ‘আহা, আজ আমার মা বেঁচে থাকলে পুত্রের গৌরবে হতেন গৌরবিনী!’

কিন্তু মা পরলোকে গেলেও ইহলোকে বসে এতটা গৌরব চুপচাপ ধাতস্থ করাও যায় না। অতএব সে নির্দেশ দিলে—‘উৎসব কর!’

কালোদেডের বোষ্ঠেটে-শান্ত্রে উৎসবের অর্থ হচ্ছে নারকীয় কাণ্ড। সাগরের দিকে দিকে তার নৌবহরের গোলন্দাজরা সমস্ত কামান থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করে দেখাতে লাগল বিরাট ও ভয়ংকর আঘেয়ে দৃশ্য!

দৈর্ঘ্যতিকে ও দুর্ভাগ্যক্রমে যারা তথাকথিত উৎসবের প্রেছু অগ্নিপ্রাপত্তের মধ্যে এসে পড়ল, তারা যে কেউ ধনে-প্রাণে রক্ষা পেলে না, সেকথা বলাই বাস্তু একে একে জনে ডুব মারলে চার-চারখানা লুঁচিত জাহাজ।

তারপর নামে উৎসব শেষ হল বটে, কিন্তু জলপথে ছুটাছুটি করে জাহাজের পর জাহাজের উপরে হানা দিয়ে নৃঠতরাজ, রক্তপাত ও নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড চলল অবিশ্রান্ত।

কালোদেডে ধনী যাত্রীদের কিন্তু প্রাণে মারত না, বন্দি করত। বন্দরে পোছে আস্থায়দের কাছে থবর পাঠিয়ে প্রচুর টাকা মুক্তিমূল্য আদায় না করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত না। বলা বাস্তু হাতিমধ্যে ধনী বন্দিদের জড়েয়া গচ্ছনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুঁচিত হয়ে উঠত গিয়ে কালোদেডের প্রশস্ত ভাণ্ডারে। এইভাবেও সে প্রভৃত ঐর্ষ্যের অধিকারী হয়েছিল।

ওই অঞ্চলে সমুদ্রের চারিদিকে আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো দীপ। সেইসব নামহীন দীপে কোনও

মানুষ বাস করে না, তাদের কোথায় কী আছে তাও কেউ জানে না। প্রবাদ, এমনি কোনও অজ্ঞানা দ্বিপে কালোদেড়ে এডওয়ার্ড চিং তার বিগুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই গুণধনের ঠিকানা কেউ আদায় করতে পারেন।

কালোদেড়ে বলত, ‘আমি আর শয়তান ছাড়া আমার গুণধনের ঠিকানা আর কারুর জানা নেই।’

তার বসন্তুষ্ণগণ এখন জাহির করে প্রচুর জাঁকজমক। তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে শোভা পায় হিরা-পামা বসানো আংটি। তার গলায় দোলে অনেকগুলো সোনার হারের লহর। তার বুকের বক্ষনীতে ঘোলে এখন নতুন যে তিনজোড়া পিস্তল, তাদের নলচেওলো ঝুপো দিয়ে গড়া এবং তাদের কুঁদোগুলো মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে অলংকৃত।

কালোদেড়ের এক প্রধান সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিল ইন্দ্রায়েল হ্যান্ডস। একদিন তাকে দেকে সে চুপচুপি বললে, ‘আমাদের দল কি অতিরিক্ত ভারী হয়ে পড়েনি?’

—‘নিশ্চয়! এত লোককে লাভের অংশ দিতে দিতে আমাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।’

—‘ঠিক ধরেছ হ্যান্ডস! তাহলে কৌশলে অংশীদারের দল হালকা করে ফেলা যাক।’

বিভিন্ন ওজর দেখিয়ে দুইবারে দুইদল লোককে বিভিন্ন বিজন দ্বিপে নমিয়ে দিয়ে বাছা বাছা লোক নিয়ে কালোদেড়ে দূর সমুদ্রে নিরবশেষ হয়ে গেল—একবারও ভেবে দেখলে না যে, এতদিন বিশ্বস্ত ভাবে যারা তার হস্তুম মেনে এসেছে, জনহীন অজ্ঞানা দ্বিপে পরিতাঙ্গ হয়ে তাদের দুরবস্থা উঠেবে কতখানি চৰমে! পরে সে কেবল এইটুকু উপলক্ষি করতে পেরেছিল যে হালকা দল নিয়ে কাজ করলে পকেট বেশি ভারী হয় বটে, কিন্তু আঘাতক্ষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হয় গুরুতর সমস্যা।

বৎসরকালব্যাপী লুটত্বার্জ ও নরবেদ্যব্যজ্ঞের পর আটলাটিক মহাসাগর ও তার তীরবর্তী দেশগুলো যখন হয়ে উঠেছে প্রায় অরাজক ও হত্যা-হাহাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং সবাই যখন দৃঢ়ে-শোকে-ক্রোধে একান্ত মরিয়া হয়ে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে একবাক্সে করেছে বিশ্রাহ ঘোষণা, তখন সে একদিন অপ্রানবদনে বললে, ‘হ্যান্ডস, চলো নর্থ ক্যারোলিনা দিকে। দিন-রাত খালি জল আর জল দেখতে আমার আর ভালো লাগছে না।’

—‘জল দেখা ছাড়া আর উপায় কী? স্থলে নামলেই তো আমাদের ধুরা পড়ে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দুলতে হবে।’

—‘কুছ পরোয়া নেই। আমরা ফাঁসির দোলনায় দুলব না,—বাজারে কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব।’

হ্যান্ডস সবিশ্বাস্যে বলে উঠল, ‘বলেন কী, কর্তা? মার্জনা ভিক্ষা? কে আমাদের মার্জনা করবে?’

—‘গভর্নর চার্লস ইডেন আমাদের হাসিমুখে মার্জনা করবেন।’

—‘বলেন কী, হাসিমুখে?’

—‘হ্যাঁ। গভর্নর ইডেন বড়ো ভালো লোক হে। যুক্তি মানেন। আমার যুক্তি কী জানো ভায়া? উৎকোচ! ঘুঁঘুঁখোরকে বশ করা মোটেই কঠিন নয়।’

নর্থ ক্যারোলিনা হচ্ছে আমেরিকার আটলাটিক সাগরভূরের একটি প্রদেশ। সেই প্রদেশের বাখ নগরে বাস করেন ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি চার্লস ইডেন। কালোদেড়ের জাহাজ গিয়ে নোঙ্গর ফেললে সেইখানেই।

মানুষ চিনতে ভুল করেনি কালোদেড়ে। গভর্নর ইডেন তার যুক্তি অকাট্য বলেই মেনে নিলেন। উচিতমতে উৎকোচ হজম করে তিনি কালোদেড়ের সমস্ত অপরাধ কেবল রাজার নামে ক্ষমাই

করলেন না, উপরস্তু তার সঙ্গে জমে উঠল তাঁর দস্তরমতো দোষ্টি—যাকে বলে দহরম-মহরম আর কী! সবাই অবাক! হতভস্ম!

বাথ শহরের একটি মেয়েকে দেখে কালোদেড়ের ভারী পছন্দ হল। তৎক্ষণাং সে করলে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যাও নারাজ নয়। তখন সদাশয় গভর্নর বললেন, ‘আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই শুভকার্য সম্পন্ন করব’।

এটি কালোদেড়ের অয়োদশ কি চতুর্দশ বিবাহ তা ঠিক করে বলা যায় না। বিবাহে নিতবরের আসন প্রহণ করলে গভর্নরের সেক্রেটারি টোরিয়াস নাইট! খুব ঘটা করে শুভকার্য সম্পন্ন হল বটে, তবে শহরের বনিয়াদি বংশের সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েও উৎসবে যোগদান করলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে তাঁদের উপরেও নিলে একহাত! খুব জমকালো সাজপোশাক পরে সে ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে বিখ্যাত সন্ত্রাস্ত বংশীয়দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় আর দারোয়ান ও খানসামাদের ডেকে বলে, ‘তোমাদের মনিবকে গিয়ে খবর দাও, স্বয়ং আমতী চিচ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন’।

দারোয়ান ও খানসামাদের ইতস্তত করতে দেখলেই কালোদেড়ে তার রত্নখচিত ও ঝুঁপোয় বাঁধানো পিস্তলগুলো গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ছুটতে শুরু করে দেয়, দিকে দিকে বৌঁ-বৌঁ করে ছুটতে থাকে গরমা-গরম বুলেট এবং দারোয়ান ও খানসামাদ হয় ভয়ে থরহরি কম্পমান! তারপরেই দরজা খুলতে ও গৃহস্থামীর আতিথ্যলাভ করতে বিলম্ব হয় না। কালোদেড়ে বারবার ইভাবে প্রমাণিত করলে সেই পুরাতন সত্যকথাটাই—জোর যার, মূলুক তার!

এখানে এসেও কিন্তু কালোদেড়ে নদী-পথে বোম্বেটেগিরি ছাড়ল না—বহু জাহাজ থেকে মালপত্তর ও ধনরত্ন লুঁচিত হতে লাগল এবং বলা বাহল্য যে, গোপনে তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন না স্বয়ং গভর্নরও!

জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে গভর্নর ইডেন মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কাজে কিছুই করেন না। জাহাজের মালিকরা শৈষটা এখানে হতাশ হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ভার্জিনিয়ার গভর্নর স্পটস্টুডের কাছে গিয়ে নিজেদের জরুরি নালিশ জানালেন।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গভর্নর স্পটস্টুড তৎক্ষণাং ঘোষণা করে দিলেন যে কালোদেড়েকে গ্রেপ্তার বা বধ করতে পারবে, তাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাডের নৌবহরের দক্ষ যোদ্ধা লেফটেন্যান্ট রবার্ট মেনার্ডের উপরে হস্তক্ষেপ জারি হল, তিনি যেন অবিলম্বে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

গভর্নর ইডেনের সেক্রেটারি টোরিয়াসও কালোদেড়েকে কাছ থেকে অল্পবিস্তর ঘুষ খেয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ নৌসেনাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা শুনেই সে প্রমাদ গুমে বোম্বেটের কাছে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলে।

৮ শ্যাতানি ফুর্তি

কিন্তু খবর পেয়েও কালোদেড়ে কিছুমাত্র দমল না বা ভীত হল না। নিজের দলের সবাইকে ডেকে অবহেলা ভরে বললে, ‘ওহে, শুনেছ? টোরিয়াস চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, রাজাৰ সৈন্যৱা নাকি

আমাদের শাস্তি দিতে আসছে! জাহানমে যাক রাজা! যারা আসতে চায় আসুক তারা! আমি তো জাঁকিয়ে বসে আছি নিজের আড়ায়—সিংহের গহুরে ঢুকে ফেরপাল কী করতে পারে?

তখন সন্ধ্যাকাল। হ্যান্ডস ও আরও দুইজন বোমেটেকে নিয়ে কালোদেডে নিজের কামরার ভিতরে প্রবেশ করে খুব খুশিমুখে বললে, ‘আবার লড়াই হবে—কী মজা বে, কী মজা! ঢালো মদ, প্রাণ ভরে পান করো—আজ আমাদের আনন্দের দিন! দেখা যাক, কে কত বেশি মদ খেতে পারে?’

একটা টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসে চারজনে মিলে মদপান শুরু করে দিলৈ। বাতির আলোতে থালি কালোদেডের গলার হার ও আঙুলের আংটিশুলো নয়, মুখের দাঢ়ি-গৌফের ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে তার খুদে খুদে চোখাটো জুলজুল করে জুলছিল—এবং জাহির করছিল যেন কোনও নির্দয় কৌতুকের রহস্যময় ইশারা!

শয়তানের কাছে গিয়ে শয়তানি ছাড়া আর কী আশা করা যায়? বোধ করি সেই কারণেই প্রচুর মদপান করেও জনেক চালাক বোমেটে নেশায় বিমিয়ে পড়েনি—নিজের দৃষ্টিকে রেখেছিল অত্যন্ত জাগ্রত!

হ্যাঁ সে দেখলে, কালোদেডের দুটো পিস্তলসূন্দ দুখানা হাত ধীরে ধীরে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওজর দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উদ্ভাস্তের মতো।

অকস্মাত বিকট চিকিৎসা করে কালোদেডে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলৈ বাতিটা এবং অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুড়লে তার পিস্তলদুটো! তারপরেই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও ভয়াবহ আর্তনাদ এবং একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

তাড়াতাড়ি আলো জ্বলে দেখা গেল, হ্যান্ডস দুই হাতে হাঁটু চেপে মন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং তার আহত হাঁটু থেকে হ হ করে বেরক্ষে রক্তের ধারা!

একজন বোমেটে জিজাসা করল, ‘এর অর্থ কী?’

হা হা করে হাসতে হাসতে কালোদেডে বললে, ‘এর অর্থ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-একজনকে শাস্তি না দিলে সবাই ভুলে যাবে যে, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?’ তারপর সে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, ‘চলে এসো হ্যান্ডস, চলে এসো—তোমার বিশেষ কিছু হয়নি বাপু! হাঁটুর উপরে একটা ছোটো ছাঁদা বই তো নয়, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই দু-দিনে সেরে যাবে—কী বলো হ্যান্ডস?’

কিন্তু হ্যান্ডস কিছুই বললে না, পরদিন সকালেই তাকে দোনায় তন্মেশের পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৯

কালোদেডের প্রভাতি ভোজ

ওদিকে তরফণ নৌসেনাপতি লেফটেনেন্ট মেনার্ড প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুদ্ধের জন্যে।

বোমেটেদের জাহাজ তখন বাহির-সমুদ্রে ছিল না, একটা খাঁড়ির (স্থলভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্রের অপ্রশস্ত অংশ) ভিতরে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মেনার্ড বুঝালেন, তাঁর অধীনে ‘নাইম’ ও ‘পাল’ নামে যে দুখানা প্রকাণ্ড রণতরী আছে, গভীর সাগরের আনাগোনার উপযোগী করে তারা গঠিত। একে তো খাঁড়ির জলপথ সংকীর্ণ, উপরস্তু চড়া পড়েছে তার যেখানে-সেখানে—বড়ো জাহাজ ঢুকলেই চড়ায় আটকে অচল ও অকেজো হয়ে পড়বে।

কালোদেডের চালাকি বুঝে নিয়ে রণকুশল মেনার্ড তার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজি হলেন না। তিনি

‘মুপ’ বা এক-মাস্তুলের দুখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো ও হালকা জাহাজ নির্বাচন করলেন—তারা অগভীর জলেও চলা-ফেরা করতে পারবে অনায়াসেই। তার উপরে তাদের আরও হালকা করবার জন্যে তারী ভারী কামানগুলোও সরিয়ে ফেলা হল। পরিবর্তে আমদানি করা হল গাদি গাদি বন্দুক—বড়ো কামানের অভাব পূরণ করবে তাদের সংখ্যাধিকাই।

খবর নিয়ে জানা গেল, বোম্বেটেদের দলে পঁচিশজনের বেশি লোক নেই, কারণ কালোদেড় অতিরিক্ত লাভের লোভে দল অতিশয় হালকা করে ফেলেছে। মেনার্ড সঙ্গে নিলেন প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য। পঞ্চাশজন বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ালে পঁচিশজনকে পড়তে হবে যার-পর-নাই বেকায়দায়—এই ছিল তাঁর ঝুবধারণা।

অপরাহ্ন কাল।

১২৫

ঝাড়ির বাঁকের মুখে আচম্ভিতে দেখা গেল, দুখানা জাহাজের মাস্তুলের চূড়া।

বোম্বেটে-জাহাজের প্রহরী চঁচিয়ে উঠে বললে, ‘হঁশিয়ার! দুখানা জাহাজ আসছে!’

লাফ মেরে পাটাতনের উপরে উঠে কালোদেড়ে এক নজরে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে বললে, ‘হঁ, রাজার অভিযান! কিন্তু আমার এখানে আসার মজাটা ওদের ভালো করেই টের পাইয়ে দেব! বাছারা ঘূঢ় দেবেছে, ফাঁদ তো দেখেনি!’ সে তখনও জানত না তার ফাঁদ আছে মেনার্ডের নথদর্পণে!

রাজার জাহাজ কাছে এসে পড়ল।

কালোদেড়ে হাঁকলে, ‘কে তোমরা?’

মেনার্ড উত্তরে ধীর স্বরে বললেন, ‘টের পাবে অবিলম্বেই।’

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালনা করে বুবলেন যে, বোম্বেটেদের জাহাজখানা আকারে তাঁদের চেয়ে বিশেষ বড়ো না হলেও ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গাদাগাদি করা আছে কামানের পর কামান। ওখানাও এমন হালকা ভাবে তৈরি যে এই বিপদসংকুল অগভীর জলেও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে।

ভু কুঁফিত করলেন মেনার্ড। ওদের পোতপার্শের কামানগুলোর দারুণ অগ্রিমত্বে মৃদু পড়লে চলবে না, তাঁকে একেবারে বোম্বেটে-জাহাজের পাশাপাশি গিয়ে পড়ে মৃশলধারে গুলিবৃষ্টি করে প্রথমেই শক্তদের রীতিমতে অভিভূত করে ফেলতে হবে। সৈন্য ও বন্দুকের সংখ্যাধিকের উপরেই তাঁর প্রধান ভরসা।

কিন্তু জলে এখন ভাটার টান, সময়টা এখানকার মুদ্দের পক্ষে উপযোগী নয়। জোয়ারের জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই স্থিতি করে ফেরেন্ট আজকের মতো নোঙর ফেলবার হৃকুম দিলেন।

সেদিন রাতে বাবে বাবে মাতাল কালোদেড়ে পাটাতনের উপরে ছুটে এসেছিল এবং ভয়ানক গলাবাজি করে জানিয়েছিল—‘ওরে রাজার চাকরগুলো, কাল প্রভাতি খানার সময় তোদের সকলকেই হতে হবে আমার শখের জলখাবার।’

মেনার্ড একবার খেপে গিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, ‘ওরে শুয়োর, শোন! তোর ওই নোংরা উকুনভরা কালো দাঢ়িতে পেরেক মেরে তোকে আমার জাহাজের গায়ে লটকে দেব—এই আমার দৃঃ প্রতিজ্ঞা।’

রাজার জাহাজে নোঙর ফেলা হচ্ছে দেখে কালোদেড়ে আন্দজে বুঝে নিলে যে, আপাতত বোম্বেটের নিরাপদ, কারণ সুচত্বৰ শক্তরা ভাটার সময়ে অগভীর জলে জাহাজ চালিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সকালে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শক্রপক্ষের আক্রমণ শুরু হবে।

সে একজন বোম্বেটিকে কাছে ডেকে এনে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জুলে তার চোখের কাছে নাড়তে নাড়তে ফিস-ফিস করে বললে, ‘ওরে মুখ্য, ভালো করে শুনে রাখ! যদি দেখিস আমরা হেবে যাচ্ছি আর রাজার সেপাইরা আমাদের জাহাজের উপরে উঠে পড়েছে, তখনই দেশলাইয়ের কাঠি জুলে আমাদের বাহুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিবি! তারপর কী মজা হবে জানিস তো? দড়াম করে এক দুনিয়া-কাঁপানো ধূমুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই মিলে সরাসরি গিয়ে নরক গুলজার করে তুলব! কী বে, পারবি তো?’

এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনে বোম্বেটে-বাবাজির আঘা শুকিয়ে যাবার উপক্রম! মুখরক্ষা করবার জন্যে তবু সে কোনওরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কালোদেড়ে বললে, ‘যা তবে! বাহুদখানায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক! কাল এসপার কি ওসপার!’

বোম্বেটে দুর্ক-দুর্ক বুকে কাঁপতে প্রস্থান করল।

চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্না ফুটল। মদে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে কালোদেড়ে নিজের কামরার দিকে ছুটল এবং যেতে যেতে আর-একবার গর্জিত কষ্টে জানিয়ে দিয়ে গেল যে—‘ওরে রাজার দাসানুদাসের দল! শুনে রাখ তোরা! রাত পোয়ালেই আমি তোদের হাড় খাব, মাস খাব আর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব—হা হা হা হা হা!’

১০

ধূন্দজাহাজের দুর্দশা

উষার সিংদুরমাখা আকাশ ঢেকে রাখতে পারলে না পাতলা কুয়াশার পর্দা। খাঁড়ির বুকে এসেছে জোর জোয়ার। জলে জেগেছে কলকল করে কলহাসা।

রাজার জাহাজ-জোড়া এগিয়ে আসছে ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মেনার্ড নিজের লোকজনদের ভরসা দিয়ে দৃঢ়কষ্টে বলছিলেন, ‘কোনও ভয় নেই—আগে চল, আগে চল ভাই! বোম্বেটেরা বড়ো জোরে একবার কি দুইবার কামান ছোড়বার ফুরসত পাবে, তার পরেই আমরা ছুটে গিয়ে হড়মুড় করে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখব তথমাপোচিশটা বন্দুক কেমন করে সামলায় পঞ্চশটা বন্দুকের ঠেলা! আগে চল!’

এতক্ষণ পরে কালোদেড়ের ঘন দোলায়মান হল সন্দেহদোলন কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, রাজার জাহাজ দুখান এগিয়ে আসছে,—ক্রমেই প্রিণ্ডিয়ে আসছে তার দিকে। ঘনায়মান বিপদ! একেবারে শেষ-মৃত্যুতেই সে আন্দজ করতে পারলে, শক্ররা দলে তার চেয়ে দুগুণ বেশি ভারী! সে স্থির করলে, জাহাজ নিয়ে খাঁড়ির ভিতরে আরও দুর্গম অংশে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সে চেঁচিয়ে ছক্ষু দিলে—‘নোঙ্গুর তোলো, নোঙ্গুর তোলো!’

কিন্তু সময় নেই—সময় নেই! শক্র যে শিয়রে! পালাবার পথ যে বন্ধ!

কালোদেড়ে কামান দেগে পথের বাধা দূর করতে চাইলে—হাঁ, এই হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র উপায়।

প্রচণ্ড চিংকারে শোনা গেল তার চরম আদেশ—‘কামান ছোড়ো, একসঙ্গে সব কামান ছোড়ো। আগুনের বাড়ে উড়িয়ে দাও সামনের সব প্রতিবন্ধক!’

কর্ণভদ্বী বজ্জনাদ ধ্বনিত করে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস কেটে তাঁর বেগে ছুটে গেল সেই সর্বনাশ।

অগ্নিপিণ্ডগুলো—কিন্তু হায় রে হায়, তারা রাজার জাহাজকে স্পর্শ করবার আগেই জলের ভিতরে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে তালিয়ে গেল!

মেনার্ড বিপুল পূর্বকে বলে উঠলেন, ‘গোলাগুলো গিয়েছে জলের জঠরে—আমরা অক্ষত! এইবারে গর্জন করুক আমাদের বন্দুকগুলো—তারা কেউ ব্যর্থ হবে না!’

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

রাগে পাগলের মতো হয়ে কালোদেড়ে দেখলে, তার দুজন গোলন্দাজ হাত-পা ছড়িয়ে মৃত্যু-ঘূর্মে এলিয়ে পড়ল এবং তার জাহাজখানাও ঢাক্য আটকে আচল হল! কঠে তার ফুটতে লাগল প্যাচার মতো কর্কশ চিংকার।

আবার গুড়ুম, গুড়ুম, গুম! ওরে বাবা, শুলির বাঁক বনবনিয়ে ছুটছে কানের পাশ দিয়ে। কালোদেড়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হমড়ি খেয়ে বসে পড়ল!

কিন্তু এ কী দৈব-বিড়বনা! হঠাৎ শ্রেতের টানে পড়ে রাজার জাহাজ দুখানার মুখ গেল ঘূরে এবং কালোদেড়েও ছাড়লে না এই দুর্ভ সুযোগ।

তৎক্ষণাত লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বজ্র-কঠে সে গর্জে উঠল—‘আবার কামান ছোড়ো, আবার কামান ছোড়ো!’

আবার জাগল কামানগুলোর তৈরব হংকার! এবারে তারা ব্যর্থ হল না এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়লে না বোমেটেদের বন্দুকও!

তারপর মনে হল সেখানে সৃষ্টি হয়েছে অভাবিত এক শব্দময় মহানরক! ফটাফট ফেটে গেল রাজার জাহাজ দুখানার নানা জায়গা, হড়মড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাস্তুল, মৃত্যুন্মুখ যোদ্ধাদের চিংকার ছুটে গেল দিকে দিকে! নৌসেনাদের উন্ত্রিশজনের মৃতদেহ পড়ে রইল পাটাতনের যেখানে-সেখানে।

বিকট উন্নাসে চেঁচিয়ে কালোদেড়ে বলে উঠল, ‘এবার ওদের পেয়েছি হাতের মুঠোর মধ্যে। আবার ছোড়ো কামান-বন্দুক! ডুবিয়ে দাও জাহাজ দুখানা! মড়াগুলোর সঙ্গে জীবন্তরা মেটাক মাছেদের ক্ষুধা!’

লেফটেনান্ট মেনার্ড দিকে ছুটোছুটি করে নিজের দলের হতভম্ব লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে দুইপক্ষের জাহাজ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ুন্ত।

মেনার্ড ভাবলেন একবার যদি সদলবলে ওদের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আর কোনও ভাবনাই থাকে না! কিন্তু তৎক্ষণাত তিনি বুঝে ফেললেন যোপারটা অত সহজ নয়!

দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে দেখে কালোদেড়ে নতুন হস্কুম জারি করলে—‘নিয়ে এসো হাত-বোমা! সবাই হাত-বোমা ছোড়ো!’

নতুন বিপদের স্তরাবনা দেখে মেনার্ড নিজের সৈন্যদের ডেকে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলায় গিয়ে গাঢ়াকা দাও!

দুই পক্ষের জাহাজে জাহাজে লেগে গেল বিষম ঠোকাঠুকি—শোনা যেতে লাগল মড়মড়িয়ে কঠভাঙ্গর শব্দ!

দুয়, দুয়, দুয়! বোমার পর বোমা ফটার বেজায় আওয়াজ, ধূমধঢাকা! রাজার জাহাজ দুখানার পাটাতন ভগ্ন-চূর্ণ, ধূমায়িত, অশুরুণাতে ভয়াবহ! চোখের সামনে যেন মারাত্মক আতশবাজির খেলা দেখতে দেখতে বিকট উন্নাসে কালোদেড়ে আটহাস্য করতে লাগল।

কালোদেডে কালগ্রামে

১৯৬৮

কালোদেডেৰ রোমশ, মদমন্ত ও অমানুষিক দেহ তৰবাৰি ঘোৱাতে ঘোৱাতে মেনাৰ্ডেৰ 'ৱেঞ্জাৰ' নামক জাহাজেৰ উপৰে লাফিয়ে পড়ল এবং তাৰ পিছনে পিছনে অনুসৰণ কৱলৈ অন্যান্য বোম্বেটোৱাও!

হংকারে শোনা গেল তাৰ হিস্ত কঠে—'সংহার! সংহার! হা রে বে বে! শুৰু হোক প্রলয়কাণ্ড!' আচম্ভিতে পাটাতনেৰ দৰজা ঠেলে কৃপাণ তুলে মেনাৰ্ড ও তাঁৰ সৈন্যদেৱ আবিৰ্ভাব! ব্যাপারটা এতটা অভিবিত যে বোম্বেটোৱা বিশ্বয়ে স্তুতি! কিন্তু পলকেৰ মধ্যে নিজেদেৱ হতভদ্ব ভাব সামলে নিয়ে তাৰা সবেগে আক্ৰমণ কৱলৈ—লেগে গেল হাতাহাতি লড়ই! খঁজো খঁজো হত্যা-ঝঁঝনা! আপ্লেয়ান্ট্ৰে ফ্ৰম-গ্ৰাম! যোদ্ধাদেৱ গৰ্বিত বাক্যাড়ম্বৰ!

তাৰপৰেই অনা জাহাজ থেকেও মেনাৰ্ডেৰ আৱও সৈন্য এসে যুক্তে যোগদান কৱে বোম্বেটোৱেৰ অবস্থা কৱে তুললে শোচনীয়। জাহাজেৰ নৌচৰে জলপোত, জাহাজেৰ উপৰে রক্ষণোত্তোত!

কালোদেডে তখনও ভয় পেলে না—তাৰ একহাতে তৰবাৰি, আৱ-একহাতে পিস্তল! মৃতদেৱ পায়ে মাড়িয়ে এবং জীবিতদেৱ ঠেলে সে যেন প্রলয়ৎকৰ মৃতি ধাৰণ কৱে একেবাৰে মেনাৰ্ডেৰ উপৰে ঝাপিয়ে পড়ে সিংহগৰ্জনে বলে উঠল, 'আৱে বে বৃণু জীব! নৱকে যাবাৰ সময় তোকেও আমি ছেড়ে যাব না!' বৃহৎ তাৰ রঞ্জনাত কৃপাণ, তাকে ঠিকাতে শিয়ে ভেঙে চুৰমাৰ হয়ে গেল মেনাৰ্ডেৰ তৰবাৰি!

আৱ রক্ষা নেই! উদ্ধতেৰ মতো অটুহাসি হেসে ও দীপ্তি নেত্ৰে অগ্ৰিবৰ্যণ কৱে কালোদেডেৰ ভীমবাহ আৱাৰ তুললে তাৰ সাংঘাতিক অস্ত্ৰ—কিন্তু পৱনমুহূৰ্তে একজন নৌসৈন্য ছুটে এসে বন্দুৰেৰ কুঁদো দিয়ে তাৰ মাথাৰ উপৰে কৱলৈ প্ৰচণ্ড আঘাত!

পাটাতনেৰ উপৰে ধড়াম কৱে আছড়ে পড়ল বোম্বেটো-সৰ্দাৰ! মুহূৰ্তেৰ মধ্যে চারিদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধৰলে নৌসৈন্যেৰ দল এবং তৰবাৰি, ছোৱা ও বন্দুকেৰ কুঁদো দিয়ে সবাই অশ্রান্ত ও নিষ্ঠুৰ ভাবে বিৱাট দেহেৰ উপৰে কৱতে লাগল প্ৰবল আঘাতেৰ পৰ আঘাত!

কিন্তু কী অসাধাৰণ তাৰ সহক্ষমতা ও প্ৰতিহিংসা-প্ৰবৃত্তি, সেইসব মাৰাঘাক আঘাতেৰ পৱেও সে কাৰু হতে চাইলে না, উলটে দুই হাঁটুতে ভৱ দিয়ে উঠে বসল এবং তাৰ শ্ৰেণি পিস্তল তুলে লক্ষ্য হিৱ কৱলৈ মেনাৰ্ডেৰ দিকে! ওই পৰ্যন্ত! তাৰ জীৱনীশক্তি তখন একেবাৰে ঝুঁথিয়ে এসেছে, পিস্তল ছোড়বাৰ আগেই সে আৱাৰ ধৰাস কৱে পড়ে গেল এবং তাৰ সৰ্বাঙ্গে জাগল অস্তিম শিৰন! সুনীৰ্ধ একটা নিষ্পাস ফেলে সে প্ৰাণত্যাগ কৱলৈ।

তাৰ কালো দাঢ়ি তখন রক্তৰাঙা, সৰ্বাঙ্গও রক্তভীষণা কৈন্তে দেখা গেল, তাৰ দেহেৰ পঁচিশ জায়গায় যৱেছে পঁচিশটা প্ৰাণাশক আঘাতেৰ চিহ্ন!

যুবক যোদ্ধা মেনাৰ্ড নিহত বোম্বেটো-সৰ্দাৰেৰ প্ৰকাণ মৃতিৰ দিকে তাকিয়ে বইলেন বিশ্ব-প্ৰশংসাপূৰ্ণ নেত্ৰে। তাকে অভিভূত কৱে ফেলেছে তাৰ বন্য সাহস!

কিন্তু অভিভূত হলেও মেনাৰ্ড নিজেৰ প্ৰতিষ্ঠা ভুললেন না। একজন সৈনিককে ডেকে বললেন, 'বোম্বেটো-সৰ্দাৰেৰ মুণ্ডো কেটে জাহাজেৰ গায়ে বুলিয়ে দাও'

বলা বাস্তু, সৰ্দাৰেৰ পতনেৰ পৰ হতাশ হয়ে আত্মসমৰ্পণ কৱেছিল বাকি বোম্বেটোৱাও।

এই ভয়কৰ বোম্বেট দলকে দমন কৱে লেফটেনান্ট মেনাৰ্ড ইতিহাসে অমৰ হয়ে আছেন।

ଚାତୀଚିହ୍ନ

ହେପତିର ହେତୁ



ଏହି କଥା ମୁଁରୁଷଙ୍କ ଦାଳେକାଳୀମାତ୍ର କିମ୍ବା

ଶୁଣୁଥିଲା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାହାରଙ୍କ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଏହିକିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଏହିକିମ୍ବା କିମ୍ବା

পূর্বাভাষ

ছত্রপতি কে? যিনি সন্তাট, বা রাজচক্রবর্তী, বা মহারাজাধিরাজ।

সন্তাট হর্ষবর্ধন যে নিজেকে ‘মহারাজাধিরাজ’ বলে মনে করতেন, তার প্রয়াণস্থরূপ তাঁর শাক্ত্র অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই, তবু নিধিরাম নিজেকে ‘সর্দার’ মনে করত বলে একটা ঠাট্টার কথা শুনি। ওই নিধিরামের মতো একালের কোনও কোনও খেতাবি ধনীও নিজেকে ‘মহারাজাধিরাজ’ বলে প্রচার করতে লজ্জিত হন না। অভিধানকেও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

ভারতের প্রথম ছত্রপতি কে?

প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যে কেউ যেন রামায়ণ বা মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য হলেও ইতিহাস নয়। তাদের মধ্যে ইতিহাসের মাল-মশলা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

সাল ও তারিখ না পেলে এবং সত্য ও প্রামাণিক তথ্যের দ্বারা বিশেষজ্ঞরা বিচার না করলে ইতিহাস রচিত হয় না। প্রাচীন হিন্দুরা সাল-তারিখ নিয়ে মাথা ঘামায়নি আদৌ। নিরঙ্কুশ কবির কল্পনাও তাদের কাছে ইতিহাস বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

শ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীকেই সাধারণত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়। ওই সময়ের অল্পব্লু যা জানা গেছে তার উপর নির্ভর করে বলা চলে যে, যোলোটি রাজা নিয়ে আর্যাবৰ্ত বা উত্তর ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে নয়, আর্যাবৰ্তে যিনি প্রধান হতে পারতেন, তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সংশ্রেষ্ঠ বা ছত্রপতি বলে শীকার করা হত। দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবৰ্তকে আলাদা করে রেখেছিল প্রধানত বিন্দু শৈলশ্রেণি।

কিন্তু তখনও ভারতে কেউ ছত্রপতি বা সন্তাট বলে পরিচিত হননি।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে বা বৌদ্ধ জাতকে আর্যাবৰ্তের একাধিক শক্তিশালী নরপতির সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের কেউ ‘ছত্রপতি’ বলে মানত না। প্রাদেশিক রাজার দল পরম্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, ছত্রপতি হবার শক্তি বা অবসর তাঁদের ছিল না।

সত্যিকথা বলতে কী, তখনও ভারতে যথার্থ ঐতিহাসিক যুগ সুস্মোৰ।

গ্রিক দিঘিজয়ী আলেকজান্ডার দি প্রেট-এর ভারত আক্রমণের ফলেই খুলে যায় এখানে ইতিহাসের বদ্ধ দ্বার। এ হচ্ছে শ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। পথঝনদের সেন্যারা রণক্ষেত্রে পরাজিত হল বটে, কিন্তু আর একদিক দিয়ে ভারতের হল পরম লাভ। সে নিজেকে খুঁজে পেলে ইতিহাসের আলোকে।

ভারতের প্রত্যন্ত দেশে আলেকজান্ডারের শিবিরে যখন যুদ্ধের উদ্যোগপূর্ব চলছে, সেই সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এক পাঁচশ বৎসর বয়স্ক তরুণ ভারতীয় যুবক—তিনি গ্রিক নরপতির সঙ্গে দেখা করতে চান।

যথাসময়ে দেখা হল। আলেকজান্ডার শুধোলেন, ‘কে তুমি?’

উত্তর হল, ‘আমি মৌর্যবংশীয় এক রাজপুত, নাম চন্দ্রগুপ্ত।’

—‘আমার কাছে কী দরকার?’

—‘আপনাকে সাহায্য করতে চাই।’

—‘কীরকম সাহায্য?’

ছত্ৰপতিৰ ছত্ৰভঙ্গ

—‘ভাৱতেৰ প্ৰধান নৱপতি হচ্ছেন মগধেৰ অধীশ্বৰ মহাপন্থ নন্দ। তাঁকে জয় কৰতে না পাৱলে ভাৱত জয় কৰা অসম্ভব। তিনি ভীষণ অত্যাচাৰী, তাৰই জন্যে আমি আজ নিৰ্বাসন দণ্ড ভোগ কৰিছি। প্ৰজাৱাও তাঁকে ঘৃণা কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ মোৰ্মা কৰতে চায়। আমি, সেখনে আপনাকে নিয়ে যেতে, তাঁকে আক্ৰমণ কৰবাৰ সমস্ত অঙ্গসম্মি বলে দিতে এসেছি।’

বুদ্ধিমান আলেকজান্ডোৰ বুলনেন, এই সুচতুৰ যুৱক তাঁৰ সাহায্যে মগধ রাজ্য জয় কৰতে চায়। তিনি বললেন, ‘আপনাৰ সাহায্য আমাৰ দৱকাৰ হবে না। আমি নিজেই মগধ রাজ্য জয় কৰতে পাৱব।’

হতাশ হয়ে চন্দ্ৰগুণ্ঠ ফিরে এলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাৰ সন্ধানী দৃষ্টি প্ৰিক ফৌজেৰ অনেক বিশেষজ্ঞ আবিষ্কাৰ কৰতে ভুললে না।

৪৫

প্ৰচন্দ চৰকাৰ পৰিকল্পনা

ভাৱতেৰ প্ৰথম ছত্ৰপতি

কিন্তু প্ৰিক দিঘিয়াৰীকে মগধ রাজ্য জয় না কৰেই স্বদেশে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰতে হল।

কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজ্য দখল কৰবাৰ পৰি আলেকজান্ডোৰ রাজা পুৰুকে হারিয়ে পাঞ্জাৰ ও সিন্ধু অধিকাৰ কৰলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী হলেও পুৰুকে একজন প্ৰাদেশিক রাজা ছাড়া আৱ কিছুই বলা চলে না। সুবৃহৎ মগধ রাজ্য অধিকাৰ না কৰা পৰ্যন্ত ভাৱত-বিজেতা রাণে গৌৰৱ অৰ্জন কৰা সম্ভৱ নয় (মগধ বলতে তখন বোৰাত উত্তৰ ও দক্ষিণ বিহার, বেনারস, কোশল ও অঙ্গ রাজ্য নিয়ে গঠিত বিপুল এক দেশ)।

অতএব আলেকজান্ডোৰ মগধেৰ দিকে সৈন্য চালনা কৰতে উদ্যোগ হলেন।

কিন্তু সমস্ত প্ৰিক সৈন্য—এমনকি সেনাপতিৱাও একেবাৰে বেঁকে দাঁড়াল—কাৰণ তাৰা খবৰ পেয়েছিল যে, মহাপন্থ নদৰে অধীনে আছে আশি হাজাৰ অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজাৰ রথারোহী (তাৰ মানে শোলো হাজাৰ যোদ্ধা—কাৰণ প্ৰত্যেক রথেৰ উপরে থাকত দুইজন কৰে যোদ্ধা), এবং ছয় হাজাৰ গজারোহী (অৰ্থাৎ আঠাৱো হাজাৰ যোদ্ধা—কাৰণ প্ৰত্যেক হস্তীৰ উপৰে থাকত তিনি জন কৰে যোদ্ধা) সৈনিক।

আলেকজান্ডোৰ বহু চেষ্টাৰ পৰেও তাৰে ময়ে উদীপ্তিৰ সঞ্চাৰ কৰতে না পোৱে অবশ্যে হতাশ হয়ে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰতে বাধ্য হলেন। প্ৰিক ঐতিহ্যসকেৱেই যতে, সে প্ৰত্যাবৰ্তন পলায়নেৰই নামমাত্ৰ—তাৰ ভাৱত জয় কৰা আৱ হল না।

আলেকজান্ডোৰ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূৰ্ণ হল না বটে, কিন্তু সফল হল চন্দ্ৰগুণ্ঠেৰ স্বপ্ন।

তিনি উত্তৰ-পশ্চিম প্ৰান্ত থেকে বিপুল এক বাহিনী গঠন কৰে মহাপন্থ নদৰে পৱাজিত ও নিহত কৰে মগধেৰ সিংহাসন অধিকাৰ কৰলেন (৩২২ খ্রিস্টপূৰ্বাব্দে)। তাৰ অধীনে মগধেৰ সৈন্যবল আৱও বেড়ে উঠল—ত্ৰিশ লক্ষ অশ্বারোহী, ছয় লক্ষ পদাতিক, আৱোহী সুন্দ নয় হাজাৰ রঘুস্তী। এবং অসংখ্য রথ।

তাৰপৰ তিনি সমস্ত প্ৰিকদেৱ তাৰিয়ে পাঞ্জাৰ ও সিন্ধুদেশ পুনৰাধিকাৰ কৰলৈন। ভাৱত বিদেশদেৱ নাগপৰাশ থেকে সম্পূৰ্ণৱাপে মুক্ত।

তখন আলেকজান্ডার আর ইহলোকে বিদ্যমান নেই। তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলিউকস ফিরে-ফিরাতি পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করতে এসে বীর্যবস্ত চন্দ্রগুপ্তের কাছে খালি হেরেই গেলেন না, উপরন্ত বাধ্য হয়ে ভারতের বাইরেকার আরও কয়েকটি দেশ ছেড়ে দিয়ে নিজের কন্যাকেও তাঁর হাতে সম্পদন করলেন।

মাত্র আঠারো বৎসরের মধ্যে প্রায় অসম্ভবকেও সম্ভব করে চন্দ্রগুপ্ত যে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীন্ধর হলেন তাঁর একদিকে ছিল বঙ্গোপসাগর এবং অন্যদিকে বিহুত আরব সাগর। চন্দ্রগুপ্তই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বা ছত্রপতি।

আর্যাবর্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করে চন্দ্রগুপ্ত মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করে পুত্র বিনুসারের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সম্মাস গ্রহণ করে প্রায়োপবেশনে বা অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। কথিত আছে পরে তিনি জৈনধর্ম অবলম্বন করেছিলেন।

সেলিউকসকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে ভারতের সীমা যতদুর বাড়াতে পেরেছিলেন, ইংরেজরা নিজেদের চৃড়াস্ত গৌরবের যুগেও তা পারেনি। বিদেশ ঐতিহাসিকরা বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করা চলে।

যুবরাজ বিনুসার যখন সম্রাট হয়ে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিলেন দক্ষিণ দিক পর্যন্ত, তখন বোঝা যাচ্ছে তিনিও ছিলেন একজন বড়ো যোদ্ধা। তাঁর পুত্র মহামতি অশোক শাস্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে অতুলনীয় হয়ে আছেন। এরাও ছিলেন ছত্রপতি, কিন্তু পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী হয়ে সবদিক দিয়ে সম্মত সাম্রাজ্য হাতে না পেলে তাঁরা এতটা বড়ো হতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কাজেই চন্দ্রগুপ্তের পর আর কোনও মৌর্য রাজার কথা না বললেও চলবে।

ছত্রপতি অশোকের পরেই মৌর্য বংশের প্রাধান্য লুপ্ত হয়। আর একজন ছত্রপতির জন্যে বহু কাল অপেক্ষা করবার পর (১২০ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন কুশান রাজবংশীয় সম্রাট কশিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর কথা এখানে বলব না, কারণ তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করলেও বিজাতীয় শক ছিলেন।

কশিষ্ঠের অপঘাত-মৃত্যুর পর (১৬০ খ্রিঃ) আরও কিছুকাল পর্যন্ত শক সম্রাটোরা রাজত্ব করেন (২২০ খ্রিঃ)। তারপরেই তাঁদের প্রভুত্ব লুপ্ত হয় এবং নেমে আসে ঘনীভূত অঙ্ককারের যবনিকা—তা তেদে করে কিছুই দেখা যায় না। তারপর চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমেই দেখা যায় মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁকে প্রাদেশিক রাজা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

১২৪
তাঁর
শুরু

শুরুঃ
সুর্যোদয়

সুর্যোদয়ের ছত্রপতি

নিষ্ঠিত অঙ্ককারের পর সমুজ্জ্বল সুর্যোদয়! প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর রাজদণ্ড ধারণ করলেন তাঁরই পুত্র সমুদ্রগুপ্ত—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাঁর নাম দিয়েছেন ‘ভারতীয় নেপোলিয়ন’।

সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর পতাকার সামনে মন্তক নত করতে বাধ্য হয়। আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতে রাজত্ব করতেন তখন প্রধান নয়জন মহারাজা। সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের প্রত্যেককেই পরাজিত করেন এবং তাঁর ফলে তাঁর রাজ্য পরিণত হয় সাম্রাজ্য—সম্রাট অশোকের পর এত বড়ো সাম্রাজ্যের অধিকারী হননি আর কোনও ভারতীয় নরপতি—তাঁর পশ্চিম দিকে ছিল আরব সাগর এবং পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর।

কিন্তু সমুদ্রগুণ্ঠ তবু তৱবাৰি কোষবন্ধ কৱলেন না, সৈন্যে যাত্রা কৱলেন দাক্ষিণাত্যেৰ দিকে। তাৰপৰ দেশেৰ পৱ দেশ জয় কৱে দাক্ষিণাত্য উজাড় কৱে কঞ্চনাতীত ধনৱত্ত নিয়ে আবাৰ দেশে ফিৰে এলেন এবং দিশ্বিজয়ী রাপে শৌরাণিক অশ্বমেধ যজ্ঞেৰ পুনৱানুষ্ঠান কৱলেন। সমগ্ৰ ভাৱতবৰ্যেৰ উপৱে নিজেৰ জয়পতাকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৱবাৰ জন্মে তাঁকে দুই বৎসৱেৰ মধ্যে দুই থকে তিন হাজাৰ মাইল অতি দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৱতে হয়। সম্ভৱত সমগ্ৰ ভাৱতে যুদ্ধজয়ী হয়ে সমুদ্রগুণ্ঠ স্থদেশে ফিৰে আসেন তিন শত পঞ্চাশ ব্ৰিস্টান্ডে এবং আৰ্যাবৰ্তেৰ শৌরাণিক সন্দাচৰে মতো ছত্ৰপতি রাপে অশ্বমেধ যজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান কৱেন।

সমুদ্রগুণ্ঠেৰ সভাকৰি বলেছেন, তিনি গানে এবং বাজনায় এবং কবিতা রচনায় সুনিপুণ ছিলেন। উপৱেস্তু তাঁৰ ছন্দসমৰ্পণীয় রচনাও আছে অনেকগুলি। তাঁৰ একটি দুর্লভ স্বৰ্ণমুদ্রা পাওয়া যায় তাতে দেখি, সমুদ্রগুণ্ঠেৰ পৱনে হাত-কাটা ও হাঁটুৱ উপৱে পৰ্যন্ত বিস্তৃত পোশাক। অনেকটা একেলো চেয়াৱেৰ মতন আসেন উপবিষ্ট হয়ে তিনি বীণাবাদনে নিযুক্ত। বিদ্বজ্জনদেৱ সঙ্গে শাস্ত্ৰ, সংগীত ও কবিতা নিয়ে আলোচনা কৱে তিনি প্ৰত্যুত্ত আনন্দ লাভ কৱতেন। বেশ বোৰা যায়, যুদ্ধেৰ সঙ্গে কাৰ্য ও ললিতকলার ক্ষেত্ৰেও তিনি ছিলেন এক প্ৰতিভাধৰ পুৰুষ। এমন সৰ্বোচ্চম প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী দিশ্বিজয়ী পৃথিবীৰ আৱ কোনও দেশে দেখা যায়নি।

সমুদ্রগুণ্ঠেৰ পৱলোক গমনেৰ পৱ তাঁৰ পুত্ৰ গুপ্তবংশীয় দিতীয় চন্দ্ৰগুণ্ঠ নামে সিংহাসনে বসে বিজ্ঞমাদিত্য উপাধি ধাৱণ কৱেন এবং তিনিই হচ্ছেন চলতি ভাৱতীয় কথা ও কাহিনিতে প্ৰসিদ্ধ রাজা বিজ্ঞমাদিত্য। তিনিই ছিলেন যোদ্ধা, ভাৱত থকে শক প্ৰভৃতি একেবাৱে বিলুপ্ত কৱে দেন। কিন্তু ছত্ৰপতিৰ সম্মান লাভ কৱবাৰ যোগ্য হলেও তাঁৰ বা গুপ্তবংশীয় আৱ কোনও সন্দাচৰে কৌৰ্তি নিয়ে এখনে আলোচনা কৱব না, কাৱণ বিদ্যুসাৱ ও অশোকেৰ মতো তাঁৰাও সমুদ্রগুণ্ঠেৰ দ্বাৱা সুদৃঢ় ভিত্তিৰ উপৱে প্ৰতিষ্ঠিত বিশাল সাধাজোৱে অধিকাৰী হয়েছিলেন।

প্ৰায় পঞ্চম শতাব্দী পৰ্যন্ত আৰ্যাবৰ্তে গুপ্তবংশেৰ প্ৰভৃতি বজায় থাকে। ওই সময়েই রাজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৱে ভাৱত কাব্যে, চিত্ৰে, ভাষ্যমে ও স্থাপত্যে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানেৰ অন্য নানা ক্ষেত্ৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছিল। তাৰপৱেই এখনে উপদ্বব আৱস্থ কৱে বিভীষণ ও নৃশংস হৰ্ণ অত্যাচাৰীৰ দল। ভাৱত তখন আৱাৰ ছোটো-বড়ো নানা রাজে বিভক্ত হয়ে আসিয়া এবং সেখানে আৱ কেহই ছত্ৰপতি উপাধি অৰ্জন কৱবাৰ অধিকাৰী হননি। তাৰপৱে সপ্তম শতাব্দীৰ প্ৰথম মুখেই দেখতে পাই আৱ একজন এমন বীৱপুৰুষকে, যিনি আৰ্যাবৰ্তেৰ উপৱে জাপিন বিজয়পতাকাৰ উত্তোলন কৱে আৱাৰ ছত্ৰপতি আখ্যালাভেৰ যোগ্য হতে পেৱেছিলেন।

১৩৫

১৩৬

হিন্দুযুগেৰ শেষ ছত্ৰপতি

তাঁৰ নাম হৰ্ষবৰ্ধন—তাঁৰ নিজেৰ স্বাক্ষৰ আজও বিদ্যমান আছে। তা দেখলে জানা যায়, নিজেকে তিনি 'মহারাজাধিৰাজ শ্রীহৰ্ষ' বলে পৱিত্ৰিত কৱতেন। হৰ্ষবৰ্ধনেৰ আগে তাঁৰ বড়োভাই থানেশ্বৱেৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৱেন। তাৰপৱেই তিনি খবৰ পান যে তাঁৰ ভগীপতি রাজা গ্ৰহবৰ্মণ মৌখিকিৰ মালবৱাজেৰ হস্তে নিহত হয়েছেন এবং তাঁৰ সহোদৱা রাজা শ্ৰীকেৰো তিনি বলিনী কৱেছেন। রাজাৰ্বৰ্ধন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা কৱে মালবৱাজকে পৱাজিত ও নিহত কৱলেন বটে, কিন্তু তাৰপৱেই তিনি নিজেও

মধ্যবঙ্গের অধিপতি শশাক্তের হস্তে মারা পড়লেন এবং সেই অবসরে রাজ্যালী কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরন্দিষ্ট হলেন।

রাজ্যবর্ধনের ছেটোভাই হর্ষবর্ধন তখন নানাদিকে খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে ভগী রাজ্যালীকে উদ্ধার করে দেশে ফিরে আসেন এবং অবশেষে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ছয় শত ছয় খিস্টাদে। বুদ্ধিমতী ভাণী রাজ্যালীর সঙ্গে পরামর্শ করে হর্ষবর্ধন রাজ্যচালনা করতে থাকেন।

কিন্তু থানেশ্বরের সংকীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে হর্ষবর্ধনের চিন্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না, তাঁর মানসচক্ষে তখন জাগতে লাগল একই হেত্রে ছায়ায় সারা আর্যাবর্তকে এনে ছত্রপতি হবার সম্মজ্জল স্বপ্ন। এই সময়ে তাঁর ফৌজে ছিল পাঁচ হাজার গজারোহী, বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য। চিরাচরিত রীতি না মেনে ফৌজ থেকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে তিনি রথারোহী সেনাদের বাদ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতে এবং দেশের পর দেশ হস্তগত করে অবশেষে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরাপথের উপরে উড়িয়ে দিলেন নিজের বিজয় পতাকা। তাঁর সৈন্যসংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে উঠল। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলেন—ভারতবর্ষে আর কোনও বিক্রমশালী রাজার অস্তিত্ব তাঁর পক্ষে অসহনীয়। দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রথম নরপতি ছিলেন চালুক্যবংশের দ্বিতীয় পুলকেসিন। তিনি আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আট-ঘাট বিশেষে বসেছিলেন, সে বাধা এড়িয়ে দক্ষিণ দিকে আর এগুতে না পেরে হর্ষবর্ধন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন (৬২০ খ্রি)।

তারপর তাঁর শেষ যুদ্ধ হচ্ছে গাঙ্গামের বিরুদ্ধে। সাঁইত্রিশ বৎসর ধরে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে অবশেষে হর্ষবর্ধন তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। তারপর সপ্তাট অশোকের অনুকরণে শাস্তির মন্ত্র পাঠ করতে করতে তাঁর বাকি জীবনের কয়েকটা বৎসর কেটে গেল।

সমুদ্রগুপ্তের মতো হর্ষবর্ধনও ছিলেন যোদ্ধা হয়েও উচ্চশ্রেণির কবি। সমুদ্রগুপ্তের কোনও রচনা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হর্ষবর্ধনের ‘নাগানন্দ’, ‘রঞ্জনবী’ ও ‘প্রিয়দর্শিকা’ নামে তিনখানি নাটকীয় রচনা আজও সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। কবি বাণ ছিলেন তাঁর সভাকবি।

কিন্তু শাস্তির মন্ত্র পাঠ করেও হত্যাকারীর কবল থেকে হর্ষবর্ধন আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তিনি নিহত হন ৬৪৬ কি ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

হর্ষবর্ধনের প্রায় দেড় শতাব্দীর পর বঙ্গবীর ধর্মপাল বিপুল সাম্রাজ্য গঠন করে ছত্রপতি রাপে সুদীর্ঘ চৌষট্টি বৎসর কাল রাজদণ্ড ধারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন বৌদ্ধ এবং সেইজন্যেই তাঁর কাহিনি এখানে বলা হল না। ত্রুটি প্রসঙ্গসূত্রে বলতে পারি, বাংলার এই বীর সন্তানের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে দিল্লি ও পাঞ্জাবের জলঞ্চর এবং দক্ষিণে বিদ্যু গিরিশ্রেণির উপত্যকা পর্যন্ত। ধর্মপাল ও তাঁর বংশধররা সাড়ে চার শতাব্দী ধরে রাজ্যচালনা করে বঙ্গদেশকে ভারতের অন্যতম প্রধান দেশ বলে পরিচিত ব রেছিলেন, এ তথ্য উল্লেখযোগ্য।

পালবংশের পর আর কোনও স্বদেশি ও হিন্দু রাজবংশ আর্যাবর্তের উপরে একচু অধিকার হ্বাপন করতে পারেনি।

নামে আর্যাবর্ত, কিন্তু সেখানে আর্যদের প্রভুত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল—কেবল বিতাড়িত শক ও হনের দল রাজস্থানে আশ্রয় নিয়ে, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজপুত বলে প্রচার করে বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

আর্যাবর্তের উপরে ঝাপিয়ে পড়ল মধুলোভী বোলতার মতো ঝাকে ঝাকে আরব, তুর্কি, পারসি,

আফগান ও মোগল প্ৰভৃতি। মোগলেৱা ও আফগানদেৱ অনেকেই হিন্দুদেৱ বুকে বসে ভাৱতকেই স্বদেশ বলে প্ৰহণ কৰলে, কিন্তু তাৱপৰ ইউরোপ থেকে যাবা আসতে আৱস্থা কৰলে তাৰে বিদেশি লুঠনকাৰী দস্যু তিনি আৱ কিছুই বলা যায় না।

প্ৰথমে এল পৰ্টুগিজৰা, তাৱপৰ ওলন্ডাজৰা, তাৱপৰ ফৱাসিরা। কিন্তু সৰ্বশেষে ইংৰেজৰা ছলে-বলে-কৌশলে সৰ্বগ্ৰাস কৰে গোটা ভাৱতবৰ্ষকে বিৱাট এক গোলামখানায় পৰিণত কৰলৈ।

কিন্তু সেটা কি সত্ত্ববপৰ হত? এ প্ৰশ্নৰ একমাত্ৰ উত্তৰ হচ্ছে, না। কেন, এইবাবে তাই বলছি।

ওৱেংজীবৈৰ রাজত্বকালে যখন মোগলদেৱ গৌৱবসূৰ্য নিষেজ হৰাব কোনও লক্ষণই প্ৰকাশ পায়নি, যখন দুৰ্ঘ্য আফগান ও রাজপুতৰেড়েও অনেকেই মোগলেৱ দাসত্ব স্থীকাৰ কৰতে বাধ্য হয়েছে, সেই সময়েই সপ্তদশ শতাব্দীৰ উত্তৱার্ধে দাক্ষিণাত্যেৰ আৱ-একজন হিন্দু দীৰ্ঘ ভাৱতেৱ অনেক অংশকে স্বাধিকাৰে এনে নিজেকে ছত্ৰপতি কৰণে প্ৰতিষ্ঠিত কৰেছিলেন। কিন্তু তাৰ পৱলোকগমনেৰ পৰ আৱ কেউ এই মহান অবদানেৱ গৌৱৰ রক্ষা কৰতে পাৱেনি। বিধৰ্মীৰ অধীন ভাৱতবৰ্ষে তখন আৰ্যাৰ্বত ও দাক্ষিণাত্যকে কেউ আৱ আলাদা কৰে দেখত না।

১০০-১০১

১০২-১০৩

১০৩-১০৪

দাক্ষিণাত্যে ছত্ৰপতিৰ আত্মপ্ৰকাশ

তাঁৰ নাম শিবাজী। তাঁৰ প্ৰতিজ্ঞা ও জীবন-ব্ৰত ছিল, স্বাধীন হিন্দু ভাৱতবৰ্ষেৰ পূৰ্বগৌৱৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা।

ওৱেংজীবৈ শিবাজীকে বশীভূত কৰবাৰ জন্যে নিজেৰ শ্ৰেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদেৱ প্ৰেৱণ কৰেছিলেন— কিন্তু কেহই তাঁকে বাগে আনতে পাৱেননি। এমনকি ভাৱতবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ দিলিৰ খাঁকে পৰ্যন্ত তাঁৰ হাতে নাস্তানাবুদ্ধ হতে হয়েছিল। শিবাজীকে বন্দি কৰে স্বয়ং ওৱেংজীবৈ তাঁকে ধৰে রাখতে পাৱেননি।

শিবাজীকে একসঙ্গে শত্রুশালী মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুৰ, পৰ্টুগিজ ও ইংৰেজ প্ৰভৃতিৰ সঙ্গে একা লড়তে হয়েছিল, তবু তিনি শেষ পৰ্যন্ত দুই শত চলিশটি দুৰ্গ দখল কৰে এবং বিৱাট ভূখণ্ড জুড়ে প্ৰকাশ এক রাজ্য গঠন কৰতে ও সাত কোটি টাকা বাৰ্ষিক আয়েৰ অধিকাণ্ঠাত হতে পোৱেছিলেন— তাৰ উপৰে ছিল তাঁৰ দ্বাৰা সঞ্চিত বিপুল অৰ্থ।

শিবাজীৰ রাজ্য বিস্তৃত ছিল উত্তৰ দিকে ধমৰপুৰ থেকে দক্ষিণে গোৱাই প্ৰদেশেৰ গঙ্গাৰ্বতী নদীতট পৰ্যন্ত। পূৰ্ব দিকে তাৰ সীমাৰ মধ্যে গণ্য হত ভাগলানা, মাসিক ও পুনা প্ৰদেশ, সমগ্ৰ সাতোৱা ও কোলহাপুৰ প্ৰদেশেৰ অধিকাৰণ। শেষেৰ দিকে তিনি পৰ্যন্ত কঞ্চিটকেৱ বেলগম থেকে মাদ্ৰাজেৰ তুঙ্গভদ্রা নদীতীৰবৰ্তী দেশ পৰ্যন্ত নিজেৰ অধীনে আনতে পোৱেছিলেন। মাত্ৰ বাহার বৎসৰ কয়েক মাস বয়সে তাঁৰ অকালমৃত্যু (কাৰুৰ কাৰুৰ মতে বিষ খাইয়ে তাঁকে হত্যা কৰা হয়) না হলে তিনি যে আৱও কত দেশ নিজেৰ দখলে আনতে পাৱতেন সেটা আজ কল্পনাও কৰা যায় না।

তাঁৰ ফৌজে ছিল পঁচাশি হাজাৰ অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য। এবং তাঁৰ কামানেৰ সংখ্যা ছিল দুই শত। অস্ট্ৰপ্ৰধান বা আটজন মহানীৰ (ঁঁদেৱ মধ্যে মুখ্যপ্ৰধানকে পেশোয়া বলে ডাকা হত) সাহায্যে তিনি শাসনকাৰ্য চালনা কৰতেন।

শিবাজী উপলক্ষি কৰলেন যথানিয়ম অনুসৰে অভিযৱেক না হলে এবং মুকুট না পৱলে কেউ তাঁকে মহারাজা বলে মানতে চাইবে না।

শিবাজীকে পেয়ে হিন্দুদের মনেও আশা জেগেছিল যে আবার হিন্দু গৌরবের পুনরুত্থান হবে এবং তারা লাভ করবে স্বরাজ ও নৃতন ছত্রপতি।

ছত্রপতি উপাধি ও রাজমুকুট ধারণ করে শিবাজী গুরু রামদাসস্থামী ও মাতা জিজাবাইয়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। পতি পরিত্যক্ত জিজাবাইয়ের সেদিন কী আনন্দ, মৃত্যুর মাত্র বারো দিন আগে তিনি দেখে যেতে পারলেন যে, তাঁর আদরের পুত্র কত শতাব্দীর পর অধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারতের প্রথম দিপ্তিয়াগী ও ছত্রপতি!

অভিষেক মহোৎসবে শিবাজী মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেছিলেন। সারা ভারতের নানা দেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে যেসব ব্রাহ্মণ পত্নী ও সন্তানসন্ততি নিয়ে রায়গড়ের উৎসবক্ষেত্রে এসে হাজির হন, তাঁদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। চার মাস ধরে তাঁরা নৃতন হিন্দু-ছত্রপতির আতিথ্য স্থাকার করেছিলেন। সবসুন্দর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ! অভিষেকের জন্যে খরচ হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—এ যুগের হিসাবে তখনকার পঞ্চাশ লক্ষের মূল্য কী অসামান্য হয়ে উঠে তা অনুমান করতে গেলে বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে যায়!

বহুশতাব্দীব্যাপী ঘৃণ্য অধীনতার অভিশাপ বহন করে সারা ভারতবর্ষ যখন প্রায় জীবন্মৃত হয়ে পড়েছিল, সেই সময়েই সর্বপ্রথমে ছত্রপতি শিবাজী আঘ্যাপ্রকাশ করেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদুতের মতো। সমগ্র ভারতের দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে আবালবৃন্দবনিতার মুখে মুখে জপমন্ত্রের মতো। আধুনিক যুগেও কেউ তাঁকে ভোলেনি।

সুদূর বঙ্গদেশও তাঁকে নিতান্ত আগন্তন বলে মনে করেছে, তাই ‘স্বদেশ’ আন্দোলনের সময়েও তাঁর কাছে প্রেরণা লাভ করে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করে উদান্ত কঠে গেয়ে উঠেছেন—

‘মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কঠে বলো

‘জয়তু শিবাজী!

মহোৎসবে সাজি।

মহোৎসবে সাজি।

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব

দক্ষিণে ও বামে

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব

এক পুণ্য নামে।’

১

১২

৭

পঞ্চাশ লক্ষ
স্বদেশের পুরুষ
জয়তু শিবাজী

১৫৮

১৫৯

১৬০

১৬১

১৬২

মারাঠির স্বপ্নভঙ্গ

শিবাজী যে সাম্রাজ্যের প্রাথমিক কাজ শেষ করে গিয়েছিলেন তাঁর বংশধরেরা যদি তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে কেৰিয়া থাকত মোগল ও ইংরেজের প্রতাপ—আজ হয়তো ভারতের নীলাকাশের তলায় বাতাসের তালে তালে সঙ্গীরবে উড়ত শিবাজী পরিকল্পিত গৈরিক পতাকা!

কিন্তু তা হয়নি। শিবাজীর দুই পুত্র—শত্রুজী ও রাজাৰাম—সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা পিতার প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল সম্পত্তিরই উন্নৱাধিকারী হয়েছিলেন! তাঁরা ছিলেন শিবাজীর অযোগ্য সন্তান।

গুপ্তবর্ষীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উন্নৱাধিকারী হয়ে সম্মুদ্রগুপ্ত পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্যকে

পৱিণ্ঠ কৱেছিলেন এক বিৱাট সাম্রাজ্য। তেমন যুদ্ধপ্রতিভা, বুদ্ধি ও শক্তি শিবাজীৰ উত্তৱাধিকাৰীদেৱ কাৰুৱ ছিল না, তাই ছত্ৰপতি শিবাজীৰ প্ৰসাদে অমন এক সুপৰিচালিত ও সুবৃহৎ রাজ্য ও বিপুল বাহিনী হাতে পেয়েও চাৰিদিকে বিশৃঙ্খলা সুষ্ঠি ছাড়া তাঁৰা আৱ কিছুই কৱতে পাৱেননি। শত্ৰুজী তো মোগলেৱ হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতিলাভ কৱেননি।

তাৰপৰ রাজাচালনাৰ ভাৱ পড়ে পেশোয়া বা প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱ উপৰে। তাঁৰা তখন সুযোগ পেয়ে তাৰ সদ্যবহাৰ কৱতে লাগলেন। তাঁদেৱ মনীষা, কৃটনীতি ও সামৱিক শক্তি শিবাজীৰ সৃষ্টি রাজ্যকে ক্ৰমেই আকাৰ বাড়িয়ে ভাৱতেৰ মধ্যে প্ৰধান কৱে তুললে।

তাৰপৰ ১৭৬০ খ্ৰিস্টাব্দে পেশোয়া বালাজীৰ অধীনে মাৱাঠিদেৱ গৌৱৰ উঠল উন্নতিৰ চৰম শিথৰে—পেশোয়া বালাজী রাও তাঁৰ সেনাপতি সদাশিব রাওয়েৱ সাহায্যে দিলি অধিকাৰ কৱলেন এবং বাদশাহ দ্বিতীয় সাজাহানকে সিংহসন থেকে নামিয়ে ঘোষণা কৱলেন—অতঃপৰ সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হলেন আলি গহৰ বা দ্বিতীয় শা আলম।

সাৱা ভাৱতে জাগ্ৰত হল অভাৱিত বিশ্বায়। হিন্দুৰ কৰলগত রাজধানী দিল্লি! সকলে ভাৱতে লাগল—আজও নামমাৰ সাৱ হয়ে বাদশাহ বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু যে প্ৰবল শক্তি সম্রাটকে সিংহসনে ওঠাতে পাৱে, অদূৰ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সে স্বয়ং প্ৰভু হয়ে দাঁড়াবে।

ভাৱতীয় জনসাধাৰণ স্বপ্নে দেখতে লাগল, আবাৰ এক নৃতন হিন্দু ছত্ৰপতিৰ ছবি।

কিন্তু সে দিবাস্থপ্র ভেঙে যেতে বিলম্ব হল না। ১৭৬১ খ্ৰিস্টাব্দে আহমদ শা আবদালি শ্ৰেষ্ঠ বাৱেৰ মতো ভাৱতেৰ ভাগানিয়স্তা হয়ে পানিপথেৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰে মাৱাঠিদেৱ শোচনীয় ভাৱে পৰাজিত কৱলেন।

কিন্তু এটা সন্তুলণ হত না যদি পেশোয়া বালাজী রাও স্বয়ং সশীলনৰ রাঙক্ষেত্ৰে উপস্থিত থাকতেন। তাঁৰ অবৰ্তমানে প্ৰধান প্ৰধান সেনাপতিৰা সাংঘাতিক আঘাকলহে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধজয়েৰ যে কোনও আশাকেই নিৰ্মূল কৱে দিয়েছিল।

হিন্দুদেৱ সেনিকাৰ দুৰ্ভাগ্য স্মৰণ কৱলে মন শিউৱে না উঠে পাৱে না।

কেবল যে বাইশ হাজাৰ স্ত্ৰী-পুৰুষ (মাৱাঠিদেৱ শিবিৱে বহু নারীও ছিল) আফগানদেৱ হাতে বন্দি হল তা নয়, যুদ্ধক্ষেত্ৰে পৱিণ্ঠ হল বিৱাট এক মাৱাঠি শবস্থানে। আটাশ হাজাৰ মাৱাঠিৰ মৃতদেহে পানিপথেৰ রঞক্ষেত্ৰে পূৰ্ণ হয়ে গেল। তাৰ উপৰে শিবিৱে শিবিৱেৰ পাওয়া গেল কত হাজাৰ মৃতদেহ তাৰ সংখ্যা কেউ জানে না। পানিপথ শহৱেৰ আঘাত নিতে গিয়ে এক দিনেই মাৱা পড়ে প্ৰায় নয় হাজাৰ মাৱাঠি। বিজেতাদেৱ দ্বাৱা অনুসৃত হয়ে যেসব রাস্তা ও জন্মল দিয়ে মাৱাঠিৰা পলায়ন কৱেছিল সেসবও ছেয়ে গেল শবদেহে শবদেহে।

প্ৰধান সেনাপতি সদাশিব রাও পৱাজিত হয়ে রঞক্ষেত্ৰেৰ বাৰংবাৰ মৃত্যুকে স্মৰণ কৱেও যখন মৃত্যুকে লাভ কৱলেন না, তখন তাঁৰ মনে এই দুৰ্ভাবনাই প্ৰবল হয়ে উঠেছিল, অতঃপৰ কেমন কৱে পুনায় ফিরে পেশোয়াকে তিনি মৃত্যু দেখাবেন!

কিন্তু তাঁৰ বহুমূল্য পৱিণ্ঠ ও রঞ্জত্যগেৰ দিকে আকৃষ্ট হয়ে একদল আফগান তেড়ে এসে গৰ্জন কৱে বললে, ‘এই কাফেৱ, যদি নিজেৰ প্ৰাণ বাঁচাতে চাস, তাহলে এখনই আঘাসমৰ্পণ কৱৰ!’

কিন্তু পৱাজিত সদাশিব নিজেৰ প্ৰাণ বাঁচাতে চাস না, তিনি আঘাসমৰ্পণ কৱলেন না। আহত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই শক্রদলেৰ মধ্যে অসিহস্তে সিংহবিক্ৰমে তিনি বাঁপিয়ে পড়লেন এবং একই তিন-চাৰজন শক্রৰ প্ৰাপ্যবৎ কৱে দেছেছায় মৃত্যুকে বৱণ কৱে নিলেন।

মাৱাঠিৰ প্ৰতোক পৱিবাৰ থেকে কেউ না কেউ পানিপথেৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়েছিল।

কিন্তু তখনও মাৱাঠিদেৱ জীৱনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গীবক আদর্শ তখনও জাতির মধ্যে একনায়কত্বের আশা লৃপ্ত হতে দেয়নি। কয়েক বৎসর যেতেই মারাঠিরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারা আবার ভারতের রাজধানী দিল্লি আক্রমণ ও অধিকার করলে এবং আবার নির্বাসিত বাদশাহ শা আলমকে সঙ্গে করে এনে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল (১৭৭১ খ্রিঃ)।

কিন্তু সে হচ্ছে নেববার আগে প্রদীপের শিখা জুলজুল করে ওঠার মতো। ব্রিটিশ সিংহ তখন পলাশির যুদ্ধ জিতে শক্তিসংঘয় করে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিছুদিন যেতে না যেতেই যোদ্ধা ও রাজনৈতিক লর্ড ওয়েলেসলি আবার মারাঠিদের রণক্ষেত্রে অনায়াসে পরাস্ত করে তাদের সমস্ত উচ্চাকাঞ্চকাকে ধূলিসাঁৎ করে দিলেন।

তারপর বহুদিন আমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ব্রিটিশ সিংহ অবশেষে শ্বেতদ্বীপে নিজের ডেরায় পালিয়ে দিয়েছে। ভারত এখন শাধীন।

আজ প্রজাতন্ত্রের জয়জয়কার। কেউ আর এখানে ছত্রপতি হতে চায় না, কারণ একনায়কত্বের যুগ বিগত।

ମାତ୍ରାଚିତ୍ର

ଗୁପ୍ତଧନେର ଦୁଃସମ୍ପନ୍ନ



କଣ୍ଠରୁ ମନୋହରାମ୍ପାଟି

ଲିପି

ଶିଳ୍ପି

ଲାଖ

ଲିପାନ୍ତର ଲାଖ ୧୦୦

ଲାଖ ୩୩୩ ଲାଖ

ଲାଖ ୫୫୫ ଲାଖ କହିଯାଇଥିଲା

ଲାଖ ୫୫୫

ଲାଖ ୫୫୫ ଲାଖ ୫୫୫

প্রস্তাবনা

গোলদিঘির কাছাকাছি ছোটো একটা গলি।

একখানা বাড়ি, তার সামনের দিকে তলায় আছে একটি কেতাবের দোকান। পাশের শুড়িপথ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে, সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠে সামনেই পাওয়া যায় মাঝারি একখানা ঘর। দরজা দিয়ে পুরু পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেই মনে জাগে এক অভাবিত বিশয়। মেঝের উপর পাতা এমন পুরু ও নরম কাপেট যে, তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে পা-দুটো বসে যায় নীচের দিকে। চারদিকের দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা কয়েকখানা ছবি, দামি ফ্রেমে বাঁধানো। ঠিক মাঝখানে রঙিন ইতালিয়ান মার্বেলের একটি বড়ো গোলটেবিল। টেবিলের চারপাশে খানকয় গদি-আঁটা বাকবাকে চেয়ার। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুখানা করে সোফা এবং একখানা করে কোচ। তার উপরে সাজানো নরম নরম 'কুশন'গুলো নীরবে অতিথিদের জানাচ্ছে যেন সাদর আহুন। পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড মূল্যবান 'অর্গান'। তার উপরে 'পোর্সিলিন'-এর আধাৰে সাজানো মরণুমি ফুলের ঝাড়। প্রথম পথের উপরে দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুখানা তরবারি। কড়িকাঠ থেকে ঘরের মাঝখানে ঝুলছে মন্ত বড়ো একটা বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড়। দেখলেই বোৰা যায় ঘরের মালিকের রুচি ও ঐর্ষ্যরের অভাব নেই।

গোলটেবিলটার একখাবে বসে আছে দুইজন এবং আর-একদিকে বসে আছে আর-একজন লোক। ধৰনধাৰণ দেখলে মনে হয় শেৰোভু বাঙ্গাই বাড়িৰ কৰ্তা।

টেবিলের উপরে রয়েছে একটি 'ডিকান্টার' ও তিনটি মদের গেলাস। কথা কইতে কইতে মাঝে মাঝে তারা দিচ্ছিল গেলাসে চুমুক।

কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা দৃশ্য। কালো রঙের কুমাল দিয়ে তিনজনেরই মুখ ঢাকা।

দুইজন লোকের একজন বললে, 'আমাদের কী করতে হবে এখনও শুনতে পেলুম না।' তার কঠস্বরে অধীরতার আভাস।

আর-একজন বললে, তেমনি অধীর থবেই বললে, 'আব এই ছেলেখেলার অর্থও তো বুঝাতে পারছি না। কুমাল দিয়ে আমরা মুখ-চোখ ঢেকে আছি। যে মোটরে করে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে তার জানলাগুলোও ঢেকে রাখা হয়েছিল পর্দা দিয়ে—যাতে আমরা বুঝাতে না পাবি কোথায় আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে!'

যাকে কৰ্তা বলে মনে হয়, সেই লোকটি প্রশান্ত কঠে বললে, 'এখনই সবই শুনতে পাবেন।' তারপরেই হাততালি দিলে দুইবার।

পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন লোক যাতার হাতে একটা সিগারেটের কোটো এবং একটা চুক্টের বাক্স। মৌন মুখে এগিয়ে এসে সে টেবিলের উপরে রেখে দিলে সেই কোটো ও বাক্সটা। তারপর ধীরে ধীরে শুধোলে, 'কী কৰ্তা?'

কৰ্তা বললে, 'তুমি আর-সবাইকে নিয়ে এখনই বাড়ি থেকে ঢলে যাও। বাড়িতে যেন কেউ না থাকে। রাত ঠিক সাড়ে নয়টাৰ সময় বাড়িৰ সামনে গাড়ি-টাঙ্গি প্রস্তুত রাখা চাই।'

—'যে আজ্ঞে' বলে লোকটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে 'কৰ্তা' নামে পরিচিত লোকটি

বললে, 'বাড়ির ভিতরে আর-কোনও বাইরের লোক নেই। হ্যাঁমৈ আমি আপনাদের কৌতুহল
নিবারণ করব।'

আরও কাছে সরে এসে বসল অন্য দুই মৃত্তি।

এয়ার প্রিন্ট প্রক্ষেপ

গুপ্ত বাংলা

৭

এক ঘন্টা পরে হাতের চুক্তটা ভস্মাধারে নিষ্কেপ করে কর্তা বললে, 'মশাই, এই হচ্ছে আমার
বক্তব্য। গুপ্তধন যে কোথায় আছে তা আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তবে তার অস্তিত্ব
সম্বন্ধে আমি একেবারেই নিশ্চিত। কেবল মাঝখানে আছে একটি স্তুলোক। তাকে নিয়ে বেশি মাথা
ঘামাবার দরকার নেই।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'স্তুলোক নিয়ে আমি কোনও দিনই মাথা ঘামাই না।'

তৃতীয় ব্যক্তি বললে, 'কিন্তু আমাদের একান্ত ভাবেই নির্ভর করতে হবে আপনার উপরেই।'

কর্তা বললে, 'তা ছাড়া আপনাদের আর কোনও উপায়ও নেই। আমি যা বলব, আপনাদের
অঙ্করে অঙ্করে তা পালন করতে হবে। হয়তো আপনারা ভাবছেন, গুপ্তধন পেলে পর শেষ পর্যন্ত
আমি আপনাদের ঠাকিয়ে সরে পড়ব। হয়তো তা সভবপর, হয়তো তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই বুঁকিটা
আপনারা নিতে রাজি আছেন কি?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'তা যদি বলেন, তবে শেষ পর্যন্ত আমরাও তো আপনাকে ঠাকিয়ে সরে
পড়তে পারি?'

'না মশাই, না।' কর্তার কষ্টে ফুটল একটা হ্যাস্যধনি—একসঙ্গে তা মৃদু ও কঠিন। তারপর
সে আবার বললে, 'না মশাই, না, আপনারা তা পারেন না। আপনাদের দুজনের নাড়ি-নক্ষত্র আছে
আমার নথর্পশে, কিন্তু আমার কোনও পরিচয়ই আপনারা জানেন না।'

অপর দুই ব্যক্তি সচমুকে উঠে দাঁড়াল—যেন এখনই তারা কর্তার উপরে বাঘের মতো বাঁপিয়ে
পড়বে। হঠাৎ নিজের পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কর্তা চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল।
অন্য দুই ব্যক্তি আবার আসন গ্রহণ করলে।

কর্তা মৃদু ও কঠিন স্বরে তেমনি হ্যাস্য করে বললে, 'আপনাদের আর কোনও প্রশ্ন আছে কি?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'হ্যাঁ। আপনি যে কৃপাপরবশ হয়ে গুপ্তধনের অংশ দেবার জন্যে আমাদের
ডেকে এনেছেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনার কথটা কী বলুন দেখি?'

—'ঠিক। এমন প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। আপনাদের ডেকে আনবার কয়েকটি কারণ আছে।
প্রথম কারণ হচ্ছে, একজন আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল হবে না, আমার সাহায্যকারীর দরকার। দ্বিতীয়
কারণ, যে কোনও ছিকে ঢোরকে নিয়ে আমার কাজ চলবে না। আমি চাই এমন দুইজন লোক, যারা
শিক্ষিত অথচ হিতাহিত জ্ঞানের ধারে ধারে না। আরও কয়েকটি গৌণ কারণ আছে, কিন্তু আপাতত
তা উল্লেখ করবার দরকার নেই।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'উত্তম! আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি।'

তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে কর্তা বললে, 'আর আপনি?'

সে বললে, 'আমিও রাজি।'

কর্তা বললে, 'আপনাদের ধন্যবাদ। তাহলে আপাতত এই পর্যন্ত—যদিতে ঠিক নয়টা। বাড়ির

বাইরেই আপনাদের দুজনের জন্মে দুখানা ‘মোটর-কার’ অপেক্ষা করছে। আপনারা এখন যে যার বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সকলেরই মূখ ঢাকা। কিন্তু উপায় নেই, এখনই আত্মপ্রকাশ করলে ভবিষ্যতে আমাদের অসুবিধা হতে পারে। অতএব আজ বিদায়, নমস্কার।’

কর্তা আবার দিলে দুইবার হাততালি। ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল দুজন লোক। পরনে তাদের মোটরচালকের পোশাক।

কর্তা বললে, ‘এই দুই ভদ্রলোককে এঁদের ঠিকানায় পৌঁছে দাও।’

তারা চলে গেলে পর কর্তা দাঁড়িয়ে উঠে আবার একটা নতুন সিগার ধরালে।

মোটরচালকের পোশাক পরা আর এক বাত্তি ঘরের ভিতরে ঢুকে সেলাই করে বললে, ‘হজুর, ওরা চলে গিয়েছে। এখন আপনিও তো বাড়িতে যাবেন?’

মুখের উপর থেকে আবরণটা খুলে ফেলে কর্তা বললে, ‘হাঁ তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো গে, আমি এখনই যাচ্ছি।’

লোকটা চলে গেল। কর্তা চুপ করে দাঁড়িয়ে রাইল মিনিট-খানেক। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে থারে থিরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে কী দেখে হঠাত সে চকমে উঠল। হেঁ হয়ে জিনিসটা সে তুলে নিলে। একখানা পকেটবুক। সেখানা খুলেই তার দৃষ্টি আবার হয়ে উঠল সচকিত। সে নিজের মনেই বললে, ‘তাহলে এখানে নিশ্চয়ই বাইরের কোনও লোক এসেছিল।’ পাশেই রয়েছে আর-একটা ঘরের দরজা। পক্ষের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বার করে এগিয়ে গিয়ে সে দরজা খুলে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘কে এখানে আছ? একটু নড়লেই এখনই গুলি করে মেরে ফেলব।’

বাঁ পক্ষে হাত ঢুকিয়ে একটা টর্চ বার করে তার সমুজ্জ্বল আলোকরেখা ঘরের ভিতর নিষ্কেপ করেই সে তাড়াতাড়ি সবিশয়ে বলে উঠল, ‘একী ব্যাপার!’

সেখানে মেরের উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে রয়েছে একটা মনুষ-মূর্তি।

৪৩

প্রথম

প্রথম

প্রথম

গোবিন্দদাসের শুশ্রান্তি

পুলিশ কমিশনার শ্রীসুধাকান্ত চৌধুরি কী একখানা কাগজ পড়তে পড়তে রেখে দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেন।

একজন উর্দ্ধপ্রকাশক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। কমিশনার বললেন, ‘বসন্তবাবুকে একবার আমার এখানে আসতে বলো।’

বসন্তকুমার রায় হচ্ছেন গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী কমিশনার। একটু পরেই তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে আসন প্রশংস করলেন। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, ‘খবর কী?’

সুধাকান্ত বললেন, ‘তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই।’

বসন্ত নীরসকষ্টে বললেন, ‘কাজের ভার? আমি তো এইমাত্র ভাবছিলুম, এক মাসের জন্মে ছুটির দরখাস্ত করব।’

সুধাকান্ত বললেন, ‘আপাতত ছুটির কথা ভুলে যাও। তোমাকে একটা জরুরি সমস্যার সমাধান করতে হবে।’

—‘জরুরি সমস্যা! সেই সাদা সওয়ারের মামলা নয় তো?’

—‘ঠিক তাই। একাজে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর নেই।’ শুধু আর কিছু নেই।

বসন্ত দুই তুকু কুঁচকে বললেন, ‘সাদা সওয়ারের নিকুঠি করেছে। তাকে নিয়ে প্রেতত্ত্ববিদরা যত খুশি মাথা ঘামাতে পারে, কিন্তু আমি কেন? আমি তো ভূতের রোজা নই।’

—‘বসন্ত, যা শুনছি, এ হচ্ছে একটা নিরেট শয়ীরী ভূত। হাতকড়ি পরাতে গেলে হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারবে না। তাকে প্রেপ্তার করতে হবে তোমাকেই। রাধাপুর কোথায় জানো তো?’

—‘জানি। কলকাতার খুব কাছেই। অথচ বন্য জায়গা।’

—‘কিন্তু সেখান থেকে তুমি অনায়াসেই টেলিফোনে আমার স্বাক্ষর সময়ে প্রাণহান্ত করতে পারবে।’

—‘এ সম্বন্ধে আপনি আরও কিছু খবর রাখেন?’

—‘রাখি। তুমি গোবিন্দদাসকে ভোলোনি তো?’

বসন্ত নীরবে ভাবতে লাগলেন। গোবিন্দদাস, তার আরও কয়েকটি ছদ্মনামের সঙ্গে পুলিশ পরিচিত আছে। তারা বৎশানকুম্ভে স্ট্রিটান। তার স্বর্গীয় পিতা ছিলেন ধৰ্ম প্রচারক রেভারেন্ড, কিন্তু অমন পিতার পুত্র হয়েও গোবিন্দদাস নাম কিনেছে প্রতারক রূপে। সরকারি আবগারি বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে সে দেশের নানা জায়গায় গোপনে কোকেন ও আফিম প্রভৃতি সরবরাহ করত। এদেশে এমন আর কেউ ছিল না, তার সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। প্রাণপণ চেষ্টার পরেও পুলিশ তাকে প্রেপ্তার করতে পারেনি, তার মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে।

সুধাকান্ত বললেন, ‘সকলেই জানে গোবিন্দদাস ছিল একজন ধনকুবের। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গোবিন্দদাসের নামে ব্যাংকে জমা আছে মাত্র কয়েক হাজার টাকা।’

বসন্ত বললেন, ‘আশ্চর্য নয়। এ শ্রেণির অপরাধীরা দুই হাতে টাকা রোজগার করে, আবার দুই হাতেই তা উড়িয়ে দিতে পারে।’

—‘তা পারে। কিন্তু গোবিন্দদাস এ দলের লোক ছিল না।’

বসন্ত হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘আপনি আমাকে রাধাপুরে যেতে বলাইলেন না? আমার মনে পড়েছে, রাধাপুরে গোবিন্দদাসের একখানা বাড়ি আছে।’

সুধাকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, ‘ঠিক! সেই রাধাপুরেই হচ্ছে সাদা সওয়ারের উৎপাত। লোকে বলে, সেখানে কোনও এক জায়গায় গোবিন্দদাস তার গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গিয়েছে। তোমার কি মনে হয় না, সাদা সওয়ারের এই আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সেই গুপ্তধনের কোনও সম্পর্ক আছে?’

বসন্ত কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, ‘গোবিন্দদাসের একটি যেয়ে আছে না?’

—‘ঠিক নিজের যেয়ে নয়। গোবিন্দদাস এক বিধাবকে বিবাহ করেছিল। তার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরসে এই যেয়ের জন্ম হয়। অবশ্য গোবিন্দদাস তাকে নিজের যেয়ের মতোই স্বত্ত্বে লান-পালন করেছিল।’

—‘সেই যেয়েটির কথা আপনি কি কিছু জানেন?’

— ‘বিশেষ কিছুই নয়। তোমাকেই তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, সেই মেয়েটি তার পিতার শুণ্ঠনের কোনও-না-কোনও খবর রাখে। খুব শীঘ্রই হয়তো সাদা সওয়ারের মনেও জাগবে এই সন্দেহ। তখন তার দৃষ্টি পড়বে ওই মেয়েটির দিকেই। কিন্তু তার আগেই আমি তোমাকে ঘটনাশূল হাজির থাকতে বলি। তোমার কর্তব্য বুঝেছ তো?’

— ‘বুঝেছি। কিন্তু সাদা সওয়ারকে আপনি এর সঙ্গে জড়িত করতে চাইছেন কেন?’

— ‘এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকেই আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাব। যদি দরকার মনে করো তাহলে তুমি শোহনলালকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো। শোহনলালের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে তো?’

— ‘হয়েছে। সে ভুল করে আমার ঘরে চুকে পড়েছিল। লোকটিকে চালাক-চতুর বলে মনে হয়। দু-দিনেই আমার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে।’

সুধাকান্ত বললেন, ‘তাহলে তাকেও সঙ্গীরাপে প্রশ্ন করতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?’

— ‘না।’

— ‘উত্তর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাদা সওয়ারের রহস্যটা আবিষ্কার করতে তোমার বেশি দেরি লাগবে না।’

— ‘হ্যাঁ। যদি তার ছায়ামূর্তির মাঝখানে কায়ার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে আমাকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না কিছুতেই।’ এই বলে বসন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাহের ক্ষয়ক্ষতির পৰিমাণ	১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাহের বিক্রয় পৰিমাণ
২৩৩৫৮ টাঙ্কি	১৩৪৫৮ টাঙ্কি
ক্ষয়ক্ষতির পৰিমাণ বিক্রয় পৰিমাণ	ক্ষয়ক্ষতির পৰিমাণ বিক্রয় পৰিমাণ

চন্দ্রকান্ত চন্দ্র

চৌরঙ্গি অঞ্চলে একখানা লম্বা-চওড়া দোকানঘর। শহরের ধৈৰী ও সৌখ্যিন ব্যক্তিরা দামি আসবাব-পত্রের আবশ্যক হলে সেখানে পদার্পণ করেন। সেই দোকানের মালিক হচ্ছে শ্রীচন্দ্রকান্ত চন্দ্র। বয়সে সে প্রৌঢ়, বীতিমতো জাঁদরেলের মতো চেহারা। পরনে সাহেবি পোশাক, যদিও ত্বর গায়ের রং দেখলে কাফিরা তাকে স্বজাতীয় বলে সন্দেহ করতে পারে!

দোকানের পিছন দিকে তার নিজস্ব কামরা—অর্থাৎ আফিসঘর। আধুনিক কেতায় সাজানো আফিসঘর। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, টাইপরাইটার এবং সেই সঙ্গে একটি তরুণী সেক্রেটারি, কিছুই অভাব নেই।

কিন্তু পুলিশ তাকে সন্দেহ করে। কেন যে সন্দেহ করে, সে-সম্বন্ধে পুলিশেরও পরিষ্কার ধারণা নেই। কিন্তু তারা মনে মনে বিশ্বাস করে, চন্দ্রকান্তের এই দোকান এবং আফিস হচ্ছে একটা লোক-দখানো ব্যাপার। এর আড়ালে বসে তলে তলে সে-যে কী করে, তা জানবার জন্যে পুলিশের যথেষ্ট আগ্রহের অভাব নেই।

সেদিন বৈকালে চন্দ্রকান্ত মুখে মুখে একখানা ব্যাবসা সংক্রান্ত পত্র রচনা করে যাচ্ছিল এবং টেবিলের অপর প্রান্তে বসে তা লিখে নিছিল তার সেক্রেটারি। সে হচ্ছে তরুণী এবং রূপসী। তার নাম রঞ্জা। লেখা শেষ করে রঞ্জা শুধোলে, ‘আমি কি এখনই চিঠিখানা টাইপ’ করে আনব?’

হর্নের ডাঁটিওয়ালা চশমার ভিতর দিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে চন্দ্রকান্ত বললে, ‘বিশেষ তাড়া নেই, চিঠিখনা কাল ‘টাইপ’ করলোও চলবে।’

রঞ্জা বললে, ‘আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কাল থেকে সাত দিন আমাকে ছুটি দিয়েছেন। আমি এখনই এখান ‘টাইপ’ করে আনছি।’ বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

চন্দ্রকান্ত হাত বাড়িয়ে তার একখনা হাত ধরে বললে, ‘প্রিয় রঞ্জা, একটু দাঁড়াও। তুমি যে সুন্দরী, একথা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই। আমি ইচ্ছা করি না এই ভাবে চাকরি করে তুমি নিজের জীবনটা কাটিয়ে দাও। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, চাকরি ছেড়ে তুমি আরও অনেক কিছুই করতে পারো।’

রঞ্জা গভীর ভাবে বললে, ‘আমি যা করছি তাই আমার ভালো। এসব কথা ভেবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।’

—‘তুমি সাত দিনের ছুটি নিয়েছ, নয়? তুমি রাধাপুরে থাকো? ওখানে আমারও একখনা বাগানবাড়ি আছে। আমারও সেখানে যাবার ইচ্ছে হয়, কেবল কাজের ভিত্তে পারি না।’

টান মেরে চন্দ্রকান্তের ঘূষ্টির ভিতর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রঞ্জা বললে, ‘আপনার কোথায় বাগান আছে আর কোথায় যেতে ইচ্ছে হয়, তা নিয়ে আমার যাথা ঘায়াবার দরকার নেই।’

চন্দ্রকান্ত কর্কশ ঘরে বললে, ‘মনিবের সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে শেখো।’

রঞ্জা শাস্ত সুরে বললে, ‘মনিবের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, আমি তা ভালো করেই জানি।’

চন্দ্রকান্ত গলার আওয়াজ আবার নরম করে বললে, ‘প্রিয় রঞ্জা, আমার উপরে রাগ কোরো না। আমি তোমাকে সত্য সত্যই ভালোবাসি।’

রঞ্জা হাতের চিঠিখনা ছিঁড়ে দুই খণ্ড করে ফেললে। তারপর সেই কাগজের টুকরো দুটো দূরে নিষ্কেপ করে বললে, ‘আপনি নতুন কোনও সেক্রেটারি নিযুক্ত করবেন। নমফ্কার, আমি চললুম।’

চন্দ্রকান্ত এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে, তার গওদেশের উপরে গিয়ে পড়ল চন্দ্রকান্তের উন্তপ্ত নিশ্চাস। সে নির্মকষ্টে প্রায় গর্জে উঠেই বললে, ‘এমন ভাবে তুমি এখান থেকে সরে পড়তে পারবে না। নিজেকে তুমি কী মনে করো? তোমার বাবা আবগারি বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কাগাই করেছে! সেই বাপেরই তো স্ত্রীয়ে তুমি? না, তুমি ঠিক তার নিজের মেয়ে নও, তোমার আপন বাপ ছিল তোমার মায়ের আবগারিকার স্বামী। আমি তোমাকে এখানে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি তাই, নইলে—’

চন্দ্রকান্তকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে রঞ্জা নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলে। তারপর তার গওদেশে শশদেশ এক চপেটাঘাত করে সে দ্রুত্বে ঘরে বলে উঠল, ‘লম্পট! বলেই দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৪৮

চন্দ্রকান্ত বাস করত গঙ্গার ধারের একখনা বাড়িতে।

সেই দিন রাত্রে আহারাদির পর সে বসে বসে ধূমপান করছে এবং মনে মনে ভাবছে: আসছে কাল আমিও গিয়ে হাজির হব রাধাপুরে। সেখানে আমার অনেক কাজ। গোবিন্দদাসের গুপ্তবন! সাদা

সওয়ার! গোবিন্দদাসের কল্যা রঞ্জা! মনে হচ্ছে, এসবের ভিতরেই একটা কোনও গৃষ্ট সংশ্লিষ্ট আছে।
সুতরাং ভবিষ্যতে রাধাপুরে উপস্থিত না হলে আমার চলবে না।

তার চিন্তায় বাধা পড়ল। ভৃত্য ঘরে চুকে তার হাতে দিলে একখানা খাম। প্রথম পৃষ্ঠা

খামের ভিতরে ছিল বাংলা টাইপ রাইটারে লেখা একখানা পত্র।

চন্দ্রকান্ত নিষ্পলক মেঝে পাঠ করলে

‘চন্দ্রকান্ত, তুমি বোধহয় রাধাপুরে আসতে চাও? আসতে পারো—কিন্তু সাবধান, তোমার ওই
অপবিত্র হাত দিয়ে আর কোনওদিন রঞ্জাদেবীকে স্পর্শ কোরো না। যদি করো, তাহলে কী হবে জানো?
রাধাপুরের মাটির উপরেই পড়ে থাকবে তোমার নিশ্চল মৃতদেহই।’

পত্রপাঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতরে বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র। উদ্ধ্রান্ত দৃষ্টিতে সেইদিকে
চেয়ে চন্দ্রকান্ত উঠে গেল কলের পুতুলের মতন। রিসিভারটা হাতে নিয়েই শুনলে এক অপরিচিত
কষ্টস্বর।

সেই কষ্টস্বর বললে, ‘কে, চন্দ্রকান্ত নাকি? তোমার ছুটির দরকার হয়েছে। কাল সকালে উঠেই
রাধাপুরে চলে যাও। তারপর তোমাকে কী করতে হবে, তা আমিও জানি আর তুমিও জানো। বুঝেছ?’
—‘হ্যাঁ।’

—‘আমার আর যা বক্তব্য আছে, পরে যথাসময়েই শুনতে পাবে। ‘ফোন’ ছেড়ে দাও।’

চন্দ্রকান্ত কম্পিত হস্তে সদ্যপ্রাপ্ত পত্রখানা আবার বিশ্বারিত চক্ষের সামনে ধরে পাঠ করতে
লাগল। তার সমস্ত দেহ পাথরের মূর্তির মতো আড়ে!

প্রথম
সেক্ষেত্র প্রিন্ট, কলকাতা
১৯৬৫

সাদা সওয়ার ও গুপ্তধন

প্রথম

১৯৬৫

প্রিন্ট

শোহনলাল জাভার পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা এবং জাতেও সে বাঙালি নয় বটে, তবে ভারতেই
তার জন্ম। এবং সে ঠিক বাঙালির মতোই অনৰ্গল কথা কইতে পারে বাংলা ভাষায়। বিশেষ কোনও
অপরাধীর সন্ধানে তাকে আসতে হয়েছে কলকাতায়।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি এমন বাংলা শিখলে কেননা করে?’

শোহন হেসে বললে, ‘প্রথম জীবনে বিশ বছর বয়স পূর্বস্থ কেটে গিয়েছে আমার বাংলা দেশেই।
লেখাপড়াও শিখেছিলুম আমি এইখানেই। কাজেই বাংলা হয়ে পড়েছে আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষার
মতো।’

কেবল তাই নয়, নিজের মোটর নিজের হাতেই চালাতে চালাতে শোহনলাল রাধাপুর সহস্রেও
অনেক প্রাচীন তথ্যের সন্ধান দিয়ে বসন্তকে রীতিমতো বিশ্বিত করে তুললে। বাংলা দেশের লোক
হয়েও বসন্ত এসব কথা জানতেন না।

শোহনলাল বললে, ‘আমরা যাচ্ছি সাদা সওয়ারকে প্রেস্তুর করতে। কিন্তু সাদা সওয়ারের উৎপত্তি
কোথায় জানেন?’

—‘না।’

প্রথম

প্রিন্ট

১৯৬৫

— ‘কিংবদন্তি বলে, চারশো বছর আগে এ অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম রাধারমণ রায়। রাধাপুরের নামকরণ হয়েছে তাঁরই নামানুসারে। রাজা রাধারমণ একবার তাঁর কোনও প্রতিযোগীর বিক্রকে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ছাউনি ফেলে তিনি যখন শক্র জন্মে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় গুপ্তরের মুখে হঠাতে খবর পেলেন, তাঁর রানি অবিশ্বাসিনী। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আস্থাদান করেছেন। সংবাদ শুনেই রাজা রাধারমণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন! শক্র কথা ভুলে তিনি তৎক্ষণাতে এক দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাধাপুরে ফিরে আসেন, তারপর প্রণয়ীর সঙ্গে রানিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেন। অতঃপর এক রক্তাত্ম দুশ্যের অভিনয় হয়। তরবারির আঘাতে রানি ও তার প্রণয়ীর মুগুচ্ছেদ করে রাজা আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে যান, আর সেই যুদ্ধেই তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তারপর একে একে বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়। সমৃদ্ধিশালী রাধাপুর ক্রমে একখানা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। যেখানে রাজবাড়ি ছিল, আজও সেখানে গেলে দেখা যায় একটা প্রকাণ্ড ধৰ্মসন্তুপ। হানীয় বাসিন্দারা বলে, আজও গভীর রাত্রে সেই ধৰ্মসন্তুপের মধ্যে দেখা যায় অশ্বারোহী রাজা রাধারমণের ছায়ামূর্তি। রাধাপুরের এখানে আজকাল যে সাদা সওয়ারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো সে আমাদেরই মতো দেহী মানুষ, বৃদ্ধিমানের মতো এই প্রাচীন কিংবদন্তিকে নিজের কাজে লাগাতে চায়। এখন সেই কাজটা যে কী, সেইটৈই আমাদের হিঁর করতে হবে।’

বসন্ত বললেন, ‘গোবিন্দদাসের গুপ্তধন আবিষ্কার করবার জন্যেই যে সাদা সওয়ারের এখানে আবির্ভাব হয়েছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। সকলেরই বিশ্বাস, রাধাপুরেই কোনও এক জায়গায় গোবিন্দদাস তার গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এ গুপ্তধন বেওয়ারিস নয়, তার মালিক হচ্ছে গোবিন্দদাসের কন্যা রঞ্জা।’

— ‘গোবিন্দদাস কি উইল করে রঞ্জাকে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছে?’

— ‘না। গোবিন্দদাস হঠাতে মারা পড়ে, উইল করবার সুযোগ পায়নি। তার পরিবারের মধ্যে এখন বৈচে আছে কেবল রঞ্জা।’

শোহনলাল বললে, ‘সাদা সওয়ার সম্বন্ধে আর কিছু আপনি জানতে পেরেছেন কি?’

বসন্ত বললেন, ‘বিশেষ কিছুই নয়। একদিন সকালে গাঁয়ের দজ্জলের কাছে মাঠের উপরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। জ্ঞান হলে পর তারা বলে, গ্রামজুড়ে থেকে তারা যখন প্রোনো রাজবাড়ির ধৰ্মসাবশেষের পাশ দিয়ে আসছিল, তখন একটা উচ্চ জমির উপরে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়। ব্যাপার কী জানবার জন্যে কৌতুহলী হয়ে তারা সেইদিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু দূরেই অতর্কিংত মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সেইখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। গাঁয়ের চৌকিদারের মুখেও শোনা গিয়েছে আর একটা কাহিনি। এক রাত্রে সে রোঁদে বেরিয়ে মাঠের দিক থেকে ফিরে আসছিল, হঠাতে দেখতে পায় ধৰ্মসন্তুপের উচ্চভূমির উপরে আছে এক অশ্বারোহীর মৃতি। সে পায়ে পায়ে সেইদিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অশ্বারোহী তার দিকে বেগে ঘোপের ডিতরে আঘাতে থাকে। চৌকিদার বলে, সেই ঘোড়সওয়ারকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সে একটা ঘোপের ডিতরে আঘাতে থাকে। কিন্তু শোহনলাল, আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। খুব সন্তুব ঘোপের ডিতরে লুকিয়ে সে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল আর ভাবছিল যে, কেউ যেন তাকে আবিষ্কার করতে না পারে। সে যা হোক, চৌকিদার দিবি গেলে বলেছে যে, ঘোপের কাছে এসেই

সাদা সওয়ার চিৎকার করে বলে, ‘দূর হ হতভাগা, কালকের সুর্যোদয় যদি দেখতে চাস আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িয়ে থাকিসনি।’ বলেই চাবুক তুলে তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করে। সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু পরদিনে সকলেই দেখেছে, চৌকিদারের পিঠের উপরে রয়েছে, চাবুকের একটা সুদীর্ঘ রক্তাঙ্গ দাগ। তারপর সাদা সওয়ারের দেখা পাওয়া গেছে অনেক রাত্রেই, কিন্তু এই দুই ক্ষেত্র ভিন্ন সে আর কোথাও নিজের হাতের চিহ্ন রেখে যায়নি।’

বসন্ত ও শোহুলালের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাধাপুরের থানাসংলগ্ন এক বাড়িতে।

রাধাপুরে গোবিন্দদাসের যে বাড়ি ছিল, তার নাম ‘তপোবন’। বসন্ত খবর নিয়ে জানতে পারলেন, আজ সাত দিন হল রঞ্জা কলকাতা থেকে সেই বাড়িতে ফিরে এসেছে।

পরদিন প্রভাতেই বসন্ত ‘তপোবনে’ গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড জমির মাঝখানে একখানা দোতলা বাড়ি। বাড়িখানা খুব বড়ো না হলেও অত্যন্ত সুস্থায়। জমির ভিতরে নানা জাতের ফলের গাছ। কিছুকাল আগে সেখানে সাজানো ফুলের বাগান ছিল, এখনও বজায় আছে তার অল্পবিষ্টর অস্তিত্ব। এবং দূর থেকেই দেখা গেল একটা বড়ো পুষ্পরিণীর জল ঝলমল করে উঠছে সোনালি সূর্যকিরণে।

বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একখানা দামি ‘ডেমলার’ মোটরগাড়ি। ডেমলার গাড়ি এখানে সুলভ নয়, তাই বসন্তের মনে পড়ল, কালকে কলকাতা থেকে আসবার সময় ঠিক এই রকমই একখানা ডেমলার গাড়ি তাঁদের গাড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল।

বসন্তের ডাকাডাকি শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ভৃত্যের মতন দেখতে একটি লোক। তিনি রঞ্জা র সঙ্গে দেখা করতে চান শুনে সে বললে, ‘দিদিমণি এখন আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।’

বসন্ত বললেন, ‘বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।’

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল একটি তরুণ যুবক। সে একবার নীরবে জিজ্ঞাসু চোখে বসন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর হন হন করে পা চালিয়ে সেই ডেমলার গাড়ির উপরে গিয়ে উঠল।

তারপরেই দরজার কাছে দেখা গেল একটি তরুণীকে। তাকে অপূর্ব সন্দৰ্ভ বলা চলে।

বসন্ত শুধোলেন, ‘আপনার নামই কি রঞ্জাদেবী?’

অতি মিষ্ট, অতি শিষ্ট হাসি হেসে তরুণী বললে, ‘আজ্জে হাঁ।’

— ‘নিজের পরিচয় আমাকে নিজেই দিতে হবে। আমার নাম বসন্তকুমার রায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি একজন পুলিশ কর্মচারী। আপনার সঙ্গে আমি দু-চারটে কথা কইতেই চাই।’

রঞ্জা হাস্যজড়িত মুখে তাঁকে নিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, ‘আপনি বোধহয় সাদা সওয়ারের বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছেন?’

— ‘হাঁ, একরকম তাই-ই বটে। ব্যাপারটা কী জানেন? কী বলে যে আমি আরান্ত করব, বুঝতে পারছি না। আমার প্রশ্ন শুনলে হয়তো আপনি খুশি হবেন না। রঞ্জাদেবী, আমি জানতে এসেছি—’ বলতে বলতে বসন্ত থেমে গেলেন।

রঞ্জা হাস্যজড়িল মুখে বললে, ‘আপনি বোধহয় আমার বাবার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে চান?’

তার স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বসন্তের খুব ভালো লাগল। তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। আপনার বাবা হয়তো কোনও গুপ্তধন রেখে যাননি, কিন্তু সকলের বিশ্বাস, তিনি রেখে গিয়েছেন। আমি যতদূর জানি, সেই গুপ্তধনের লোডেই এখানে সাদা সওয়ারের অবির্ভাব হয়েছে।’

রঞ্জা বললে, ‘বাবার গুপ্তধন? আমি আজ পর্যন্ত তার একটা আধলাও ঢাঁকে দেখিনি। সেইজনোই প্রাপ্তধারণের জন্যে আমাকে লোকের দাসত্ব সীকার করতে হয়েছে।’ সে হাসতে হাসতেই কথাগুলি বললে বটে, কিন্তু তার কষ্টস্বরের তিক্ততা খানিকটা চমকিত করে তুললে বসন্তকে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই তিক্ততার কারণ কী? তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দাসত্ব? তার মানে আপনি কোথাও ঢাকারি নিয়েছেন? কোথায়?’

—‘চৌরসির চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের কাছে। আপনি কি তাঁকে জানেন?’

চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের কোনও কথা বসন্তের নেটুবুকে লেখা আছে বই কি! তাকে তিনি এখনও হাতেনাতে ধরতে পারেননি বটে, তবে সে যে কী চিজ তা জানতে তাঁর আর বাকি নেই। কিন্তু সে-কথা চেপে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি সাদা সওয়ারকে কখনও দেখেছেন?’

—‘আমার বাড়ির জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দু-বার দেখেছি। কিন্তু ভালো করে কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ সে ছিল আননক দূরে। তবে আমার ইচ্ছে আছে, এক রাত্রে চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দেখে আসব, কে সে?’

বসন্ত হেসে উঠে বললেন, ‘তাহলে আমি আপনাকে প্রেরণ করব। যতদিন না এই রহস্য পরিষ্কার হয়, ততদিন আপনাকে থাকতে হবে এই বাড়ির ভিতরেই। রাত্রে আপনি বাড়ির বাইরে বেরিলেই আমার লোক যাবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে।’

রঞ্জা ঘাড় নেড়ে বললে, ‘বেশ। কিন্তু আপনি কে বসন্তবাবু? ডিটেকটিভ, না সাধারণ পুলিশের লোক?’

—‘ধরে নিন, আমি যা হয় একটা কিছু।’

—‘পুলিশ বোধহয় ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না?’

বসন্ত বললেন, ‘পুলিশের অভিধানে ভূত-প্রেত বলে কোনও শব্দ নেই। এই সাদা সওয়ার যে কে, আমাকে তা জানতে হবেই। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, কিন্তু কাল সকালে আমি আবার এখানে আসতে পারি কি? আমার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপাতত আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।’ বলে তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

রঞ্জা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘নিশ্চয়ই আপনি কাল আসবেন! আপনি যেদিন খুশি আসতে পারেন। আপনার বন্ধুও সঙ্গে এলে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার যে কী উপকার হবে, আমি তা বুঝতে পারছি না। আপনি যে কেন এখানে এসেছেন তাও আমি জানি না।’

বসন্ত বললেন, ‘আমি জানাতে এসেছি যে, রাত্রে আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয়। কারণ,—হ্যাঁ, ভালো কথা! আপনার বাবার গুপ্তধনের কথা আপনি কিছু জানেন কি? ইচ্ছা যদি করেন তাহলে আমার এ প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারেন।’

রঞ্জা আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে বললে, ‘আমি তার একটা আধলাও কখনও স্পর্শ করিনি। তা করবার আগে আমার যেন অনাহারে মৃত্যু হয়। আমি জানি, বাবা কী উপায়ে সেই অর্থ উপর্যুক্ত করেছিলেন। সে অর্থ অস্পৃশ্য—যার ধর্মজ্ঞান আছে, সে তার দিকে ঝিয়েও তাকাবে না। আমি যে

বাবার সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী একথা আমার অজানা নেই। কিন্তু সেটাকা আমি চাই না। যদিও মাঝে মাঝে আমার লোভ হয়, কিন্তু সে লোভ আমি দমন করতে পারি।'

বসন্ত বললেন, 'তাহলে আপনি সব জানেন?'

সোজা বসন্তের চোখের উপরে নিজের চোখ রেখে রঞ্জা বললে, 'হ্যাঁ, জানি। মৃত্যুর আগে বাবা আমাকে বলে গিয়েছিলেন, কোথায় তাঁর সব টাকা লুকানো আছে! আমি যদি ইচ্ছা করি, আজই লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি!'

— শুনো মুশ্যমান, মন্ত্রিকুমার, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক। —

মন্ত্রিকুমার, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক
নাম স্বাক্ষর করে দেখলেন।

চতুর্থ নারীকর্ষণে আর্তনাদ

মন্ত্রিকুমার প্রকাশক

প্রতিষ্ঠান প্রকাশক চতুর্থ

পরদিনের প্রভাতে বাগানের ঘাস জমির মাঝখানে একখানা বেতের চেয়ারে বসে রঞ্জা তার প্রাতরাশ প্রহণ করলে। চায়ের পেয়ালায় শেষ চূক দিয়ে সামনের বেতের টেবিলের উপরে সেটাকে রেখে দিলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলে, ফটক পার হয়ে বাগানের ভিতরে চুকছে একখানা লাল ডেমলার গাঢ়ি।

তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই বিশেষ গাড়িখানা দেখে সে খুশি হয়েছে।

গাড়ির মালিকই গ্রহণ করেছিল চালকের আসন। মেশিন বন্ধ করে ছোটো একটি লাফ মেরে সে নীচে নেমে পড়ল। বয়সে যুবক, গৌরবর্ণ, মুখশীল সুন্দর। একহারা, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ দেহ!

হাস্যমুখে রঞ্জার দিকে আসতে আসতে সে বললে, 'প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে দেখছি যে।'

রঞ্জা বললে, 'ভারী তো প্রাতরাশ! বেগুনি, আলুর বড় আর চা! কিন্তু সেকথা যাক। আজকে আবার আপনার আবির্ভাবের কারণটা জানতে পারি কি?'

যুবক বললে, 'কোনও কারণ নেই—'শুধু আকারণ পুলকেই!' কিন্তু রঞ্জাদেবী, গোড়াতেই আমার উত্তপ্ত উৎসাহকে আপনি এমন শীতল করে দিতে চাইছেন কেন? আমি এলে কি আপনি বিরক্ত হন? আমি কি চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের চেয়েও ভয়াবহ ব্যক্তি?'

সচকিত স্বরে রঞ্জা বললে, 'চন্দ্রবাবুকে আমি যে ভয়াবহ ব্যক্তি বলে মনে করি, একথা কে আপনাকে বললে?'

— 'আপনি নিজেই।'

— 'কথমও না। শ্যামলবাবু, আপনি মনগড়া কথা বলছেন।'

শ্যামল বললে, 'এটা ঠিক আমার মনগড়া কথা নয়। কালই আপনার মুখে শুনলুম, আপনি চাকরি করতেন চন্দ্রকান্তের কাছে। চন্দ্রকান্ত যে দুনিয়ায় শয়তান-প্রেরিত একটি দৃত, এটা আমার অজানা নেই। আপনিও সেকথা অধীকার করলেন না, বরং তার পরেই বেশ রাগত স্বরেই জানালেন যে, আপনি তার চাকরিতে ইত্যন্ত দিয়ে চলে এসেছেন। একথা শোনবার পরে যেকোনও নাবালকই কি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারে না?'

রঞ্জা জবাব দেবার কথা খুঁজে না পেয়ে অর্ণ্য কঁকী পাঞ্জলি। বললে, 'কাল শ্রেণীনে পুলিশ এসেছিল, তা জানেন?'

— শুনো মুশ্যমান, মন্ত্রিকুমার, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক। —

শ্যামল বলে উঠল, ‘ওহো, তাই নাকি? কাল আমি আপনার কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বাইরে যাই, তখন এখানে একটি ছেট্টা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম বটে।’

—‘ছেট্টা মানুষ!’

—‘আহা, ওটা হচ্ছে ব্যস্তেক্ষি। সেই ছেট্টা মানুষটি মাথায় উঁচু হবেন বোধহয় ছয় ফুট দুইঝি। আর তাঁর বুকের মাপও হয়তো পঞ্চাশ ইঞ্চির কাছাকাছি যাবে। কেমন, আপনি তাঁরই কথা বলছেন তো?’

—‘হ্যাঁ। তাঁর নাম বসন্তকুমার রায়।’

দুই চক্ষু বিশ্বারিত করে কৃত্রিম ভয়ের ভাব দেখিয়ে শ্যামল বললে, ‘তগবান আমাকে রক্ষা করুন! বসন্তকুমার রায়? কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার’? লোকে বলে, তাঁর মতো তালেবর গোয়েন্দা নাকি বাংলা দেশে আর নেই।’

রঞ্জা বললে, ‘আমার কিন্তু লোকটিকে ভালোই লাগল।’

—‘ওরকম ভালো-লাগা ভালো কথা নয়, প্রত্যেক পুলিশই হচ্ছে দুষ্টের ধাড়ি! আপনি বোধহয় জানেন না, পুলিশের লোক পাগল হয়ে গেলে পর তার শাশুড়ির কান কামড়ে দেয়? আমি আগে থাকতেই সাবধান করে দিছিলি আপনার যদি বসন্তবাবুকে ভালো লাগে, তাহলে সবুজ হয়ে যাবে আমার গায়ের রং। কেন বুঝতে পেরেছেন কি? হিংসার রং হচ্ছে সবুজ।’

রঞ্জা কোনও রকমে হাসি চেপে বললে, ‘যান শ্যামলবাবু, আপনি যা-তা বাজে বকতে শুরু করে দিয়েছেন।’

—‘বলেন কী, আমি বাজে বকছি নাকি? উত্তম! তাহলে কাজের কথা শুনতে আজ্ঞা হোক।’ শ্যামল তার পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে কোনও সংবাদপত্র থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ বার করলে। তারপর কাগজখনা সামনে ধরে উচ্চ কঁচ পাঠ করতে লাগল

‘অভীতের মানুষ বর্তমানে ঠিক মানুষ নয়, মানুষের ছায়া! ছায়া, অর্থাৎ ছায়ামূর্তি, অর্থাৎ প্রেতায়া! আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন কি, রাধাপুরের সাদা সওয়ার আবার অশ্বারোহী হইয়া নৈশ ভ্রম আরম্ভ করিয়াছে? দৈবজন্মে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই রামনাম স্মরণ করিয়া পথিকৰা চম্পট না দিয়া পারে না। কারণ, সেই সাদা সওয়ার নাকি স্তু-হত্যাকারী এবং অপঘাতে মৃত রাধাপুরের রাজা রাধারমণ রায়ের প্রেতায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। আধুনিক নহে, চারি শত বঙ্গাবুরের প্রাচীন প্রেতায়া! যাঁহারা প্রেত মানেন না, আর এক কারণে রাধাপুরের দিকে তাঁহাদের দুষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। ওখানে যক্ষ আছে কি না জানি না, কিন্তু যক্ষের ধন অর্থাৎ গুপ্তধন আছে বলিয়া অনেকেই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। এই বিশ্বাস সত্য কি না তাহা জনিবার জন্য পুলিশের টনক নাকি রীতিমতো নড়িয়া উঠিয়াছে। আপাতত ইহার অধিক খবর আমরা দিতে পারিলাম না।’

পাঠ শেষ করে শ্যামল বললে, ‘বুঝতেই পারছেন রঞ্জাদেবী, আপনার পিতার গুপ্তধনের কথা নিয়ে অনেকেই এখন আলোচনা করছে।’

চমকে উঠে রঞ্জা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘এ সমস্তে আপনি কী জানেন?’

শ্যামল সহজ স্বরেই বললে, ‘কিছু না, কিছু না! তবে গুপ্তধন উপলক্ষ করে যদি এখানে কোনও উপদ্রবও শুরু হয়, তাহলে আমি আপনাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারি।’

শ্যামলের কথার উন্নরে রঞ্জা কিছু বলবার আগেই বাগানের ভিতরে এসে ঢুকল আর একখানা

মেটর। গাড়ির ভিতর থেকে নামল দুইজন লোক—দুইজনই বিপুলবপু। একজন হচ্ছেন বসন্ত আর একজন শোহনলাল।

বসন্ত কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন, ‘রঞ্জাদেবী, ইনি হচ্ছেন আমার বক্স শোহনলালবাবু। জাভা দ্বাপের নাম শুনেছেন তো? ভারত থেকে সেখানে গিয়ে ইনি পুলিশ বিভাগে কাজ নিয়েছেন। আমাদেরই মতো বাংলাতেও কথা বলতে পারেন।’ বলেই তিনি শ্যামলের দিকে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত।

রঞ্জা বললে, ‘ইনি হচ্ছেন আমার পুরাতন বক্স শ্রীশ্যামলকুমার সেন!'

রঞ্জা বললে মিথ্যা কথা। কেন বললে তা সে নিজেই জানে না, কারণ শ্যামলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগেই।

বসন্ত বললেন, ‘রঞ্জাদেবী, আপনার ভার দেখছি আমাদেরই নিতে হবে। সাদা সওয়ারকে কাল রাত্রেও দেখা গিয়েছে। এসব ভালো লক্ষণ নয়। আমি আজ থেকেই এই বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যে একজন পুলিশের লোক নিযুক্ত করেছি। আশা করি, এজন্যে আপনার কোনও আপত্তি হবে না?’

—‘আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু—’

—‘কিন্তু-চিন্ত নয় রঞ্জাদেবী। আপনার কোনও বিপদ হলে বড়োসাহেবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই।’

রঞ্জা বললে, ‘কিন্তু এত হাঙ্গামা না করলেও চলত।’

শোহনলাল বললে, ‘না রঞ্জাদেবী, সাবধানের মার নেই। জাভা থেকে আমি কলকাতায় এসেছি এক বিপজ্জনক অপরাধীর সন্ধানে। তলেতলে এখবরও পেয়েছি যে, সে তার দলের লোকজনদের নিয়ে রাধাপুরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের লোভে। তারা জানে, গুপ্তধন যে কোথায় আছে এটা আপনার অজ্ঞান নেই। সুতরাং আপনি যেকোনও মুহূর্তেই ভীষণ বিপদে পড়তে পারেন।’

রঞ্জা কোনও জবাব না দিয়ে যেন কী ভাবতে লাগল।

বসন্ত জিজাসা করলেন, ‘রঞ্জাদেবী, আপনার প্রতিবেশীদের কথা আমায় কিছু বলতে পারেন?’

রঞ্জা বললে, ‘প্রতিবেশীদের কথা আমি ভালো করে কিছুই জানি না। কোথাকোথি যারা থাকেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্যামলবাবু। তিনি তো আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর একজন হচ্ছেন ভুবনবাবু—ভুবনচন্দ্র বিশ্বাস। এখানে নতুন প্রস্তেনে, আমার বাগান থেকে উন্নর দিকে তাকালেই দূরে তাঁর বাড়ি দেখতে পাবেন। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি, তবে শুনেছি তাঁর বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেউ নেই।’

—‘তারপর?’

—‘আর-একজন ভদ্রলোক এখানে কিছুকাল থেকে বাস করছেন, আমি তাঁকে চিনি। তাঁর নাম হচ্ছে বিনয়বাবু—রেভারেন্ড বিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা বৈধহয় জানেন, আমরা বংশানুক্রমে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। মাইল খানকে দূরে এখানে একটা পল্লি আছে, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই খ্রিস্টান। তাঁদের উপাসনার জন্যে ছেঁটো একটি গির্জাও আছে। বিনয়বাবু সেই গির্জাসংলগ্ন বাড়িতেই বাস করেন। আর কাকুর কথা আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না।’

বসন্ত বললেন, ‘বেশ, আপাতত আমার আর বেশি কিছু জানবার দরকার নেই। রঞ্জাদেবী, এখানে

পাহারা দেবার জন্যে আমি পুলিশের যে লোকটিকে বেরে যাচ্ছি, তার নাম হচ্ছে সুবোধ। তার জন্যে আপনাকে কিছুই মাথা ঘামাতে হবে না।'

— কিন্তু তিনি থাকবেন কোথায়? তার জন্যে আমার বাড়ির একখানা ঘর ছেড়ে দেব কি?

— 'মোটেই নয়, মোটেই নয়! যতদিন না সাদা সওয়ারের ঘোড়াদৌড় বন্ধ হয়, সুবোধ দিবারাত্রি বাস করবে উদার নীল আকাশের তলায়। নমস্কার রঞ্জাদেবী, এখন আমরা উঠলুম।'

বসন্ত শোহনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তারপর নিজেই গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'শোহনবাবু, একটা বিষয় আপনি ভেবে দেখেছেন কি?'

— 'কোন বিষয়?' ৪৩৯

— 'এই সাদা সওয়ারের বিষয়? তার নাম সাদা সওয়ার হল কেন?' ৪৪০

— 'হ্যাঁ তার ঘোড়ার রং সাদা, নয়তে সে পরে থাকে সাদা পোশাক।' ৪৪১

— কিন্তু এই সাদা রংটা কি তার পক্ষে বিপজ্জনক নয়? অঙ্ককার রাত্রেও সাদা রং তফাত থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। আমি এই তথাকথিত প্রেতাঞ্জাকে স্বচক্ষে দেখতে চাই।'

১০৩৪৪১

কল্পনা মৃত্যু

১৯৪৪ সালে

১০৩৪৪২

সেই রাত্রে!

ঃঃ-ঃঃ করে রাত বারোটা বেজে গেল, তবু বসন্তের চোখে এল না ঘুম। তাঁর মনের মধ্যে জাগতে লাগল নানা সন্তাননার ইঙ্গিত। যেন আজ একটা কিছু ঘটবেই। বিরক্ত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে তিনি খোলা জানলার কাছে নিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পরিষ্কার রাত্রি, আকাশে উঠেছে অপরিপূর্ণ চন্দ্ৰ। তার স্নান কিরণে চারিদিক হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট ভৌতিক জগতের মতো রহস্যময়।

বসন্ত নিজের মনে মনেই বললেন, 'এমন রাত্রে ভূতের দেখা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

ঠিক তারপরেই তিনি দেখতে পেলেন সাদা সওয়ারকে।

খানিক দূরে আলো-আঁধারির মধ্যে দ্বির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, 'তপোবন'—রঞ্জাদেবীর বাড়ি। আরও খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট একটা জঙ্গল, তার উপরে অঙ্গীকুঞ্জের মুরুট।

তারই সামনে দেখা গেল সাদা সওয়ারকে। বোঝা গেল, তার গায়ের জগাটাই কেবল সাদা, কারণ, তার দেহের নিম্নাধাৰ এবং ঘোড়াটাকে মনে হচ্ছিল যেন কলিব রঞ্জে আঁকা।

বসন্ত দৌড়ে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে রাতে ব্যবহৃত দুরাবিনটা বার করে আনলেন। সাদা সওয়ার যে মুখে মুখোশের মতো একটা কিছু পরে আছে, এ ছাড়া আর কিছু উপলব্ধি করা গেল না। বসন্ত বুলালেন, দূর থেকে আর কোনও তথ্য আবিষ্কার করা চলবে না। তিনি তাড়াতাড়ি আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা জামা ও 'ক্রেপ-সোলের' জুতো পরে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তখন আর দেখা যাচ্ছিল না সাদা সওয়ারকে। কিন্তু সে যে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে তপোবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এটা তিনি উপর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন।

তিনিও অগ্রসর হলেন তপোবনের দিকে এবং মনে মনে বললেন,—আজ একটা কিছু ঘটবে বলে আমার মন প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু যা ঘটবার উপক্রম হয়েছে, সেটা মনে হচ্ছে যেন কোনু রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। এখন দেখতে হবে এর পরিশিষ্টটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কিছুদূরে এগিয়েই তিনি আবার চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে মনে বললেন, আমি বোধহয় সময় নষ্ট করছি। একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাবে, সেটা আগে থাকতে জানা না থাকলে পদবেজে তার অন্সরণ করার কোনওই মানে হয় না।

তাঁর কর্ম সচকিত হয়ে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

সুরু রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে ভেসে এল নারীকষ্টের এক আর্ত চিংকার! চিংকারটা জেগে উঠেই আবার সুরু হয়ে গেল। সমাধিভূমির নীরবতার ভিতর দিয়ে কেটে গেল কিছুক্ষণ। এবং তারপর আবার সেই আর্ত চিংকার এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই উপরি উপরি দুই-দুইবার রিভলভারের শব্দ!

বসন্ত তৎক্ষণাত ভূমিতে স্টান হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং মাটির উপরে কান পেতে শুনতে পেলেন, দ্রুতগতিতে ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ!

একলাক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলেন, রাজা রাধারমণ রায়ের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপরে উচ্চ স্তুপের দিকে দ্রুত ধাবমান সাদা সওয়ারকে। সে অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। বসন্তের মনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এইসব চিন্তা খেলে গেল—নারীকষ্টে আর্তনাদ করলে কে? রিভলভার ছুড়লে কে? সাদা সওয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল কেন? এখন আমি কী করব—ছুটে যাব কি সাদা সওয়ারের পিছনে পিছনে?

আপসা আলো বিতরণ করছিল টাঁদ, হঠাত তাও মিলিয়ে গেল একখানা চলন্ত মেঘের আবরণে। কিছুই দেখা যায় না নিবিড় অন্ধকারে। এখন সাদা সওয়ারকে আবিঞ্চির করা একেবারেই অসম্ভব। নিরূপায় হয়ে তিনি আন্দাজে পায়ে পায়ে অগ্রসর হতে লাগলেন তপোবনের দিকে।

হঠাতে তিনি শুনতে পেলেন কার দ্রুত পদশব্দ। কে বেগে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। তাড়াতাড়ি তিনি রিভলভার বার করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁর খুব কাছে এসেই থেমে এল পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কে কর্কশ শব্দে বলে উঠল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নড়েছ কী শুনি করেছি!

শক্তির নিশ্চাস ফেললেন বসন্ত। এ হচ্ছে সুবোধের কঠস্বর—তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারী সুবোধ।

১৯৩১

১৯৩১

পদক্ষে
মৃতদেহ

pathagar.net

১৯৩১

১৯৩১

কোন নারী অমন করে আর্তনাদ করে উঠল? মনের ভিতরে আবার জাগল এই প্রশ্ন।

সুবোধ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্যার, আপনি কি সাদা সওয়ারকে দেখেছেন? রিভলভার ছুড়লে কে?'

বসন্ত পকেট থেকে 'টি' বাঁব করে মাটির উপরে এখানে ওখানে আলোকপাত করতে লাগলেন। তারপর ফিরে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ওসব কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমাকে আমি কি ওই বাড়ির উপরে পাহারা দিতে বলিনি? দেখতে পাচ্ছ, পথের উপরে ঘোড়ার খুরের দাগ? প্রায় তোমার সামনে দিয়েই সাদা সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছে, আর তুমি কিনা বোকার মতো আমাকে প্রশ্ন করছ?'

অপ্রতিভ তাবে সুবোধ বললে, ‘আমি ঘূমিয়ে পড়েছিলুম, স্যার! হঠাতে কার চিন্কার শনে আমার শুম ভেঙে যায়, তারপর আর একবার শনি সেই চিন্কার আর সঙ্গে সঙ্গে দু-বার রিভলভারের শব্দ।’

—‘তারপর তুমি কী করলে?’

—‘যেদিক থেকে রিভলভারের শব্দ এসেছিল সেইদিকে ছুটে গেলুম।’

বসন্ত বললেন, ‘আমি আগে দেখতে চাই, রঞ্জাদেবী কেমন আছেন। এসো তুমি আমার সঙ্গে।’ তিনি তপোবনের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—পিছনে পিছনে সুবোধ।

বসন্ত বললেন, ‘রঞ্জাদেবীর ঘর কোনটা?’

সুবোধ দোতলার একটা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। বসন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে টচ্চ’র সাহায্যে বাড়ির দেওয়ালটা পরিষ্কা করে দেখলেন, দোতলার ছাদের উপর থেকে একটা বৃষ্টির জল নিকাশের নল বাড়ির নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেই নলের পাশেই দেখা যাচ্ছে দোতলার ঘরের একটা খোলা জানলা। বসন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে সেই নলটা অবলম্বন করে দোতলার জানলার কাছে গিয়ে কার্নিশে পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জানলা দিয়ে উকি মারলেন ঘরের ভিতর দিকে।

স্তুক ঘর, ঘৃট্যুট করছে অঙ্ককার। হঠাতে বসন্তের ভয় হল, ঘরের ভিতরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে হয়তো কোনও রক্তাক্ত দৃশ্য। পরমুহূর্তে টর্চ’টা টিপে তার আলোকে তিনি দেখলেন, অর্ধেক্ষিত অবস্থায় বালিশের উপরে হেলান দিয়ে আছে—রঞ্জা।

বসন্ত বললেন, ‘শ্বমা করবেন, আমি অত্যন্ত ভয় গেয়েছিলুম।’

রঞ্জা বললে, ‘জানলার বাইরে মানুষের মূর্তি দেখে আমিও কম ভয় পাইনি। কিন্তু ব্যাপার কী?’

—‘একটু আগেই সাদা সওয়ার এইখান দিয়ে গিয়েছে। কে দুই-দুইবার রিভলভার ছুড়েছে। আমার সদেহ হয়েছিল, হয়তো আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন।’

—‘না বসন্তবাবু, আমার কোনওই বিপদ হয়নি।’

—‘সুসংবাদ! তাহলে আবার আমি অদৃশ্য হলুম।’

বসন্ত নল বয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলেন, রঞ্জার কঠের কৌতুকহাস্য।

সুবোধ শুশ্রোতে, ‘কোনও দুর্ঘটনা হয়নি তো?’

—‘না।’ এমন গভীর স্বরে বসন্ত ‘না’ বললেন যে, সুবোধ আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলে না।

পরের দিন সকালে বসে শোহনলালের সঙ্গে চা পান করতে করতে বসন্ত একটিও কথা কইলেন না।

হঠাতে বাড়ির নীচের শোনা গেল একখানা মোটরের শব্দ। কে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ‘বসন্তবাবু আছেন?’

বসন্ত বাইরের বারান্দায় গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মোটরের উপরে বসে আছে—শ্যামল।

—‘কী ব্যাপার?’

শ্যামল বললে, ‘আমি আপনারই খোঁজে এসেছি। একবার আমার গাড়িতে এসে উঠবেন কি? পাদরি বিনয়বাবুর মুখে শুনতে পাবেন একটা অদ্ভুত গল্প। রহস্যময় কাণ্ডকারখানা।’

বসন্ত তৎক্ষণাত্ দ্রুতপদে নেমে শ্যামলের মোটরে গিয়ে বসলেন। মোটর বিনয়বাবুর গির্জাসংলগ্ন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মোটরের শব্দ পেয়ে বিনয়বাবু বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বয়সে তিনি প্রোট, মুখে দাঢ়ি-গোঁফ, চক্ষের ভাব নিরতিমান।

শ্যামল বললে, ‘বিনয়বাবু, আপনি কাল রাত্রে কী শুনেছেন, এর কাছে বলতে পারেন।’

বিনয়বাবু বললেন, ‘কাল রাত্রে আমার চোখে ঘূম আসেনি। বাড়ির বারান্দায় আমি পায়চারি করছিলুম। তারপর হঠাতে শুনতে পেলুম কোনও স্তুলোকের চিংকার। তারপর আরও একবার হল চিংকার আর দুইবার রিভলভারের শব্দ।’

এসব বসন্তেরও অজ্ঞান নয়। তিনি শুধোলেন, ‘তারপর?’

—‘তারপর দেখতে পেলুম আমি সাদা সওয়ারকে। তপোবনের দিক থেকে সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে চলে গেল ওই পুরোনো ধৰ্মস্তুপটার দিকে।’

—‘প্রথম আর দ্বিতীয় বারের চিংকার শুনে আপনার কিছু মনে হয়েছিল কি?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটো চিংকার দু-রকম। প্রথম চিংকার শুনে মনে হল, হঠাতে কে যেন বিশ্বায়ে চমকে উঠেছে। আর দ্বিতীয় চিংকারটা হচ্ছে দন্তরমতো আতঙ্কজনক।’

—‘যে চিংকার করেছিল, সে কে তা অনুমান করতে পেরেছেন?’

—‘হ্যাঁ, সে নারী।’

—‘কীরকম নারী? বৃদ্ধার আর তরুণীর কষ্টস্বর এক রকম হয় না।’

—‘যে চিংকার করেছিল, নিশ্চয়ই সে তরুণী।’

শ্যামলের দিকে ফিরে বসন্ত বললেন, ‘শ্যামলবাবু, এখানে কাছাকাছি তরুণী বলতে তো আছেন কেবল রঞ্জাদেবী?’

শ্যামল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে কোনও কথা কইবার আগেই সেখানে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে হাজির হল গ্রামের এক চৌকিদার। সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, ‘হজুর, খুন! একটা মানুষের লাশ পাওয়া গিয়েছে।’

বসন্ত বললেন, ‘আমি এইরকমই কোনও খবর পাব বলে আশা করছিলুম। কে খুন হয়েছে?’

—‘জানি না হজুর! তাকে আমি চিনি না। ছিদামকে আপনি জানেন না; এখানে তার মুদির দোকান আছে। ভিন-গাঁ থেকে নেমস্তু খেয়ে কাল সে অনেক রাতে বাসায় ফিরে আসছিল। সোজা পথ না ধরে আসছিল আমবাগানের ভেতর দিয়ে, কারণ ওই-দিক দিয়েও তাড়াতাড়ি এখানে পৌছোনো যায়। কিন্তু আমবাগানের ভেতর দিয়ে আসতে হঠাতে তার পায়ে ফুটে যায় একটা কাঁটা।’

অধীর কষ্টে ধৰক দিয়ে বসন্ত বলে উঠলেন, ‘কার পায়ে কাঁটা ফুটল কি ফুটল না, আমি শুনতে চাই না সেসব কথা। যা বলবে সোজাসুজি বলো।’

চৌকিদার থতমত খেয়ে বললে, ‘হ্যাঁ হজুর, তাই বলছি। ছিদামের পায়ে তো কাঁটা ফুটল, সে আর চলতেই পারে না। সেইখানে ছিল অন্দাবুড়ির ভাঙা কুঁড়েঘর। বুড়ি মরে যাবার পর থেকে সেঘরে আর কেউ থাকে না। ছিদাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে—’

বসন্ত ক্রুদ্ধকষ্টে বললেন, ‘তোমার নিকুঠি করেছে। ছিদাম ঘোড়াছিল কি না, আমি তা জানতে চাই না। সেই কুঁড়েঘরে গিয়ে সে ঢুকেছিল, এই বলতে চাও তো?’

হাত জোড় করে চৌকিদার বললে, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ হজুর! ছিদাম সেই ঘরে ঢুকে পায়ে কী ফুটেছে দেখবার জন্মে জাললে একটা দেশলাইয়ের কাঠি। তারপর সে কী দেখলে, জানেন হজুর?’

—‘হ্যাঁ, সে দেখলে একটা লাশ, এই বলতে চাও তো?’

—‘হ্যাঁ হজুর, ঠিক ধরেছেন। সে দেখলে—’

চৌকিদারকে বাধা দিয়ে প্রায় গর্জন করে বসন্ত বললেন, ‘আমিও সেই লাশটাকে দেখতে চাই। আর কোনও কথা না বলে এখনই আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো।’

আমবাগান। নড়বড়ে ভাঙা কুঁড়ে। মাটির উপরে চিত হয়ে পড়ে আছে একটা পুরুষের মৃতদেহ। তার দৃষ্টিহন দৃষ্টিতে ভীষণ আতঙ্কের চিহ্ন। তার জামার বুক পক্ষেটের উপরটা রক্তরাগে আরঙ্গ। এবং তার কঠদেশে একটা রক্তাত্মক গভীর ক্ষতচিহ্ন। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই।

তাকে চিনতে পারলেন বসন্ত। সে কখনও জেল খাটেনি বটে, তবে পুলিশ তাকে একজন বড়ো অপরাধী বলেই জানে। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়েও আজ সে ফাঁকি দিতে পারলে না কোনও এক অজ্ঞাত হত্যাকারীর রিভলভারকে। সে হচ্ছে চন্দ্রকান্ত চন্দ্র।

প্রচ্ছন্ন

‘শাহজান মাস কৃত্রিম পুরুষ ষষ্ঠি মুহূর্তে
উক্ত মৃত্যু মৃত্যু হ্যাঁ বাদামি রঞ্জের ঘোড়া
শোহনলাল ঘরের ভিতরে বসে একমনে সংবাদপত্র পাঠ করছিল।
এমন সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে শ্যামল বললে, ‘আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।
শীঘ্র চলুন।’
—‘কোথায়?’
—‘আমবাগানে, ভাঙা কুঁড়েঘরে। কাল রাত্রে সেখানে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে।’
শুনেই শোহনলাল আর দ্বিক্ষিণ না করে শ্যামলের সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।
বসন্ত একটা উচ্চ চিপির উপরে একলা বসে সিগারেটের ধূমপান করছিলেন। শোহনলালকে দেখে মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ‘আমি দেহটা পরীক্ষা করে দেখেছি। এইবারে আপনি আর একবার পরীক্ষা করে বলুন দেখি আপনার মতামত কী।’

শোহনলাল হাঁট শেডে বসে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহটাকে দিকে তাকিয়ে রাইল কিছুক্ষণ। তারপর দেহটাকে উলটে ফেলে মাটির দিকে তাকিয়ে বললে, ‘অতি তায়ীর প্রথম গুলিতেই এর মৃত্যু হয়েছে। তারপর আবার করা হয়েছে মড়ার উপরে দ্বিতীয় আঘাত।’

শ্যামল শুধোলে, ‘কোনটা প্রথম আঘাত কেমন করে আপনি জানতে পারলেন?’

—‘মাটির উপরের এই গর্তটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, রিভলভারের গুলি এর বক্ষ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে মাটির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। সুতরাং ভূপতিত অবস্থায় এর বুকের দিকে রিভলভার ছোড়া হয়েছিল। আর একটা গুলির দাগ রয়েছে এর কঠদেশের উপরে, কিন্তু এর গলার তলায় মাটির উপরে কোনও গর্ত নেই। সুতরাং লোকটা যখন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে গুলি করা হয়েছে তখনই।’

বসন্ত সম্মতিসূচক মন্ত্রকান্দোলন করে বললেন, ‘ঠিক, আমারও ওই ধারণা। লোকটাকে চিনতে পারছেন কি?’

—‘হঁ, চন্দ্রকান্ত। কিন্তু একে হত্যা করবার কারণ কী হ’

—‘কারণ থাকতে পারে অনেক। এইবাবে বাহিরে বেরিয়ে আসুন।’

কুটিরের পিছনের দরজা দিয়ে বাহিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বসন্ত বললেন, ‘মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন।’

নরম মাটির উপর রয়েছে অদ্ভুত এক রকম ছাপ। সেই ছাপগুলো লম্বায় বারো ও চওড়ায় চার ইঞ্চি। কৌতুহলী স্বরে শোহনলাল বললে, ‘কী ওগুলো?’

—‘জুতোর তলায় কেউ ছোটো ছোটো দুখানা কাঠের তত্ত্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। তিনি দিন আগে এখানে খৃষ্টি পড়েছিল। সে জানত আমবাগানের ছায়ায় মাটি থাকবে ভিজে, আর সহজেই তার পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে। সেইজন্যেই সে এই অভিনব কৌশলটি অবলম্বন করেছিল। এখন আসুন।’

ছাপ ধরে সবাই এগিয়ে চলল। আমবাগান থেকে বেরিয়ে যেখানে শ্যামলের লাল গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল, তারা যখন সেইখানে গিয়ে পড়ল, তখন বড়ো রাস্তার উপরে আর কোনওই ছাপ পাওয়া গেল না।

বসন্ত বললেন, ‘যে দুখানা তত্ত্বা দিয়ে তার পদচিহ্ন ঢেকে ফেলা হয়েছে, সে নিশ্চয়ই সে দুটো সঙ্গে করে নিয়েই এখান থেকে সরে পড়েছে।’

শোহনলাল বললে, ‘খালি তো বলছেন, সে, সে আর সে! কিন্তু কে সে? সাদা সওয়ার?’

—‘কেমন করে আমি তা জানব? দেখতেই পাচ্ছেন তো, এখানে রয়েছে দুই ‘সেট’ ছাপ। কেউ এখান থেকে আমবাগানের ভিতরে গিয়েছে, তারপরে কাজ সেবের আবার ফিরে এসেছে। হতে পারে সে সাদা সওয়ার, হয়তো তার ঘোড়াটাকে রাস্তার উপরে রেঞ্চ সে গিয়েছিল আমবাগানের ভিতরে। আবার হতে পারে সে অন্য কোনও লোক। তবে দুটো শুলিই যে চন্দ্রকান্তকে লক্ষ্য করে একজন লোকের দ্বারা ছোড়া হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু সে যে কে, তা আমি জানি না। কাল রাত্রে এখানে রঞ্জাদেবীর আবির্ভাব হয়েছে শুনলেও আমি কি ছুমাত্র বিস্মিত হব না।’

সচকিত কষ্টে শোহনলাল বললে, ‘তার মানে?’

বসন্ত বললেন, ‘কাল রাত্রে এখানে কোনও তরণীর আর্ত চিংকার শোনা গিয়েছিল। তারপর গভীর রাত্রে রঞ্জাদেবীকে আমি জাগ্রত অবহায় দেখেছি। এটা বেশ অস্বাভাবিক নয় কি?’

শ্যামল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, ‘এ হচ্ছে অত্যন্ত অন্যায় ইঙ্গিত।’ তার দুই চমু প্রদীপ্ত।

কয়েক সেকেন্ডের ভ্রক্তা। তারপর বসন্ত শাস্ত কষ্টেই বললেন, ‘ত্বরিত হবেন না শ্যামলবাবু। এখানে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, আমি একটা ইন্দুরকেও ধরে ফাঁসি দিতে পারি।’

শ্যামল আর কিছু না বলে নিজের গাড়িতে চড়ে চলে গেল।

শোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত আবার আমবাগানের ভিতরে ঢুকে মাটির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চারিধারে ঘূরে বেড়াতে লাগলেন। এখানে ওখানে পাওয়া গেল কতকগুলো জুতোর দাগ। উঁচু-‘হিল’ মেয়েদের জুতোর দাগ। আরও কতকগুলো জুতোর দাগ পাওয়া গেল, পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, সেগুলো হচ্ছে চন্দ্রকান্তের পদচিহ্ন।

বিনয়বাবু প্রশ্ন করলেন, ‘কী বললে, বসন্তবাবু সন্দেহ করেন রঞ্জাদেবীকে?’

শ্যামল বললে, ‘হ্যাঁ, এটা ভাবলেও আমার রাগ হয়।’

বিনয়বাবু বললেন, ‘তুমি অধীর হয়ো না শ্যামল। এসব কথা নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাতে পারছি না, আমার হাতে অনেক কাজ আছে। তুমি এখন বাসায় শাও।’

শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘সমস্ত দেখে-শুনে আমার কেমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সঙ্গীত, এখন আমি চাই সঙ্গীত! রঞ্জাদেবীর বৈঠকখানায় একটা পিয়ানো দেখেছি। চলন্তু আমি সেইখানে।’

শ্যামল জলে গেলে পরে বিনয়বাবু স্তন্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর গাত্রোখান করে অগ্রসর হলেন বাড়ির ভিতর দিকে।

রামাধরের পাশেই ভাঙ্ডারঘর। সেই ঘরে চুকে একটা জালার ভিতর থেকে জই বার করে রাখতে লাগলেন মাঝারি আকারের একটা বালতির ভিতরে। তারপর বালতিটা তুলে নিয়ে তিনি বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে ছিল একটা ‘গের্যাজ’। মোটর রাখবার জন্যে ঘরখানা তিনি তাড়া দিয়েছিলেন শ্যামলকে।

পক্ষেটের ভিতর থেকে চাবি বার করে তিনি ‘গের্যাজে’র দরজাটা খুলে ফেললেন। ভিতরে তখন শ্যামলের মোটর ছিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে গেলেন পিছনের দেওয়ালের দিকে। কাঠের দেওয়াল। তার মাঝারিকি জায়গায় লাগানো আর-একটা কুলুপ। চাবি দিয়ে কুলুপ খুলে দুই হাতে দেওয়ালটা ধরে দু-দিকে টানতেই উপর দিকে দুখানা তত্ত্ব দুই পাশে সরে গেল। তারপরেই দেখা গেল দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বাদামি রঙের খুব শক্তিশালী ঘোড়া।

বিনয়বাবু তার কঠিনেশে আদর করে দু-তিনবার করায়াত করলেন এবং তারপর বালতির জইগুলো ঘোড়ার সামনে রাখা একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আবার সমস্ত বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন।

বিনয়বাবু ধীরে সুন্ধে অগ্রসর হতে লাগলেন আমবাগানের দিকে—মাটির উপরে রেখে তীক্ষ্ণাদৃষ্টি।

আবার সেই ভাঙ্ডার কুঁড়েঘর। তিনি তার চারপাশে এক চক্র ঘূরে এলেন, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। সেখানে মাটির উপরে রয়েছে মেয়েদের জুতোর দাগ। এবং সেইসঙ্গেই দেখা গেল একটা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে নিজের মনেই বললেন, ‘বড়োই অন্যায়, বড়োই অন্যায়! এমন অসাবধানতা অমাজনীয়।’ তিনি সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর অতি সাবধানে মাটির উপর থেকে সেই খুরের দাগটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘পুলিশের লোকেরা এ চিহ্নটা দেখতে পেয়েছে কি? বোধহয় পায়নি।’

তত্ত্বাব্দী

পিয়ানোর উপরে সচল শ্যামলের দুই হাতের নিপুণ অঙ্গুলি করছিল সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি।

হঠাৎ পিয়ানোর উপরে এসে পড়ল কার ছায়া। শ্যামল মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘রঞ্জা, তোমার জন্যে চা আর খাবার আনবার হস্তুম দেব কি?’

রঞ্জা বললে, ‘আমার এখানে এসে আপনি দেবেন চা আর খাবার আনবার হস্তুম? শ্যামলবাবুর জন্যে

এরকম কৌতুক পরিপাক করা সহজ নয়। আপনি আমাকে না জানিয়েই আমার বৈঠকখানায় এসে পিয়ানো বাজাতে শুর করে দিয়েছেন কেন?’

চেয়ারসুন্দ ঘুরে বসে শ্যামল বললে, ‘শোনো রঞ্জা, আমি শ্যামলবাবু নই, তোমার কাছে আমি হচ্ছি শুধু শ্যামল।’

রঞ্জা বললে, ‘আপনির কাছে আমি শুধু রঞ্জা নই, ভবিষ্যতে আমাকে রঞ্জাদেবী বলে ডাকলেই খুশি হব। একেবারেই এটা ঘনিষ্ঠতা কেন? এক ইঞ্চি আগেও আপনাকে আমি চিনতুম না, আপনার নাম পর্যন্তও জানতুম না।’

শ্যামল বললে, ‘তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয় আজ পঁচিশ বছর ধরে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করছি। এই আনন্দময় একটি সপ্তাহকেই আমার মনে হচ্ছে পঁচিশ বৎসরের মতো সুনীর্ধ।’

রঞ্জা বললে, ‘আপনি কথা বন্ধ করুন, আবার বাজনা শুরু করুন। আপনার বাজনা আমার ভালো লাগছে।’

সকালের কাঁচা সোনালি রোদ জানলার ভিতর দিয়ে রঞ্জার মুখের উপরে এসে পড়েছিল। শ্যামলের মনে হল, রঞ্জা হচ্ছে একটি পবিত্র ও শুভ হোমশিখ। সে আবার চেয়ারসুন্দ ঘুরে বসে বললে, ‘তথাস্ত! তোমার আদেশে আবার আমি অবলম্বন করলুম আমার প্রিয়তম পিয়ানোকে।’

পিয়ানো আবার মুখের হয়ে উঠল। তার সপ্তপ্রামের ভিতর দিয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল যেন অপূর্ব সুর-সুরধূনির বিচিত্র ধারা। রঞ্জা বুঝতে পারলে, শ্যামল হচ্ছে একজন অসাধারণ সঙ্গীত শিল্পী। সে অবাক হয়ে তার সঙ্গীতে তথ্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাতে বাজনা বন্ধ করে শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘সুন্দর প্রতাত, সুন্দর সূর্যালোক! চলো রঞ্জা, আমরা একবার নীলাকাশের তলায় পদচালনা করে আসি।’

রঞ্জা বললে, ‘আপনি নেই।’

তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর গ্রাম্যপথ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল লক্ষ্মীনীরের মতো।

ঠিক সেই সময়েই শোহনলালকে নিয়ে বসন্ত গিয়েছিলেন রঞ্জার প্রতিরোধী ভূবনচন্দ্ৰ বিশ্বাসের বাসায়। ভূবনবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বসন্ত দেখতে পেলেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে শ্যামল ও রঞ্জা।

যতক্ষণ দেখা যায়, বসন্ত নির্নিময়ে নেত্রে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘নমফার ভূবনবাবু! আপনার সঙ্গে পরিচয় তো হলুঁ প্রথম আমরা বিদায় হই।’

বাইরে এসে বসন্ত কোনও কর্ত্তা কইলেন না। তাঁর মনের ভিতরে ক্রমাগত জেগে উঠেছে শ্যামলের মুখ—যেন সে একটা মৃত্তিমান সমস্যা।

প্রায় বাসার কাছ বরাবর এসে বসন্ত হঠাত নিঙ্গৰ উরুদেশে চপেটায়াত করে বলে উঠলেন, ‘মনে পড়েছে, এতক্ষণ পরে মনে পড়েছে!’

শোহনলাল সকৌতুকে বললে, ‘কী মনে পড়েছে? আপনার গত জন্মের কাহিনি?’

—‘আমার মনে পড়েছে শ্যামলের কথা। যেখানেই হোক, আগে আমি নিশ্চয়ই কোথাও ওই শ্যামলকে দেখেছি! প্রথম দিনে তাকে দেখেই আমার এই কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।’

বাসায় ফিরে এসেই বসন্ত কলকাতায় পুলিশ ক্রমিকারের কাছে শ্রেণণ করলেন একটি জরুরি তারবার্তা।

বন্দ সংযোগ

জন্ম আ

চলাচল

ত্বরণ

মুক্তি প্রদান করা হবে

মুক্তি

ক্ষেত্র প্রদান

চাকত ক্ষোভ করা

সন্তুষ্ম

প্রোটোকল প্রদান করা হবে

রাত্রির বিভীষিকা

রাধাপুরের বাসিন্দাদের কাছে ভুবনবাবু হচ্ছেন একটি রহস্যময় মানুষ। লোকে তাঁকে ছিটগেস্ট ও প্রায়-পাগল বলেই ধরে নিয়েছে।

এর কারণও আছে। তিনি প্রায় সারাদিনই নিজের বাড়ির ভিতরে বসে থাকেন। তিনি এখানে আসবার পর কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিল। তিনি কারুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু নিজেকে এমন আলাদা করে রেখে কথা কয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার আলাপ করবার জন্যে কারুরই আগ্রহ হয়নি।

বাড়ির একটি ঘরে আলমারির পর আলমারিতে সাজানো ছিল তাঁর নানা শ্রেণির পুস্তক। এবং আর-একটি ঘরে ছিল তাঁর রসায়নাগার। পুস্তক ও রসায়নাগারে পরীক্ষা নিয়েই কেউ যেত তাঁর অধিকাংশ সময়। সাধারণ লোকের আজেবাজে কথা শোনবার জন্যে তাঁর কোনওই কোতুহল ছিল না। নিজের কাজের মধ্যেই তিনি থাকতেন সমাহিতের মতো।

তাঁর দেহ হাট্টপুষ্ট, বয়সও পঞ্চাশের কম হবে না। সর্বদাই তাঁর মুখ হয়ে থাকত অত্যন্ত ভাবহীন, মুখ দেখে তাঁর মনের কথা কেউ আন্দাজ করতে পারত না।

যেদিন চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের মৃতদেহে আবিষ্কৃত হয়, সেইদিনই ডাকপিয়ন তাঁর হাতে দিয়ে গেল একটি পার্মেল। পার্মেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, ভিতরে কী আছে তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না।

চট্টে-জড়নো একটি ‘কার্ডবোর্ডের’ বাক্সের ভিতর থেকে বেরল একটা অটোম্যাটিক রিভলভার—মিছুর তার মীল ইস্পাতের রং। সেইসঙ্গে ছিল পরিচিত হস্তাক্ষরের লেখা একখানা পত্র।

তিনি চিঠিখানা একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করলেন, তাবগ্র দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সেই পার্মেল ও ‘কার্ডবোর্ডের’ বাক্স প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তাঁর চক্ষের সামনেই সব ভঙ্গীভূত হয়ে গেল।

সেইদিনই মধ্যরাত্রে কালো পোশাক ও হাতে কালো দস্তানা পরে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাড়ির বাইরে। রিভলভারটা পকেটে নিয়ে যেতে ভুললেন না। অগ্রসর হলেন তপোবনের দিকে। সেখানে পৌছে বাগানের ভিতরে ঢুকে সন্তর্পণে পা ফেলে ঘোপের পর ঘোপের ভিতর দিয়ে এগুতে এগুতে তিনি শুনতে পেলেন দুই ব্যক্তির কঠস্বর।

চন্দ্রকান্ত যেদিন নিহত হয়, সেইদিন থেকেই রত্নার বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে বসন্ত নিযুক্ত করেছেন আরও একজন লোককে। তাঁর নাম মন্থ।

একটা ঘোপের ভিতর থেকে উকি মেরে ভুবন দেখতে পেলেন, খানিক তফাতে দুটো জুলন্ত সিগারেটের দীপ্তি—পুলিশের দুই প্রহরীই জাগ্রত!

শুনতে পেলেন, একজন বলছে, 'এ যেন ভূতড়ে ব্যাপার! সব সময়েই তটস্থ হয়ে থাকতে হয়! গাছের একটা পাতা নড়ল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল তেমার বুক! প্রত্যেক ঝোপটাকেই যেন মনে হয় এক-একটা মানুষ!'

আর-একটা লোক দার্শনিকের মতো বললে, 'উপায় নেই, যে-পূজায় যে-মন্ত্র। তার চেয়ে তুমি একটু ঘূর্মোবার চেষ্টা করো, আমি একবার চারিদিকটা ঘূরে আসি!'

ভুবন দেখলেন একটা লোক গাছের তলায় লম্বা হয়ে শয়ে পড়ল এবং আর-এক ব্যক্তি আর-একদিকে চলে গেল ছায়ামূর্তির মতো!

বাগানের মাঝখানে বাঢ়ি। কোথাও কোনও সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত নেই দেখে এগুতে লাগলেন তিনি পায়ে পায়ে। চাঁদের আলো স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু দোতলায় রঞ্জাদেবীর ঘর কোনখানে সেটা আন্দজ করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

ভুবন পক্ষেটের ভিতর থেকে রিভলভার বার করে রঞ্জার ঘরের সিলেক্টেইচন তুলে ঘোড়াচিপে দিলেন!

ক্রম!

প্রথম গুলিতে বন বন শব্দে কাতের শার্সি ভেঙে পড়ল। আরপরেই তেমার হাতে প্রকট চিৎকাৰ এবং সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক ব্যক্তির দ্রুত পদশব্দ!

ক্রম, ক্রম, ক্রম!

—'ওখানে কে? মন্থ? মন্থ?' চিৎকাৰ করে উঠল সুবোধ।

—'মন্থ, মন্থ!'

—'এই যে, আমি এইদিকে!'

দুইজন গোয়েন্দাই পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। হাতে তাদের রিভলভার।

উপর থেকে নারীকষ্টে শোনা গেল—'সুবোধবাবু, সুবোধবাবু!'

সুবোধ বাড়ির দিকে ছুটে গিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, 'রঞ্জাদেবী, আপনি? আপনার গায়ে গুলি লাগেনি তো?'

—'না, আমার কিছু হয়নি। কিন্তু রিভলভার ছুড়ে কে?'

—'কে যে ছুড়ে জানি না, কিন্তু আমরা নই। আপনি ঘরের ভিতরে দিকে সরে যান, আবার কেউ গুলি ছুড়লে আপনি আহত হতে পারেন।'

কিন্তু সেদিন আর-কেউ গুলি ছুড়বে না। কারণ, সুবোধ মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে পেলে একটা উত্তপ্ত রিভলভার!

সে 'ম্যাগাজিন' টা বার করে দেখে বললে, 'কেউ তাড়াতাড়ি পালাবার সময় রিভলভারটা এখানে ফেলে গিয়েছে। চারবার গুলি ছোড়া হয়েছে। ভিতরে এখনও দুটো গুলি রয়েছে। তুমি কারকে দেখতে পাওনি?'

মন্থ বললে, 'বিশেষ কারকে নয়। কেবল মনে হল যেন, একটা ছায়া সাঁৎ করে চলে গেল গাছের আড়ালে। চলো, ভালো করে খুঁজে দেখি।'

কিন্তু তন্মত্ব করে খুঁজেও বাগানের ভিতর আর কারুরই পাতা পাওয়া গেল না।

বসন্তের চোখে তখনও ঘূর আসেনি। সেই সময়ে রিভলভারের প্রথম আওয়াজটা উন্নেই-তিলি

চমকে উঠে খাটের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়েই শুনতে পেলেন আবার তিনবার রিভলভারের গর্জন।

তিনি দ্রুত ছুটতে লাগলেন তাপোবনের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন আর-একজন লোকেরও দ্রুত পদশব্দ।

নিজের রিভলভারটা বার করে বসন্ত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে ওখানে?’

উত্তেজিত কষ্টে উত্তর হল—‘আমি শ্যামল। রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে আসছি।’

দূজনেই একসঙ্গে ছুটতে লাগলেন। তারপর হঠাত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামলের একখানা হাত ছেঁপে ধরে বসন্ত বললেন, ‘পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?’

শ্যামল নির্দেশমতো তাকিয়ে দেখলে।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝাপসা। তবু ছায়ামূর্তির মতো দেখা গেল সাদা সঙ্কুলকে। দ্বিরের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে সে দূরে—আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

অস্পষ্ট
চাঁদের আলোয়
সাদা সঙ্কুল
কে দেখে যাচ্ছে।

পরদিনের প্রভাতি চায়ের আসরে টেবিলের তিনি দিকে বসেছিলেন বসন্ত, শোহনলাল ও শ্যামল।

বসন্ত বললেন, ‘সমস্ত ব্যাপারটাই নিরেট বোকামি বলে মনে হচ্ছে। একটা তথাকথিত প্রেতাষ্মা এখানে প্রধান নায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে যে কোনও অপরাধ করেছে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি। একদিন এক নারীর চিংকার শোনা গিয়েছে, আর মারা পড়েছে চক্রকাস্ত। তারপর কালকের রাত্রের ঘটনা। রঞ্জাদেবীর উদানে হয়েছিল এক অনাহত ভদ্রলোকের আবির্ভাব—সেই যে সাদা সওয়ার, একখা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু সে প্রথম শ্রেণির গর্দভের মতো রঞ্জাদেবীর ঘরের জানলা লক্ষ্য করে উপর-উপরি চারবার ছুড়েছে রিভলভার। সে নিশ্চয়ই জানত, নীচে থেকে অমন করে গুলি ছুড়ে ঘরের কারককেই হত্যা করা যাবে না। তারপর রঞ্জাদেবী যখন নিজেই জানলার সামনে এসে দেখা দেন, তখনও তার রিভলভারের ভিতরে দুটো গুলি অবশিষ্ট ছিল। তবু সে গুলি ছোড়েনি, বরং ইচ্ছা করেই আমাদের উপরাক দিয়ে গিয়েছে তার রিভলভারটা। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, রঞ্জাদেবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তার ছিল না। তবু পুলিশের হাতে প্রেস্তার হবার ঝুঁকি নিয়ে এই পশ্চাত্ম আর চার-চারটে বুলেট নষ্ট করা কেন? হয়তো সে নির্বোধ নয়। হয়তো সে নতুন কোনও চক্রাস্তের আয়োজন করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই নতুন চক্রাস্তটা কী?’

শ্যামল শুধোলে, ‘এ সমস্কু আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারেননি?’

—‘হয়তো কোনও কোনও কথা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু সেই আন্দাজের উপরে নির্ভর করে আপাতত কিছুই করতে পারিনি।’

—‘এই সাদা সওয়ার যে কে, সে কথা আপনি বলতে পারেন?’

—‘হয়তো বলতে পারি, কিন্তু তাও বলবার সময় এখনও হয়নি।’

শ্যামল রাগত স্থরে বললে, ‘আপনারা যদি এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, তাহলে রঞ্জাদেবী

যে-কোনও দিন সমূহ বিপদে পড়তে পারেন, সেটা বুঝতে পারছেন কি?’ ১৯১৫ চার্ট

শোহনলাল বললে, ‘ব্যস্ত হবেন না, শ্যামলবাবু। বসন্তবাবু এখন নিকপায়। কারকে প্রেপ্তার করবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। ধৰন, সাদা সওয়ারের কথা। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ঘোড়ায় চড়ে সে মৈশনর্মণ করে! এটা তার খুশি বা খেয়াল। এজন্যে কেউ তাকে প্রেপ্তার করতে পারে না। প্রেপ্তার করলেও বিচারে সে মৃত্তি পাবে আর সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা প্রহসন।’

বসন্ত গাত্রোখান করে বললেন, ‘চলুন, আমরা রঞ্জাদেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।’

রঞ্জাদেবী তার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পাঠ করছিল। পদশব্দ শুনে সে মুখ ঝুঁজে দেখলে। তার ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য।

বসন্ত বললেন, ‘নমস্কার, রঞ্জাদেবী। আপনি বহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুশি হলুম।’

রঞ্জা বললে, ‘কাল রাত্রে আমি চমকে গিয়েছিলু বটে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু হ্যানি। স্মৃতি রিভলভার নিয়ে এই ছেলেখেলা করার কারণটা আমি ধরতে পারছি না।’

—‘আমারও ওই অবস্থা। আপনার বাড়িতে দুখানা অতিরিক্ত ঘর আছে কী?’

রঞ্জা বিশ্বিত কষ্টে বললে, ‘তা আছে। কিন্তু আপনার ওই অসুস্থ প্রশ্নের অর্থ কী?’

—‘বিনা আমন্ত্রণেই শোহনলালকে নিয়ে আমিও আপনার বাড়িতে বাস করতে চাই। আজ থেকেই। কালকের রাত্রের ঘটনার পর আমার ভয় হচ্ছে, যে-কোনও মৃহূর্তেই আপনি বিপদে পড়তে পারেন। ঘটনাহলে সর্বাঙ্গ উপস্থিতি থাকলে আমরা ভালো করে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারব। আপনার মত কী?’

রঞ্জা বললে, ‘আমার কোনও আগভিটি নেই। বরং আপনাদের কাছে পেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।’

বসন্ত বললেন, ‘এইবারে আপনার বাবার গুপ্তধনের কথা। গুপ্তধন যে কোথায় আছে, আপনি তা জানেন। এইবারে তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?’

—‘গুপ্তধন যেখানে আছে সেইখানেই থাক। আমি তা স্পর্শ করতে বা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই।’

রঞ্জার কঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

বসন্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘উত্তম! কিন্তু আমরা আজ থেকেই যে আপনার অতিথি হব, এটা যেন ভুলে যাবেন না।’

বসন্তের সঙ্গে শোহনও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। শ্যামল কিন্তু সেইখানেই থেকে গেল।

ডাকঘরের সামনে হাঠাঠি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভুবনবাবুর। তিনি হাস্যমুখে নমস্কার করে বললেন, ‘এই যে, আপনারা তপোবন থেকে আসছেন বুঝি? কালকের গুলিবর্ষণের ব্যাপারটা আমারও কানে উঠেছে।’

মৃদুস্বরে বসন্ত বললেন, ‘তাই নাকি?’

—‘কেবল তাই নয়, কাল খুব কাছ থেকেই সাদা সওয়ারকে আমি দেখতে পেয়েছি।’

—‘আপনি কিছু লক্ষ করতে পেরেছেন কি?’

—‘হ্যাঁ, লক্ষ করেছি অসুস্থ একটা ব্যাপার। তাকে এত কাছ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে,

তাড়াতাড়ি আমি বাড়িতে ছুটে আসি। অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক ঘূর্ণে ভূত-প্রেত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু আমার চোখের সামনেই ঘটেছে একটা আজব ঘটনা। স্পষ্ট দেখলুম, সাদা সওয়ার হঠাতে তার ঘোড়া থামিয়ে পথের উপরে নেমে পড়ল। কিন্তু তার পরমুহূর্তে যা হল, আপনারা হয়তো সেকথা বিশ্বাস করবেন না। সাদা সওয়ার মাটির উপরে পদার্পণ করেই একেবারে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।'

—‘তারপর?’

—‘আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এমন অলৌকিক কাণ্ড জীবনে আর কখনও দেখিনি। তারপর আবার এক অন্তর্দৃত দৃশ্য। সাদা সওয়ার আবার দেখারণ করে একলাফে ঘোড়ার উপরে উঠে বসল, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল পথের মোড় ফিরে। কিন্তু তখনও দূর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলুম দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ।’

বসন্ত বললেন, ‘আশ্চর্য কথা বটে। আচ্ছা, সাদা সওয়ার যেখানে ঘোড়ার উপর থেকে নেমেছিল, আমাদের সেইখানে নিয়ে চলুন তো।’

কিছুক্ষণ পদচালনার পর হঠাতে দাঁড়িয়ে পড়ে ভূবনবাবু বললেন, ‘সে ঘোড়া থেকে নেমেছিল ঠিক এইখানেই।’

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বসন্ত দেখতে পেলেন, পথের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ঘোড়ার পায়ের নাল।

সেটা হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বসন্ত বললেন, ‘ঘোড়ার পায়ের নাল যে খুলে গিয়েছে, সাদা সওয়ার নিশ্চয়ই তা টের পেয়েছিল। তার ঘোড়া থেকে নামবার কারণটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু তার অন্তর্ধান আর পুনরাবৃত্তাবের কোনও হিসিসই আমি খুঁজে পাইছি না।’

১৩৩৩
১৩৩৪

সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। সেদিন বসন্তের জীবন রক্ষা করলে তুচ্ছ একটি কারণ।

নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাতে কে তাঁকে গুঁটলে জাগিয়ে দিলে।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বসন্তের বললেন, ‘কে এখানে?’ সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে ঘরে আলোটা জ্বলে দিলেন।

হঠাতে আলোর ধাক্কায় চোখ মিটচিট করতে করতে মন্তব্য করলে, ‘বাইরে ঘোপের আড়ালৈ কে একজন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সুবোধকে জাগিয়ে দিল্লে আপনাকে ডাকতে এসেছি।’

—‘বেশ করেছ।’ তাড়াতাড়ি তিনি জামা পরতে লাগলেন।

মন্তব্য বললে, ‘শোহনলালকেও জাগিয়ে দেব?’

—‘দ্রবকার নেই।’ বলে বসন্ত দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মন্তব্য এগিয়ে গিয়ে বললে, ‘এইদিকে আসুন, স্যার।’

দুজনে অগ্রসর হলেন। হঠাতে গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়া তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। সুবোধ। সে বললে, ‘ওই বোপটার ভিতরে এখনও কেউ লুকিয়ে আছে।’

আচমকা ঝোপটা দুলিয়ে একটা সাদা মতো কী বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য তুললে তার রিভলভার।

বসন্ত চট করে মন্থরের হাতটা ঢেপে ধরে বললেন, ‘থামো বাপু, থামো! শুটা হচ্ছে একটা গোক। ভয় নেই, ও তোমাকে গুঁতোতে আসবে না।’ বলেই মাটি থেকে একটা তিল তুলে নিয়ে গোকটার দিকে নিষ্কেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে টেনে লাঘা দিলে।

বসন্ত ফিরে বললেন, ‘মন্থথ, এইবার বুঝি তোমার রাত জাগবার পালা?’
—‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

—‘আছা, আজ আর তোমাকে রাত জাগতে হবে না। ঘূম যখন ভেঙেছে, আমার চোখে আর ঘূম আসবে না। আমি এইখানেই বসে রইলুম। তুমি আমার ঘরে গিয়ে বাকি রাতটা ভালো করে ঘূমিয়ে নাও।’

কিন্তু বসন্তের পাহাড়া দেওয়া আর হল না, কারণ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেখতে দেখতে তাঁর দুই চোখ ঘূমে জড়িয়ে এল। তাঁর কতক্ষণ পরে তা তিনি জানেন না, কিন্তু আবার কে তাঁর গা ধরে নাড়া দিতেই তিনি চোখ মেলে দেখলেন, চারিদিকে ধৰ্মধর করছে দিনের আলো!

একলাকে উঠে দাঁড়িয়ে বসন্ত বললেন, ‘ওঃ, কী হৃষিয়ার পাহাড়াওয়ালা আমি!’ হনহন করে তিনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে চুকলেন। তাঁরপর নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তখনও ভাঙেনি মন্থরের ঘূম। —‘আজ কি সবাইকেই ঘূমে পেয়েছে?’ এই বলে তিনি মন্থরের গা ধরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, ‘ওহে, উঠে পড়ে, বেলা হয়েছে! মন্থথ, মন্থথ!’

তবু কোনও সাড়া নেই। বসন্ত সন্দিক্ষ ভাবে মন্থরের জামার বোতাম খুলে তাঁর বুকে হাত দিয়েই অত্যন্ত চমকে উঠলেন! তাঁর হৃৎপিণ্ড হ্যাঁ। মন্থথ বেঁচে নেই।

প্রথমটা তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন স্তুতিরে মতো। তাঁরপরই দেওয়ালের দিকে তাঁর দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। মন্থরের শয্যা পাতা ছিল দেওয়াল যেমনে এবং তাঁর মাথার পাশে দেওয়াল রয়ে নীচে নেমে এসেছে একটা রবারের নল। একটা ‘ভেন্টিলেটার’র ভিতর দিয়ে নলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে বাইরের দিকে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিককার জানলা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, নলের অন্য প্রান্তটা বাইরের দেওয়াল বয়ে প্রায় বাগানের মাটি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

ঘরের ভিতর দিকে ফিরে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বসন্ত অলঙ্কণ কী চিন্তা করলেন। তাঁর মনে জাগল একটা সন্দেহ। তিনি হেঁট হয়ে পড়ে একটা জুলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি মেঝের ইঞ্চি কয়েক উপরে নিয়ে গেলেন। কাঠিটা তৎক্ষণাত নিবে গেল। আবার একটা কাঠি জুজলেন। কিন্তু তাও গেল নিবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ‘কার্বন মোনোক্সাইড গাস দিয়ে বেচারা মন্থরকে পরলোকে পাঠানো হয়েছে। ভগবান সাক্ষী, একাজ যে করেছে, ফাঁসিকাঠে তাকে ঝুলতে হবেই।’

পরদিন সকালে রঞ্জা যখন তাঁকে চা খেতে ডাকলে, বসন্ত তাঁর কাছে কোনও কথা ভাঙলেন না।

শোহনলাল থানায় গিয়েছিল, সেইজন্যে তাঁরা দুজনেই নীরবে চা পান করতে লাগলেন।

এমন সময় বাগান থেকে শোনা গেল শ্যামলের মোটরের সুগরিচিত ডেঁপুর আওয়াজ।

বসন্তের মুখের উপরে ঘনিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা কালো ছায়া। শ্যামল সম্বন্ধে তিনি পুলিশ কর্মশালারের কাছে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, আজ সকালেই তাঁর জবাব এসেছে। অদ্ভুত জীব এই শ্যামল। সে যে এখানকার ঘটনাগুলোর দিক দিয়ে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত আছে, সেবিয়েয়ে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কোন ভূমিকায় সে অভিনয় করছে, সেইটৈই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

শ্যামলের আবির্ভাবের আগেই বসন্ত চেয়ার ত্যাগ করে বললেন, ‘রঞ্জাদেবী, আমি শোহনলালের গাড়ির ‘হন’ শুনেছি। তিনি বোধহয় থানা থেকে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে আমার জরুরি পরামর্শ আছে। এখন আমি নিজের ঘরে চললুম।’

বসন্তের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলের প্রবেশ। সে ঘরে ঢুকেই প্রফুল্ল মুখে বলে উঠল, ‘সুপ্রভাত, রঞ্জা! আজকের এমন সুন্দর প্রভাতটা তুমি ঘরের কোণে বসে নষ্ট করছ কেন?’

—‘করছি নাকি?’

—‘করছ বই কি! তুমি কেবল ঘরের কোণেই বন্দি নও, আবার দু-দুটো গোয়েন্দা হয়েছে তোমার সঙ্গী! গোয়েন্দার নাম শুনলেই আমার গায়ে জুর আসে।’

—‘কেন্দ্রে শ্রেণির লোক আমার সঙ্গী হবেন, সেটা কি আপনিই আমার জন্যে নির্বাচন করতে চান?’

—‘আচ্ছা, ও-আলোচনা এখন থো করো। এখন আমি তোমাকে নিয়ে আমার গাড়িতে চড়ে খানিকটা বেড়িতে আসতে চাই। Querida Mia তোমার মত কী?’

সন্দিক্ষ স্বরে রঞ্জা বললে, ‘Querida Mia? ও-কথার মানে কী? ওটা কোন দেশি কথা?’

—‘কথটা স্পেন দেশের। ওর মানে হচ্ছে, ‘বেড়ালে খিদে বাড়ে’!’

—‘বাবার লাইব্রেরিতে স্পেনীয় ভাষার অভিধান আছে।’

—‘থাক গে। তা নিয়ে সময় নষ্ট করো না। চলো, বেড়িয়ে আসি।’

রঞ্জা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ‘বেশ, জামা-কাপড় বদলে এখনই আমি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।’

মিনিট-দশকে সেইখানে চুপ করে বসে রইল শ্যামল। তারপর সাজ-পোশাক পরিবর্তন করে রঞ্জা যখন ফিরে এল, অতঙ্গ গন্তব্য তার মুখ।

শ্যামলের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রঞ্জা ধীরে ধীরে বললে, ‘আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।’

ইতিমধ্যে এখানে আসবার আগে সে লাইব্রেরিতে ঢুকে স্পেনীয় অভিধান খুলে দেখে এসেছে ‘Querida’র মানে হচ্ছে, ‘প্রিয়তমা’।

—‘শর্টটা কী, শুনি?’

—‘আপনি আর কখনও আমাকে ‘Querida’ বলে ডাকবেন না।’

সকৌতুকে হাস্য করে শ্যামল বললে, ‘তোমার যদি আপনি থাকে, নিশ্চয়ই ডাকব না। শাস্তিহাপনের জন্যে আমি যে-কোনও শর্তে সই করতে প্রস্তুত। এখন চলো।’

রোদে কাঁচা সোনার আভাস, আকাশে নীলপদ্মের রং, বাতাসে মধুর মিঞ্চতা। তরুমর্মর ও পাখির গান শুনতে শুনতে এবং মাঠে মাঠে ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে গাড়িতে চড়ে তারা এগিয়ে চলল। তারপর রাজবাড়ির প্রাচীন ধর্মস্বাশ্যের কাছে এসে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল দুজনেই।

ধর্মস্বাশ্যের পাশেই ছিল ছাটোখাটো একটা পাহাড়ের মতো উচ্চভূমি। সেইদিকে অদূরে নির্দেশ করে রঞ্জা বললে, ‘ওখানে আমি কখনও যাইনি।’

শ্যামল মৃদুস্বরে বললে, ‘বেশ, চলো।’ উচ্চভূমির টঙে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, দিকে দিকে বিচ্ছিন্ন স্বৰ্গের সমারোহ।

রঞ্জা উচ্ছিসিত কঠে বললে, ‘কী চমৎকার !’

শ্যামল কোনও কথাই বললে না।

রঞ্জা বললে, ‘আপনি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলেন কেন ?’

—‘উপায় কী ? আমার উপরে ঝুক হয়েছে, আমি Querida বলতে পারব না। তাহলে যাকে ভালোবাসি, তাকে আমি কী বলে ডাকব ? তুমই না-হয় সেটা আমাকে বলে দাও !’

রঞ্জা মাথা নত করে হিঁড়িয়ে রইল নির্বাক মুখে।

শ্যামল বললে, ‘হ্যাঁ, তোমাকে আমি ভালোবাসি, আজ এই কথাটাই জোর করে বলতে চাই। কাল যদি আমাকে হঠাৎ এখান থেকে চলে যেতে হয়, তোমার সঙ্গে যদি আর কখনও আমার দেখাও না হয়, তাহলেও তুমি চিরদিনই আমার মনকে অধিকার করে থাকবে। এখন তুমি কথা কইছ না কেন ? যা বললুম বুবতে পেরেছ কি ?’

খুব আস্তে রঞ্জা বললে, ‘হ্যাঁ।’

আচম্ভিতে শ্যামলের দুই বাহ বেষ্টন করে ধরলে রঞ্জার দেহকে। তারপর তম্বলদৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে শ্যামল গাঢ়স্বরে ডাকলে, ‘রঞ্জা !’

রঞ্জা তখনও কিছু বললে না এবং নিজেকেও তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলে না। তারপর, শ্যামল করলে তার মুখচুম্বন। তার ললাটে, তার কপোলে, তার ওষ্ঠাধরে এসে পড়ল চুম্বনের পর চুম্বন।

রঞ্জা তখনও কোনও আপত্তি করলে না বটে, কিন্তু শ্যামলের হাত ছাড়িয়ে একটু তফাতে গিয়ে ধীরে ধীরে বললে, ‘এইখানে ঘাসের উপরে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে !’

শ্যামল তার কথামতো সেইখানে উপবেশন করলে।

কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে রঞ্জা বললে, ‘এখানা হচ্ছে একখানা টেলিগ্রাম। বসন্তবাবু এখানা পাঠ করে ছিড়ে ‘ওফেস্টপেপার বাস্কেট’-র ভিতরে ফেলে দিয়েছিলেন। এক খণ্ড কাগজ উড়ে ঘরের মেঝের উপরে গিয়ে পড়েছিল, তাতে আপনার নাম দেখে আমি সেখানা কুড়িয়ে নিই। তারপর অন্য খণ্ডগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে সমস্ত টেলিগ্রামখানা আমি পাঠ করি।’

শ্যামল সেখান নিয়ে পাঠ করলে। টেলিগ্রামখানা লেখা ছিল ইংরেজিতে, ডাঁর বাংলা অনুবাদ এই :

শ্যামলকুমার সনের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। বোম্বাই পুলিশ তাকে শুব চেনে। রাহাজানি ও বিষ দিয়ে নরহত্যা প্রভৃতির মামলায় সে জড়িত হয়েছিল। বোম্বাইয়ে সে এক বৎসর জেল খেটেছে। আপাতত তার বিকরদে তুমি কোনও কাজ-কোরো না। তার গতিবিধি লক্ষ করো। তোমার কথামতো তাকে গ্রেপ্তার করবার ‘ওয়ারেন্ট’ পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু এখন তাকে গ্রেপ্তার কোরো না।

—সুধাকান্ত চৌধুরী

রঞ্জা কাতরকঠে বললে, ‘শ্যামলবাবু ! এসব অভিযোগ নিশ্চয়ই সত্য নয় ?’

শ্যামল স্পষ্টকঠে বললে, ‘সত্য।’

—‘আপনি এক বছর জেল খেটেছেন ?’

—‘হ্যাঁ।’

—‘কেন ?’

—‘এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।’

—‘রাহজানি, নরহত্যা?’ চমৎকীর্ণ প্রশ্ন।

—‘হয়তো তাই’

রঞ্জার মাথা ঘুরতে লাগল, তার সারা দেহ অবশ হয়ে এল। সে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, শ্যামল তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাকে ধরে ফেললে।

শ্যামলের হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে রঞ্জা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, ‘আপনি রাহজানি করেছেন, আপনি খুন করেছেন, আপনি জেল খেটেছেন, হা ভগবান! মানুষ চেনা এতই কঠিন?’

শ্যামল কন্দুককষ্টে বললে, ‘রঞ্জা! অপেক্ষা করো। আমার উপরে অবিচার কোরো না।’

—‘এইসব ভয়ানক কথা জানবার পরও আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?’

—‘হ্যাঁ।’

—‘তারপর আপনি এখানে এসেছেন, গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন—কিন্তু কেন, কেন, কেন?’

শ্যামল প্রায় ভগ্নস্বরে বললে, ‘আপাতত আমার কথাকেই বিশ্বাস করতে হবে। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারব না—বললেও তুমি বুঝতে পারবে না।’ তারপর হঠাৎ থেমে শাস্তিকষ্টে বললে, ‘এখন চলো, বেলা হয়েছে, গাড়িতে উঠবে এসো।’

—‘না। আপনার সঙ্গে আমি যাব না।’

—‘পাগলামি কোরো না, চলো।’

—‘না, না, না! চলে যান আপনি এখান থেকে।’

—‘শোনো—’

—‘আপনি এখনই যদি এখান থেকে চলে না যান, তাহলে একলাই আমি বিদায় হচ্ছি।’

শ্যামল একটা দীর্ঘস্থান ফেলে শ্রান্তস্বরে বললে, ‘বেশ, তাহলে আমিই যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবে, আমি থাকব চিরদিনই তোমার অনুগত!’ বলেই সে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্রুতগতে নেমে গেল উচ্চভূমির উপর থেকে। তারপর নিজের মোটরে গিয়ে উঠে গাড়ি দিলে চালিয়ে। নিজের মনেই বললে, ‘এখান থেকে এখনও আমি চলে যেতে পারব না, এখনও আমার চুলে যাবার সময় হ্যানি। যা করতে এসেছি তা না করে এখান থেকে কিছুতেই আমি নড়তে পারব না।’ আমাকে বিচার করবেন, স্বয়ং ভগবান! অস্তু আর এক সপ্তাহ আমাকে রাখাপূরেই বাস করতে হবে, তার ভিতরেই ভগবান নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হবেন।’

আর এক সপ্তাহ! কিন্তু এই সপ্তাহ যে কী ভীষণ বিপজ্জনক, শ্যামল মনে মনে সেটা উপলক্ষ করতে পারলে।

—প্রিয় দুর্দলী

স্বামী

কুসুম

প্রিয়ে

প্রিয়ে

স্বীকৃত প্রিয়ে
স্বীকৃত:

নবম
রঞ্জা হরণ

প্রিয়ে প্রিয়ে প্রিয়ে

—‘শোহুলালবাবু, এখানে চুপ করে একলাটি বসে বসে কী করছেন?’ প্রশ্ন করলেন বসন্ত।

—‘প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি।’

ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসন্ত সিগারেটে একটি সূর্য় টান দিয়ে একবাশি ধূম উদ্গিরণ করলেন। তারপর উর্ধ্মোপিত ধূমকুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন, না মন্তিষ্ঠালনা করছেন? ঠিক কী ভাবছেন বলুন দেখি?’

শোহনলাল একটু বিরক্ত ভাবে বললে, ‘বসন্তবাবু আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে সুচেতুর বলে ভাবেন।’

বসন্ত কৃত্রিম বিশয়ের ভাব দেখিয়ে বললেন, ‘নিশ্চয়ই! একথা কি আপনিও জানেন না?’

—‘আমার জানা-জানার উপরে কিছুই নির্ভর করছে না। কিন্তু বলুন দেখি, ওই সেকেলে ধূমসম্পূর্ণের সঙ্গে আমাদের বর্তমান মামলাটার সম্পর্ক কী?’

—‘হঠাতে প্রশ্ন কেন?’

—‘এ প্রশ্ন ওঠে বই কি। গভীর রাত্রে সাদা সওয়ারকে ওই ধূমসম্পূর্ণের উপরে দেখা যায় কেন? এত জায়গা থাকতে সেখানেই বা তার আবির্ভাব হয় কেন? সেখানে গিয়ে সে কী করে, সে কী করতে পারে?’

—‘সে মাটি খুড়ে দেখে।’

—‘কী করে জানলেন আপনি?’

—‘ওই ধূমসম্পূর্ণটা আমি নিজে পরীক্ষা করে এসেছি। স্বচক্ষে মেঘেছি জায়গার জায়গার মতুন মাটি খোঢ়ার চিহ্ন।’

—‘কেন সে মাটি খোঢ়ে?’

—‘গুপ্তধন আবিষ্কার করবার জন্যে।’

—‘এত জায়গা থাকতে ওই ধূমসম্পূর্ণ বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কেন?’

—‘হয়তো এটা ভাস্ত বিশ্বাস। এখনকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস, ‘তপোবনে’র তিতর থেকে ওই ধূমসম্পূর্ণ পর্যন্ত একটা শুষ্পু সুজ্ঞপথ আছে, এসব সেকেলে জনশ্রুতি আমরা আমলে আনতে না পারি, কিন্তু সাদা সওয়ার আমাদের দলের লোক নয়।’

শোহনলাল আর কিছু না বলে একটি সিগারেট ধরালে। দুইজনে ধূমগান করতে লাগল মৌনমুখে।

হঠাতে শোহনলাল বলে উঠল, ‘আহ, কী শ্বাস্য দৃশ্য?’

ইজিচেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বসন্ত বললেন, ‘মানে?’

শোহনলাল নীরবে সুন্দরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

সেখান থেকে দূরে দেখা যাচ্ছিল ধূমসম্পূর্ণের উচ্চভূমিটা। তার উপরে আলিঙ্গনে আবক্ষ দুই মূর্তি—একজন পুরুষ ও একজন নারী!

বসন্ত বললেন, ‘শ্বাস্য দৃশ্যই বটে। ওই দৃশ্যের নট-নটী হচ্ছে শ্যামল আর রঞ্জা। কিন্তু শোহনলালবাবু, ওই শ্যামলকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি।’

—‘কেন?’

—‘কেন? বোলতা দেখলে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে কেন? সে জানে, একটু অসাবধান হলেই তাকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর দেহের কোথায় হবে যে সে যন্ত্রণা, মানুষ তা আগে থাকতে জানতে পারে না।’

—‘তাই নাকি?’

—‘হ্যাঁ। আগাতত মুখ বঙ্গ করুন। আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দিন।’

বসন্ত ইজিচেয়ারে পা-দানের উপরে দুটো পা তুলে দিয়ে প্রায় শয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনও দিকে না তাকিয়ে শুরু হয়ে রাইলেন নিমীলিত নেত্রে।

পুলিশ কমিশনারের আদেশ তাঁর ভালো লাগেনি। শ্যামলের বিকান্দে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁর উপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে নাকি এখন গ্রেপ্তার করা চলবে না।

শ্যামলের মুখ পরিচিত হলেও তিনি আগে তাকে চিনতে পারেননি। পুলিশ কমিশনারের টেলিগ্রাম পাবার পর এখন সব কথা তাঁর মনে পড়ছে। শ্যামল হচ্ছে একজন অসাধারণ অপরাধী। কয়েক বৎসর আগে গুভাদের সর্দার আলগু বিলতারের গুলিতে মারা পড়ে এবং সকলেই একবাক্সে বলেছিল, সে হচ্ছে শ্যামলের ক্ষৰ্ত্তি। এ সম্বন্ধে পুলিশ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতেও বাকি রাখেনি। শ্যামল সকলের মুখের উপরে হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, ‘আগনারা হচ্ছেন বাক্যবাচীশের দল, কেবল বড়ো বড়ো ফাঁকা বুলি কপাতাতেই শিখেছেন। আগে আমার বিকান্দে প্রমাণ সংগ্রহ করুন, তারপর আমার সঙ্গে কথা কইতে আসবেন।’ পুলিশকে হার মেনে বোবার মতো চলে আসতে হয়।

আলি বলে আর একটা বদমাইশ ছিল, পথে পথে সে রাহজানি করে বেড়াত। বার দুয়েক তার বিকান্দে ঝুনের মামলাও করু হয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে সে খালাস পেয়েছে। একদিন আলিরও মৃতদেহ পাওয়া যায় মধ্য কলকাতার একটা সরু গলির ভিতরে। তার বুকে ছিল ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগেই তাকে দেখা গিয়েছিল শ্যামলের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দারা মত প্রকাশ করে, আলি মারা পড়েছে শ্যামলেরই হাতে। সেবারেও তাকে থানায় তাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিন্তু ওই পর্যন্ত! তাকে গ্রেপ্তার করা চলে, তার বিকান্দে এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি। আজ রাধাপুরে হয়েছে সেই শ্যামলেরই আবির্ভাব। সে যে এখানে এসেছে গোবিন্দাসের গুপ্তধনের লোডেই, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

অন্তর্ভুক্ত চূক্ষ চূক্ষাদ্য

প্রটো

বসন্ত ভাবতে লাগেন, এখন কী করা যায়?

শোহনলাল হঠাতে বলে উঠল, ‘ঠিক কথা! তাকে প্রেপ্তারাই করুন।’

অত্যন্ত চমকে উঠে বসন্ত বললেন, ‘কাকে?’

—‘শ্যামলকে!’

—‘আপনি কি অস্ত্রযামী?’

—উহ, আমি একজন সামান্য গোয়েন্দা মাত্র, দেখলুম আপনি মাঝে মাঝে একবার শক্ত হয়ে দৃঢ় হাত মুষ্টিবন্ধ করছেন, তারপর আবার কতকটা শাস্ত হয়ে মাথা নাড়ছেন। বুবলুম আপনার মন সন্দেহেদোলায় দোদুলুমান। আরও দেখলুম, আপনি থেকে থেকে বারবার ঘরের দরজার দিকে উৎসুক দৃঢ় নিষ্কেপ করছেন। যেন আপনি এখানে আর কারুকে দেখবার প্রত্যাশায় আছেন। কিন্তু এখানে আর কে আসতে পারে? হয় রস্তাদেবী, নয় শ্যামল। আন্দাজে আমি ওই দুজনের ভিতরে একজনকে নির্বাচন করে নিয়েছি। পদ্ধতিটা আধুনিক নয়—এটা হচ্ছে প্রাচীন শার্লক হোমসের পদ্ধতি।’

বসন্ত চিপ্তিমুখে বললেন, ‘শোহনবাবু, শ্যামলকে নিয়ে আমায় রীতিমতো মাথা ঘায়াতে হচ্ছে। আপনি জানেন না, সে কী রকম বিপজ্জনক লোক।’

ଠିକ ସେଇ ସମୟ ଦେଖା ଗେଲ, ଫଟକ ଦିଯେ ବାଗାନେର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରଛେ ଆର ଏକ ମୃତ୍ତି।
ଶୋହନଲାଲ ବଲଲେ, ‘ଏହି ଯେ, ପାଦରି ବିନୟବାବୁ ଆସଛେନ !’

ବସନ୍ତ ବଲଲେନ, ‘ଶ୍ୟାମଲେର ମୁଖେ ଶୁଣେଛି, ବିନୟବାବୁ ସାଧ ଉନି ଶଥେର ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର ହବେନ !’
ଶୋହନ ବଲଲେ, ‘ପାଦରି ହବେ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର, ଆବାର ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର ହବେ ପାଦରି ? ଆଜିବ କଥା ବଟେ ?’

ବିନୟବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେର ଭିତର ପ୍ରବେଶ କରଲେନ, ତାରପର ଏକମୁଖ ହେସେ ବଲଲେନ, ‘ଏମନ ଚମଞ୍କାର ଦିନେଓ ଆପନାରା କେବଳ ଅପରାଧତ୍ଵ ନିୟେ ମାଥା ଘାମାଛେନ ତୋ ?’

ବସନ୍ତ ବଲଲେନ, ‘ଏକରକମ ତାଇଇ ବଟେ । ଆସୁନ ସ୍ୟାର, ବସୁନ । ଶୁନିଲୁମ, ଆପନି ନାକି ଶଥେର ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର ହତେ ଚାନ ?’

—‘ଏଟା ଏକଟା ବାଜେ ଯେହାଲ ବସନ୍ତବାବୁ ! ପାଦରିଦେଇ ଓ ସତିକାର ଜୀବନ ଦେଖିବାର ସାଧ ହ୍ୟ ନା କି ?’

ବସନ୍ତ ମାଥା ନେଡ଼େ ବଲଲେନ, ‘ଅପରାଧେର ଭିତରେ ସତିକାର ଜୀବନ ପାଓୟା ଯାଯା ନା । ଅପରାଧ ଏକଟା ବ୍ୟାଧି ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ ନଯ ?’

—‘ଆପନି ହଜେନ ବିଖ୍ୟାତ ପୁଲିଶ କର୍ମଚାରୀ । କିନ୍ତୁ ଆପନି କି ସାଦା ସଓୟାରେର ବିକଳେ ଏଖନେ ଏକମୁଖ କୋନେ ପ୍ରମାଣିତ ଆବିଷ୍କାର କରତେ ପାରେନନି ? ଆମି ତୋ ଜାନି, ପ୍ରମାଣ ଆଛେ ଆପନାର କାହେଇ ?’

—‘କୀ ରକମ ?’

—‘ଆପନି ତୋ ସାଦା ସଓୟାରେ ଯୋଡ଼ାର ପାଯେର ଏକଟା ନାଲ ହତ୍ତଗତ କରେଛେନ ?’

—‘କରେଇ ବଟେ । କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋନ ଯୋଡ଼ାର ଖୁରେର ନାଲ, ଏକଥା କେମନ କାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହବେ ?’

—‘ଖୁବ ସହଜେଇ । ଡୁବନବାବୁର ମୁଖେ ଶୁଣେଛି, ସାଦା ସଓୟାର କାଳ ରାତ୍ରେ ପଥେର ଯେଥାନେ ଯୋଡ଼ା ଥେକେ ନେମେ ପଡ଼େଛିଲ, ଏ ନାଲଟା ପାଓୟା ଗିଯେଛେ ଠିକ ସେଇଥାନେଇ ?’

—‘ହତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସାଦା ସଓୟାର ଯେ ଓହି ନାଲଟା ଖୋଜିବାର ଜନ୍ୟେଇ ଯୋଡ଼ା ଥେକେ ନେମେଛିଲ, ଏଟା କିଛୁତେଇ ଜୋର କରେ ବନା ଯାଯା ନା । ତାର ଉପରେ ଏହୁକୁଠ ଖାଲି ଜାନା ଗିଯେଛେ ଯେ, ସାଦା ସଓୟାର କେବଳ ରାତ୍ରେଇ ଯୋଡ଼ାଯ ଚଢେ ବେଢାଯ । ସେଟା ଅପରାଧ ନଯ । ତାକେ ହାତେ-ନାତେ କୋନେ ବେଆଇନି କାଜ କରତେ ଦେଖେଇ, ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମନ ଏକଜନ ସାଙ୍କୀ ପାଓୟା ଯାଯାନି ।’

ବିନୟବାବୁ ବଲଲେନ, ‘ଯାକ ଗେ ସାଦା ସଓୟାରେର କଥା । ଗିର୍ଜା-ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାପାର ନିୟେ ଆମି ଏଖନ ଏମେହି ରତ୍ନାଦେବୀର କାହେ । ତିନି ବାଡ଼ିତେ ଆହେନ ତୋ ?’

ବସନ୍ତ ବଲଲେନ, ‘ରତ୍ନାଦେବୀ ଖୁବ ସକାଳେଇ ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେରିଯେ ଗିଯେଛେନ, ଏଖନେ ଫେରେନନି ।’ ବଲେଇ ତିନି ନିଜେର ହତ୍ୟକାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆସନ ଛେଡ଼େ ଉଠେ ଦାଁନ୍ଦିଯେ ବଲଲେନ, ‘ତାଇ ତୋ, ବେଳା ବାରୋଟା ବାଜେଇ । ଆମରା ମଧ୍ୟାହନ୍ତେଜନେର ଜନ୍ୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରାଇଛି କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାଦେବୀ ଏଖନେ ଏଲେନ ନା କେନ ?’

ଶୋହନଲାଲ ସକୌତୁକେ ବଲଲେ, ‘ଓଠୀ-ନାମା ପ୍ରେମେର ତୁଫାନେ ! ସମୟ ଯେ କୋଥା ଦିଯେ କେଟେ ଯାଯ, ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାରା ତା ଆଦ୍ଵାଜଓ କରତେ ପାରେ ନା । ତାଇ ତାଁରା ଏଖନେ ଫିରେ ଆସେନନି—ହ୍ୟତେ ତାଁରା ଫିରେ ଆସବେନ ବୈକାଳେ ଚା ପାନେର ସମୟେ !’

ବିନୟବାବୁ ବିଶ୍ଵିତ ଥରେ ବଲଲେ, ‘ତାଁରା ମାନେ ?’

—‘ତାଁରା ମାନେ, ରତ୍ନାଦେବୀ ଆର ଶ୍ୟାମଲବାବୁ । ତାଁରା ଆଜ ଜୁନେଇ ଏକମେ ଏକାଶା ହ୍ୟ ଆହେନ ।’

ବିନୟବାବୁ ହତ୍ତମେର ମତୋ ବଲଲେ, ‘ରତ୍ନାଦେବୀ ଆର ଶ୍ୟାମଲବାବୁ ? ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗେ ଆମି ଝଞ୍ଜେ ଦେଖେଇ, ଶ୍ୟାମଲବାବୁ ଏକଲାଇ ବାଡ଼ିତେ ଫିରେ ଏମେହିନେ !’

ବସନ୍ତ ଉତ୍ୱେଜିତ କଟେ ବଲଲେ, ‘ଆପନି ଠିକ ଦେଖେନେ ତୋ ?’

—‘নিশ্চয়! শ্যামলবাবু এখন তাঁর নিজের বাসায় ভিতরেই আছেন।’

শোহনলালও সচমকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘বসন্তবাবু, ব্যাপারটা কিছুই তো বুঝতে পারছি না। শ্যামলবাবু নিজের বাসায়, কিন্তু রঞ্জাদেবী এখনও অদৃশ্য! ডগবান জানেন, তিনি এখন কোথায়?’

বসন্ত দ্রুতপদে গাড়িবারান্দার কাছে গিয়ে ডাকলেন, ‘সুবোধ, সুবোধ!’

সুবোধ তখন গাছতলায় চেয়ারের উপরে বসে একখানা খবরের কাগজ পাঠ করছিল। বসন্তের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তটস্থ হয়ে বললে, ‘আজ্ঞে স্যার, আমাকে ডাকছেন?’

—‘হ্যাঁ। তুমি এখানে ঈশ্বরার হয়ে অপেক্ষা করো। যদি তুমি রঞ্জাদেবীকে দ্যাখো,—তাঁর সামনে চোখ-কানকে সজাগ রেখে বসে থাকবে। তিনি যদি আর কোথাও যেতে চান, যেতে দেবে না। দরকার হলে তাঁকে প্রেপ্তারণ করতে পারো।’

সুবোধ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ‘আজ্ঞে স্যার, রঞ্জাদেবী কি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন স্যার?’

ব্যদের স্বরে বসন্ত বললেন, ‘না, তিনি অদৃশ্য হবেন কেন? তিনি তো তোমার সামনেই মূর্তিমান হয়ে বসে আছেন! নির্বোধ গর্দভ! যদি বৃন্দিমানের মতো কথা কইতে না পারো, বোবা হয়ে থাকো! যা বলি শোনো। তোমার কাছে রিভলভার আছে?’

—‘আছে স্যার, আছে।’

—‘দরকার হলে তুমি রিভলভারও ব্যবহার করতে পারো। আসুন শোহনবাবু, আপনার গাড়ি চালান।’

মোটর সোজা ছুটে গিয়ে হাজির হল রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে। পাশেই পাহাড়ের মতো সেই উচ্চভূমিটা। বসন্ত ও শোহনলাল একেবারে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু সেখানে রঢ়—কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। সেখান থেকে নজর চলে চারিদিকে বহুর পর্যন্ত। বসন্ত দূরবিন দিয়ে চারিদিক পরীক্ষা করলেন, কিন্তু পরীক্ষার ফল হল না সন্তোষজনক। ধ্বংসাবশেষের ভিতর ছুকেও তাঁরা তন্ত্রজ্ঞ করে খুঁজতে বাকি রাখলেন না। কিন্তু সমস্ত সন্ধানই ব্যর্থ হল।

বসন্ত প্রায় গর্জন করে বললেন, ‘আজ্ঞ আমি একটা কিছু করবই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং মধ্যে আছে শ্যামলেরই চক্রান্ত।’

১৯৩৮ সন্ধিমাসের শেষে চলে
১৯৩৯ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত
দশম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
শ্যামল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ভুবনবাবুর ত্রিভুবন ত্যাগী

শ্যামলের বাড়ির সামনে বসন্তকে নামিয়ে দিয়ে শোহনলাল আবার তার বাসায় ফিরে গেল।

গায়ে একটা রঙিন ফুল-কাটা ‘কিমনো’ পরে শ্যামল বসেছিল একখানা আরাঘ-আসনে। তার উষ্ঠাধরে তামাকের পাইপ ও কোলের উপরে একখানা খোলা কেতাব। হঠাৎ ঘরের দরজার কাছে বসন্তের আবির্ভাব দেখে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিশয়ের ভাব।

শ্যামল বললে, ‘মেঘ না চাইতে জল কেন?’

বসন্ত বললেন, ‘কিন্তু মেঘের উদয় হয়েছে সুতরাং বৃষ্টির সন্তান যথেষ্ট।’

—‘কিন্তু ব্যাপারটা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

—‘ব্যাপারটা হচ্ছে এই! আমি এসেছি একটি মহিলার সঙ্গানে! তাঁর মধ্যাহ্নতোভ্রনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত!’

অবহেলাভেরে শ্যামল বললে, ‘তাই নাকি? মহিলাটি কে, শুনি?’

—‘রঞ্জাদেবী। তাঁকে নিয়ে আজ সকালে আপনি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।’

—‘তাই নাকি?’

বসন্তের মেজাজ তখন রূক্ষ হয়ে উঠেছিল। তিনি কর্কশ কষ্টে বললেন, ‘হ্যাঁ, তাই! তিনি কোথায় আছেন, আপনি তা জানেন।’

—‘ও, তাই নাকি?’

—‘হ্যাঁ। আমি যতক্ষণ তাঁর দেখা না পাই, ততক্ষণ এখান থেকে এক পা নড়ব না।’

—‘তাহলে আমার এখানে আপনাকে বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে দিনের পর দিন।’

বসন্ত হঠাৎ এগিয়ে এসে শ্যামলের এক হাত ধরে সজোরে টান মেরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

শ্যামল পাইপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তার দান হাতখানা আলতো ভাবে রাখলে বসন্তের হাতের কব্জির উপরে। সঙ্গে সঙ্গেই বসন্তের বাহর ভিতর দিয়ে বয়ে গেল একটা তীব্র যন্ত্রণা শ্রোত এবং তিনি কয়েক পা পিছনে হটে এসে দাঁড়ালেন আচ্ছন্নের মতন।

শ্যামল শাস্ত্রকষ্টেই বললে, ‘অমন করে আমার হাত ধরা আপনার উচিত হ্যানি। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনও করবেন না। মনে রাখবেন, আমি জাপানি যুুৎসুর সব প্যাচাই জানি।’

দুজনে দাঁড়িয়ে রইল দূজনের চোখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে।

বসন্ত হচ্ছেন শৌখিন মৃষ্টিযুক্ত একজন বিখ্যাত পালোয়ান। দেহের ওজনে শ্যামলের চেয়ে তিনি বেধহয় আড়াইগুণ বেশি ভারী হবেন। ভয় তিনি কারুকেই করেন না, কিন্তু আপাতত এখানে হাতাহাতির দ্বারা কোনও উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ হবে না।

তিনি বললেন, ‘আমি এখানে হাতাহাতি করতে আসিনি—যদিও কোর্টে হঠাৎ আমি আঁকড়তে নারাজ নই।’

—‘কিন্তু আপনি আমাকে কী করতে বলেন?’

—‘রঞ্জাদেবী কোথায় আছেন, আপনাকে তা বলতে হবে।’

—‘আর যদি আমি তা না বলি?’

—‘আপনাকে বলতে বাধ্য করার উপায় আমার হাতে আছে।’

শ্যামল সকোতুকে হেসে উঠল। তারপর পাশের টেবিলের উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বসন্তের হাতে দিয়ে বললে, ‘ভবিষ্যতে একটু হঁশিয়ার হয়ে কাজ করবেন।’

কাগজখানা হচ্ছে পুলিশ কমিশনারের সেই টেলিগ্রাম। তার দিকে তাকিয়ে দেখেই বসন্তের মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, ‘ও, বুঝেছি। এইজন্যেই অমন বেপরোয়ার মতন কথা বলছেন?’

আবার হেসে উঠে শ্যামল বললে, ‘ধৰুন, তাই। আপনার কাছে আমার নামে একটা ‘ওয়ারেন্ট’ আছে বটে, কিন্তু আপনি এখনও তা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ, আমার

বিকল্পে আপনি কোনও প্রমাণই পাননি। আমি স্পষ্টকথার মানুষ। তাই স্পষ্ট ভাষাতেই বলছি, রাধাপুরে আমি এসেছি গুপ্তধনের লোভেই। যতদিন তা না পাই, আমাকে এইখানেই বাস করতে হবে। রঞ্জাদেবী এখন কোথায়, আমি সত্যসত্ত্বই তা জানি না। বাসায় গিয়ে হয়তো আপনি দেখতে পাবেন, এতক্ষণে তিনি আবার ফিরে এসেছেন। রঞ্জাদেবীর উপরে কড়া পাহারা রাখুন। গুপ্তধন কোথায় আছে, সেটা তাঁর অজানা নেই। লোভে পড়ে কেউ তাঁকে হরণ করতে পারে। আমার এই উপদেশমতো আপনি কাজ করবেন কি?’

ব্যঙ্গের ঘরে বসন্ত বললেন, ‘ধন্যবাদ! আমি এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে আসতে পারি।’

—‘অন্যায়েই আসতে পারেন। কিন্তু এসেও কোনও ফল হবে না। আপনার হাতে আমার বিকল্পে কোনও প্রমাণই নেই।’ শ্যামল আবার আরাম-আসনে বসে পড়ল প্রশান্তমুখে। তারপর সামনে দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে নিচিষ্ঠ ভাবে পাইপের ধূমপান করতে লাগল।

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ তাঁরই হয়েছে পরাজয়। বাসার দিকে ফিরে আসতে আসতে তিনি মনে মনে বারবার প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হোক, শ্যামলকে উচিতমতো শিক্ষা না দিয়ে কিছুতেই তিনি ছাড়বেন না।

তপোবনের ভিতরে প্রবেশ করে দূর থেকেই সবিশয়ে তিনি দেখতে পেলেন, একতলায় বাইরেকার দালানে দুখানা চেয়ারের উপরে সামনাসামনি বসে আছে শোহনলাল এবং রঞ্জা।

রঞ্জার দৃষ্টি মেন উদ্ভাস্তের মতো। কিন্তু বসন্তকে দেখে তার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল ম্লান হাসির রেখা।

শোহন বললে, ‘মিনিট-খানেক হল রঞ্জাদেবী ফিরে এসেছেন। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।’

বসন্ত শুধোলেন, ‘আপনার কোনও বিপদ হয়নি তো?’

রঞ্জা মুদুরুষে বললে, ‘বিপদে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু রক্ষা পেয়েছি আশ্চর্যভাবে।’

—‘কেউ কি আপনাকে আক্রমণ করেছিল!’

—‘আজ্জে, হ্যাঁ।’

—‘কে সে?’

—‘জানি না। তার মুখে ছিল মুখোশ।’

শোহনলাল বললে, ‘এসব জিজ্ঞাসাবাদ এখন বক্স-রাখাই উচিত। সূর্যাস্তের সময় এসেছে, কিন্তু এখনও আমরা সবাই উপবাসী।’

বসন্ত বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। আহারাদির পরেও অস্তত রঞ্জাদেবীর কিছুক্ষণের বিআম দরকার। তারপর, গুরু থেকেই আমরা সব কথা শুনতে পাব।’

* * *

পৃষ্ঠা ৫

পৃষ্ঠা ৫

পৃষ্ঠা ৫

পৃষ্ঠা ৫

সঙ্গ্য উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। গোবিন্দদাসের লাইব্রেরিয়ে বসে বসন্ত ও শোহনলাল অপেক্ষা করছিলেন রঞ্জাদেবীর জন্য।

একটু পরেই রঞ্জা নীচে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসন্ত মনে মনে ভাবলেন, মেরোটির মনের জোর আছে বটে। এর শান্ত মুখে আর দৃশ্যমানের কোনও চিহ্নই নেই। এর মধ্যেই নিজেকে একেবারে সামলে নিয়েছে। প্রকাশে বললেন, ‘রঞ্জাদেবী, এইবারে আপনার মুখে সমন্ত কথাই আমরা শুনতে চাই’।

বাখো বাখো গলায় রঞ্জা বললে, ‘বসন্তবাবু, আমার বেশি কিছুই বলবার নেই। সকালে শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমি ওই উচ্চভূমিটির উপরে গিয়ে উঠেছিলুম। তারপর—তারপর—তারপর তিনি একলাই নিজের বাসায় চলে যান। আমি আরও কিছুক্ষণ সেইখানে বসে রইলুম। তারপর—’

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একজন ভৃত্য। বললে, ‘ভুবনবাবু দেখা করতে এসেছেন।’

রঞ্জা বললে, ‘তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।’

ঘরের দরজার কাছে এসেই রঞ্জাকে দেখে ভুবনবাবু সবিশ্বাসে বলে উঠলেন, ‘এই তো আপনি! বসন্ত বললেন, ‘ভিতরে আসুন। কী খবর ভুবনবাবু?’

সকলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভুবনবাবু বললেন, ‘রেভারেন্ড বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, কারা নাকি রঞ্জাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে?’

শোহনলাল বললে, ‘বিনয়বাবুর মুখে শোনা যায় যত সব আজ্ঞাব কথা!’

ভুবনবাবু একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন, ‘তাহলে খবরটা সত্য নয়? অত্যন্ত সুখের কথা! আমি—’

আচম্ভিতে তিনি স্তুতি হয়ে গেলেন, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি হয়ে গেল যেন সম্মোহিত। বসন্ত ফিরে ভুবনবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন নিঃশব্দে।

ঘরের একটা দরজা একটু একটু করে খানিকটা খুলে গিয়েছে এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একখানা বাহ!

বসন্ত বাথের মতো ঝাপিয়ে পড়লেন দরজার উপরে। কিন্তু তার আগেই সেই বাহ ঘরের বৈদ্যুতিক বাতির চাবিটা দিলে টিপে।

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে এল একটা দমকা হাওয়া—কে যেন সাঁৎ করে সরে গেল সেখান থেকে। বসন্ত দুই হাতে খুঁজে পেলেন কেবল শূন্যতাকে। পরমহৃতে তিনি যিনিরে আবার জুলিয়ে দিলেন আলো।

রঞ্জা দাঁড়িয়ে আছে হিঁর মৃত্তির মতো। শোহনলাল দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের উপরে হেলান দিয়ে, এক হাত তার কপালের সঙ্গে সংলগ্ন এবং তার হাতের তলা দিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে রক্তের কেঁটা!

এবং ঘরের মেঝের উপরে দুই হাত ছাড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভুবনবাবুর দেহ—তার বুকের উপরে আমৃত বিন্দু একখানা ছোরা!

বসন্ত উত্তেজিত কষ্টে বলে উঠলেন, ‘শোহনবাবু, শোহনবাবু, আপনি কারকে দেখতে পেয়েছেন কি?’

—‘হ্যাঁ। ক্ষণিকের জন্যে আমি দেখেছি রেভারেন্ড বিনয়বাবুর মৃত্তি!’

একাদশ

আগেকাৰ ঘটনা

১৫

ভুবনবাবু চিত্তিমুখে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁৰ চিন্তাসূত্ৰ ছিড়ে দিলে টেলিফোনেৰ ঘণ্টা।

—‘হ্যালো, ভুবনবাবু নাকি?’

—‘কথা কইছি।’

—‘আপনাকে যা যা কৰতে বলা হয়েছিল, তা আৱ কৰতে হবে না। যতদিন না নতুন কোনও নিৰ্দেশ পান, ততদিনে রঞ্জাদেৱীৰ কথা ভুলেও মনে আনবেন না। ফোন ছেড়ে দিন।’

‘রিসিভাৱটা তুলে রেখে ভুবনবাবু আৱাৰ হলেন চিন্তাপঞ্চ। তাঁৰ মনে হতে লাগল যতসব পৰম্পৰাবিৱোধী কথা। প্ৰধান প্ৰশ্ন হচ্ছে, হুকুম তামিল কৰব কি কৰব না?’

ভাবতে ভাবতেই স্টোডে জল ঢিয়ে নিজে চা তৈৰি কৰে তিনি পান কৰতে লাগলেন। তাৱপৰ চায়েৰ জিনিস সৱিয়ে পাঠ কৰতে লাগলেন রসায়নতত্ত্ব সম্পর্কীয় একখানা পুস্তক।

ঘটনাখনেক এইভাৱে কেটে গেল। তাৱপৰেই সদৱ দৰজাটাৰ কড়া সশব্দে নড়ে উঠল। ডাকহ্ৰকৱা এসেছে।

একখানা বৈজ্ঞানিক পত্ৰিকা, একখানা বইয়েৰ দোকানেৰ বিল আৱ একখানা খাম। খামেৰ ভিতৱ্বে চিঠিতে অচেনা-হাতে লেখা ছিল এই কথাগুলি

‘বৈকালে ফোনে তুমি যে নিৰ্দেশ পেয়েছে, বুদ্ধিমানেৰ মতো ঠিক সেই অনুস৾ৱে কাজ কৰবে। রঞ্জাদেৱীকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামিয়ো না।’

সচমকে তিনি আৱাৰ খামেৰ উপৰে ডাকঘৰেৰ ছাপেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰলেন। চিঠিখানা ডাকঘৰে গিয়েছে গতকল্যাকাৰ তাৰিখে। ব্যাপারটা অপাৰ্থিব বলেই মনে হয়। আজ বৈকালে কে তাকে কী নিৰ্দেশ দেবে, চৰিষ ঘণ্টা আগে এই অজ্ঞাত পত্ৰলেখক কেৱল কৰে তা জানতে পাৱলৈ?

চিত্তিত মুখে আৱাৰ তিনি টেলিফোনেৰ হাতলাটা টেবিলেৰ উপৰ থেকে তুলে নিলেন।

ঝঁঝঁঝঁ

ঝঁঝঁ

রঞ্জা উচ্চভূমিৰ উপৰ থেকে আৱাৰ মীচে নেমে এসে দাঁড়াল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলে, কে তাৰ নাম ধৰে ডাকছে ‘রঞ্জাদেৱী, রঞ্জাদেৱী।’

সে চেয়ে দেখলে পথেৰ উপৰ দাঁড়িয়ে আছে একখানা মোটৱিগাড়ি। একপাশে হেলে পড়ে মোটৱেৰ চালকই তাকে ডাকছে। তাৰ চোখে কালো চশমাৰ্হ এবং তাৰ মুখেৰ তলার দিকে এমনভাৱে চাদৰে ঢাকা যে, সে চেনা কি অচেনা লোক কিছুই বোৱাৰ উপায় নেই। সে ডাড়াতাড়ি বললে, ‘শিগগিৰি গাড়িতে উঠে পড়ুন! বসন্তবাবুৰ কাছে আপনাকে এখনই যেতে হবে—সেখানে এক বিষম দুষ্টিনা ঘটেছে।’

কিছুই না ভেবেচিষ্টে রঞ্জা টপ কৰে গাড়িৰ ভিতৱ্বে উঠে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দিল ছেড়ে। কিন্তু পৰমুহূৰ্তেই তাৰ মন হয়ে উঠল সন্দিগ্ধ। গাড়িৰ ভিতৱ্বে প্ৰায় অক্ষকাৰ, তাৰ সমস্ত জানলা কালো পৰ্দা দিয়ে ঢাকা। সে আৱাৰ গাড়িৰ দৰজাটা খোলবাৰ চেষ্টা কৰলে, পাৱলে না। হাতল ঘুৰল বটে, দৰজা তবু খুলল না।

তাৱপৰ অত্যন্ত আচমকা সে শুনতে পেলে একটা কঠিনৰ

‘রঞ্জাদেবী, চিহ্নিত হবেন না।’

এতক্ষণ পরে সচকিত চক্ষে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই বসে আছে একটা মূর্তি।

—‘কে আপনি?’

—‘আমার পরিচয়ের দরকার নেই।’

—‘গাড়ির ভেতরটা অঙ্ককার কেন?’

—‘আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আপনি জানতে পারবেন না বলে।’

রঞ্জা আর কিছু বললে না, তার মাথার ভিতর দিয়ে বইতে লাগল দৃশ্যমান ঘড়ি।

কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা।

তারপর লোকটা আবার কথা কইলে। বললে, ‘আমরা প্রায় যথাস্থলে এসে পড়েছি। এইবার আমাকে আপনার চোখ বাঁধতে হবে।’

রঞ্জা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, ‘না, কিছুতেই আমার চোখ বাঁধতে দেব না।’

লোকটা মৃদুকষ্টে হাস্য করে বললে, ‘বাধা পেলে আমি বলপ্রকাশ করতে বাধ্য হব। সুতরাং চুপ করে বসে থাকুন।’

গাড়ি তখন ছুটেছে না, দাঁড়িয়ে পড়েছে। তালো করে তার চোখ দুটো বেঁধে ফেলে লোকটা বললে, ‘এইবারে গাড়ি থেকে নীচে নামুন।’

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল। লোকটা তার দ্বাই হাত ধরে তাকে গাড়ির ভিতর থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর খানিক দূর অগ্রসর হয়ে বললে, ‘এইবারে আপনার সামনে সিঁড়ির তিনটে ধাপ। উপরে উঠুন।’ তারপর সে তার হাত ধরে নিয়ে গেল কোনও বাড়ির ভিতর দিকে। বললে, ‘আপনার পিছনেই চেয়ার, বসুন।’

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে রঞ্জা একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর সে অনুভব করলে, চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে কে তার হাত-পা-দেহ সব বেঁধে ফেলেছে। তারপর খুলে গেল তার চোখের বন্ধনী।

দেখলে, সে বসে আছে একখানা বেশ বড়ো ঘরের ভিতরে। ঘরের দেওয়ালগুলো ঢেকে রয়েছে তাকের পর তাক এবং তাদের উপরে রয়েছে ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা আকারের শিশি ও বোতল। একটা টেবিলের উপরে দেখা যাচ্ছে অন্তর্ভুক্ত আকারের কাচ ও ধাতু দিয়ে তৈরি পাত্রাদি।

রঞ্জা অনুমান করলে, সে বসে আছে কোনও রসায়নশালার ভিতরে।

তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লোক। কালো কাপড় দিয়ে তার মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা, কেবল দেখা যাচ্ছে তার দুটো জুলন্ত চক্ষু।

অজানা লোক বললে, ‘এইবারে আমি যা বলব, লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপ করে তা শোনো। সাবধান, দুষ্টি কোরো না। ‘নাইট্রোক্লোরিক অ্যাসিডের’ নাম শুনেছ কি? গায়ের চামড়ার উপরে তার এক ফেঁটা পড়লেই যাতনায় তুমি ছটফট করবে। সেই এক ফেঁটা ‘অ্যাসিড’ একেবারে তোমার গায়ের মাংসের ভিতরে চুকে যাবে।’

রঞ্জা কোনওরকম তারের ভাব না দেখিয়ে ধীরে ধীরে বললে, ‘আপনি কী বলতে চান?’

—‘নাইট্রোক্লোরিক’ কিংবা ‘ভিট্রিয়ল’—কোন ‘অ্যাসিডটা তুমি বেশি পছন্দ করো?’

—‘তোমার মতো শয়তানের হাতের স্পর্শের চেয়ে যে-কোনও অ্যাসিডকেই আমি বেশি পছন্দ করি।’

লোকটা নীরবে একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাক থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, ‘এর ভেতরে আছে ‘নাইট্রোক্লোরিক অ্যাসিড’। এর একটুখানি তোমার মুখে ঢেলে দিলে, তোমার মুখের দিকে এ জীবনে আর কেউ ফিরে তাকাবে না। এখন সোজাসুজি বলো দেখি, তোমার বাবার গুণ্ঠন আছে কোথায়?’

—‘সোজা তুমি নিজেই খুঁজে দেখতে পারো।’

লোকটা বললে, ‘তুমি খালি বোকার মতো নয়, পাগলের মতো কথা কইছ। অনেক বৎসর আগে দৈবজ্ঞমে এই অ্যাসিডের এক ফেঁটা আমার হাতের উপর পড়ে গিয়েছিল। এই দ্যাখো, আমার হাতে এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। অ্যাসিডের সেই একটিমাত্র ফেঁটা আমার হাতের মাংস পুড়িয়ে চলে গিয়েছিল হাড় পর্যন্ত। তেমন অসম্ভব যন্ত্রণা এ জীবনে আমি আর কখনও সহ্য করিনি। এই অ্যাসিডেরই চলিঙ্গ-পঞ্চাশ ফেঁটা আজ যদি তোমার মুখের উপরে ফেলে দিই, তাহলে ওই সুন্দর মুখের অবস্থা কী হবে, আনন্দজ করতে পারছ কি? আশা করি, তুমি নির্বোধ নও।’

রঞ্জা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, ‘নির্বোধ হচ্ছ তুমি! তেবেছ আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ হাল্কিল করতে পারবে? কখনও না।’

—‘তাহলে গুপ্তধনের সন্ধান আমায় দেবে না?’

ঢুঁ—‘না, না, না।’

ঢুঁ—‘এই তোমার শেষ কথা?’

ঢুঁ—‘ঠাঁ, এই আমার শেষ কথা।’

শুন্মে বোতলের কাঢ়ের ছিপি খুলে ফেললে। তারপর বোতলটা তার মুখের খানিকটা উপরে তুলে ধরে দৃঃষ্টব্যে বললে, ‘এই শেষবার জিজ্ঞাসা করাই, তুমি বলবে কি বলবে না?’

প্রাণপন্থে চিৎকার করে রঞ্জা আবার বলে উঠল, ‘না, না, না! কিছুতেই না!’

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সজোরে ঘন ঘন নড়ে উঠল সদর দরজার কড়।

সে বললে, ‘কেউ ডাকতে এসেছে। তোমার ভাগ্য ভালো অস্তুত কয়েক মিনিটের জন্যে রেহাই পেয়ে গেলে। আশা করি, এর মধ্যেই তোমার মত পরিবর্তন করবে।’ লোকটা ঘুর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সদর দরজা খুলেই একটু চমকে উঠল। কিন্তু পরমহৃতেই নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ কঢ়ে সে বললে, ‘রেভারেন্ড বিনয়বাবু যে! ভিতরে আসুন! কী খবর?’

—‘নমস্কার মশাই! বলতে বলতে বিনয়বাবু বাড়ির ভিত্তিতে প্রবেশ করলেন।

লোকটার মুখে তখন আর কালো ন্যাকড়া জড়ানো ছিল না। বিনয়বাবুর সামনে স্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন ভুবনবাবু।

বিনয়বাবু বললেন, ‘ভুবনবাবু, হঠাৎ আমার এই আবির্ভাবে হয়তো আপনি খুশি হবেন না। কিন্তু উপায় কী বলুন? বসন্তবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন রঞ্জাদেবীর জন্যে। আমার এখানে আসবার কারণ হচ্ছে তাই।’

—‘কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন? রঞ্জাদেবীকে আমি আজ চোখেও দেখিনি।’

বিনয়বাবু বললেন, ‘তাই নাকি? আজকে বৈকালবেলা কোনও ব্যক্তি কি আপনাকে ফোনে ডেকে ঠিক এই কথাগুলি বলেনি—‘নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত রঞ্জাদেবীর কথা ভুলেও মনে আনবেন না।’ তারপরেও কি আপনি ডাকে একথানা চিঠি পাননি, যাতে লেখা ছিল—’

ভূবনবাবু অত্যন্ত গভীর কষ্টে বললেন, ‘বিনয়বাবু, আপনার প্রত্যেক কথটাই আমি ধাপ্পা বলে মনে করি।’

—‘সত্তি নাকি? তাহলে অনুমতি দিন, আমি আপনার বাড়ির ভিতরটা একবার তল্লাশ করে দেবি।’

ভূবনবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, ‘চোপরাও, নকল পাদারি! আর পাঁচ সেকেন্ড যদি তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি লাখি মেরে তোমাকে বাড়ির বাইরে ফেলে দেব!’ বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এলেন একটা হিংস্র জন্মের মতো।

বিনয়বাবু দৃঢ়খিত ভাবে মাথা নড়তে নড়তে বললেন, ‘আপনার ভাবটা ঠিক উদ্ভজনোচিত বলে মনে হচ্ছে না। দয়া করে আপনার বাড়ির ভিতরটা আমাকে একবার দেখতে দিন।’ বলতে বলতে হঠাৎ তিনি পক্ষেটের ভিতর থেকে বার করলেন একটি ভারী ও মস্ত রিভলভার। তার নলচেটা নড়চড়া করতে লাগল ভূবনবাবুর বুক ও পেটের দিকে।

ভূবনবাবু বিদীর্ঘ কষ্টে সভয়ে বলে উঠলেন, ‘থামুন, থামুন, করছেন কী? এখনই যে রিভলভারটার শুলি ছুটে যাবে!

অতিশয় মিষ্ট হাসি হেসে প্রশংস্ত কষ্টে বিনয়বাবু বললেন, ‘তা শুলি ছুটে যেতে পারে। আমি হচ্ছি পাদারি, আঘেয়াত্মা ব্যবহারে মোটেই অভ্যন্তর নই। রিভলভারের শুলি নিশ্চয়ই আমার অজ্ঞানেই ছুটে যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই এখানে রঞ্জাদেবীর আবির্ভাব হলে ভালো হয় না কি?’ তাঁর আনাড়ি-হাতে রিভলভারটা ভূবনবাবুর বুকের উপরে আবার অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে নড়চড়া করতে লাগল।

ভূবনবাবু আঁতকে উঠে সরে গেলেন—রিভলভারটাও তাঁর বুকের উপরে এগিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে!

বিনয়বাবু তেমনি সহজ ভাবেই আবার বললেন, ‘আসল ব্যাপারটা কী মশাই? এটা কি চোরের উপরে বাটপাড়ি করবার চেষ্টা? আপনি নির্দেশ পেয়েছিলেন রঞ্জাদেবীকে নিয়ে মাথা না ঘামানোর জন্যে। সে নির্দেশ আপনি পালন করেননি কেন? কী কারণে আপনি আমান্য করেছেন দলপত্তির হৃকুম?’ প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ভূবনবাবুর বুকের কাছে ধৰে তিনি ঝাঁকানি দিতে লাগলেন!

মহা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে ভূবনবাবু বললেন, ‘উত্তম, উত্তম! রিভলভারটা আপনি সরিয়ে ফেলুন। রঞ্জাদেবীকে আমি দেখাচ্ছি।’

—‘ধন্যবাদ! রিভলভারের লক্ষ্য আপনার বুকের দিকেই স্থির হয়ে থাকবে, স্ফুলক্ষণ না আমি রঞ্জাদেবীকে এখানে সুস্থ শরীরে দেখতে পাচ্ছি। কোথায় আছেন তিনি?’

—‘আমার রসায়নশালায়।’

—‘আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে।’

—‘আসুন।’ ভূবনবাবুর পিছনে পিছনে বিনয়বাবু অগ্রসর হলেন।

ঘরের ভিতরে প্রথমেই প্রবেশ করলেন ভূবনবাবু। তাঁকে দেখেই রঞ্জার বুকটা শিউরে উঠল। তারপরেই রিভলভার উচিয়ে বিনয়বাবুর প্রবেশ। সেই দৃশ্য দেখে রঞ্জার মন চাইলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে।

—‘রঞ্জাদেবীর বাঁধন খুলে দিন।’

তৎক্ষণাতঁ কথামতো কাজ করলেন ভূবনবাবু।
বিনয়বাবু শুধোলেন, ‘রঞ্জাদেবী, গুণধন কোথায় আছে এর কাছে আপনি কি তা প্রকাশ করেছেন?’

—‘না।’
—‘উভয়। তাহলে চলে আসুন আমার সঙ্গে।’
রঞ্জা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিন্তু এ লোকটি কে?’
—‘সেই আপনার না জানলেই ভালো হয়। আর এক কথা। বসন্তবাবুর কাছে আপনি আমারও নাম করতে পারবেন না।’
—‘কেন পারব না?’

—‘তাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তবে তাঁকে কেবল এইটুকু বলতে পারেন যে, আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে মৃত্যি দেওয়া হয়েছে।’

১৫২ প্রচলিত সংস্করণ

চতুর্থ প

শোহনলাল

মন্তব্য

দ্বাদশ

চূম্পু চামুচু চুম্পু

মন্তব্য

কোটি টাকা

৫

শোহনলাল একখানা বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিষর্ব তাবে নিজের মুখের ক্ষতচিহ্নটা পরীক্ষা করছিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ‘বসন্তবাবু, মুখে আপনি দিনরাত শ্যামলবাবুর নাম করেন। কিন্তু তার হাতে হাতকড়া পরাবার কোনও চেষ্টাই করেন না কেন?’

বসন্ত তখন ভূবনবাবুর মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। মুখ তুলে বললেন, ‘এইবার আমি সেই চেষ্টাই করব।’

রঞ্জা বলে উঠল, ‘অসম্ভব! শ্যামলবাবু কখনওই ভূবনবাবুকে খুন করেননি। হতে পারে তিনি জেল খেটেছেন, কিন্তু তিনি খুন নন।’

শোহনলাল সবিশয়ে বলে উঠল, ‘শ্যামলবাবু জেল খেটেছেন।’

বসন্ত দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘হ্যাঁ। তিনি বোম্বাইয়ের জেলখানায় এক বৎসর বন্দি ছিলেন। সেকথা এখন যাক। রঞ্জাদেবী, আপনি অন্য ঘরে গিয়ে থানায় একটা ফোন করে দিয়ে বলুন, এখানে যেনে, একজন ডাঙ্কার ও অ্যাম্বুলাস গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।’

রঞ্জা চলে গেল।

বসন্ত বললেন, ‘শোহনবাবু, এখন বলুন দেখি আপনার কপালে কেমন করে ওই ক্ষতচিহ্নটা হল?’

—‘আলো যেই নিবে গেল, আপনার মতো আমিও চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম। আঘাতটা পাই আমি দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতেই। ভাগ্যে আমি সামনের দিকে ঝুঁকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তাই আঘাতটা বুকে না লেগে আমার কপাল ঘেঁষে চলে যায়।’

আবার হাঁটু গেড়ে মৃতদেহের পাশে বসে পড়ে বসন্ত বললেন, ‘এর যে মৃত্যু হয়েছে, সেবিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ছোরাখানা বিংশে গেছে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। অন্ধকার ঘরের ভিতরে এমন

নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্য ছির করা বাহাদুরির কথা বটে! আপনি কি এমন ভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন?’

নীরস ঘরে শোহনলাল বললে, ‘জানি না। আমি যে-বিদ্যালয়ে পাঠ করেছি, সেখানে লক্ষ্যভেদের কৌশল শেখানো হত না। আপনি পারতেন?’

বসন্ত বললেন, ‘না, নিশ্চয়ই পারতুম না। ঘরটা কতকগুল অস্কার ছিল? চার সেকেন্ডের বেশি হবে না বোধহয়। তার মধ্যেই খুনি দরজ দিয়ে চুকে কাজ হাসিল করে ওই গবাক্ষের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। সে গবাক্ষের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হল কেন? এ ঘরের দরজা আছে একটিমাত্র। নিশ্চয়ই সে বুরো নিয়েছিল, আলো নিবলেই আমরা দরজার দিকে ছুটে যাব। আরও বোধা যায়, বাড়ির ভিতরটা আছে তার নখদর্পণে।’

—‘ওই দুরায়া পাদরিটাই এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত।’

—‘শোহনবাবু বিনয়বাবু নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে চুকে অঙ্কালনা করেননি। মাত্র চার সেকেন্ডের ভিতরে কেউ আলো নিবিয়ে ঘরের ভিতরে চুকে নরহত্যা করে আবার গবাক্ষ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে না।’

—‘কিন্তু আমি যে সেই পাদরিটাকে স্বচক্ষে দেখেছি?’

—‘ঠিক। বিনয়বাবু হয়তো কেবল আলোটাই নিবিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেননি। আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেগে দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলুম, বিনয়বাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে নিশ্চয়ই আমার হাতে ধরা পড়তেন।’

—‘তাহলে কে আমাকে আঘাত করলে আর ভুবনবাবুর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে?’

—‘এ হচ্ছে কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ।’

—‘দ্বিতীয় ব্যক্তি?’

—‘হ্যাঁ। একজন আলো নিবিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন বিদ্যুৎবেগে গবাক্ষ দিয়ে ঘরে চুকে খুন করে আবার সেই পথ দিয়েই সরে পড়েছে।’

বসন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে বইল শোহনলাল।

বসন্ত নিজের পকেটের ভিতর থেকে কুমাল বার করে অতি সাবধানে ভুবনবাবুর বক্ষে বিদ্ধ ছোরাখানার হাতলের শেষপ্রান্ত কুমাল দিয়ে চেপে ধরে অঙ্কটাকে টেনে বার করে ফেললেন। তারপর বললেন, ‘ছোরার উপরে আঙুলের ছাপ নিয়ে সাধারণত আমি আর্থা ঘায়াই না। কারণ, অপরাধী যদি উচ্চ শ্রেণির হয়, তাহলে সে কাজ করে হাতে দস্তানা করে, অন্তরে উপরে পাওয়া যায় না তার আঙুলের চিহ্ন। তবু এই ছোরাখানা আমি পুলিশের পরীক্ষাগারে পাঠাতে চাই। দেখি যদি কোনও হিসে পাওয়া যায়।’

গাত্রেখান করে বসন্ত ছোরাখানা সমত্বে একটা টেবিলের উপরে হাপন করলেন। তারপর বললেন, ‘চলুন, আমরা বৈঠকখানায় যাই। এইবার রত্নাদেবীকে আমার বিশেষ দরকার। কিন্তু এই বক্ষাঙ্ক মৃতদেহের সামনে কোনও মহিলার সঙ্গে আমি ভালো করে কথা কইতে পারব না।’

দুজনে বৈঠকখানার ভিতরে চুকে দেখলেন, রঞ্জা চুপ করে একটা টেবিলের ধারে বসে আছে গঢ়ীর ভাবে ও শ্রিয়মাণ মুখে।

তাঁদের দেখেই সে কাতর কষ্টে বলে উঠল, ‘বসন্তবাবু! শোহনবাবু! এ হচ্ছে অসহনীয়।’

বসন্ত শুঁড়োলেন, ‘কী অসহনীয় রঞ্জাদেবী?’

—‘এই হত্যার পর হত্যা! প্রথমে চন্দ্রকান্তবাবু তারপর আপনার গোয়েন্দা মন্দিরবাবু, তারপর এখন ওই ভুবনবাবু, এর পরেও হয়তো হবে আরও হত্যাকাণ্ড! একথা মনে করেও আমার বুক শিউরে শিউরে উঠছে।’

—‘কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী কে জানেন?’

—‘কে?’

—‘আপনি!’

রঞ্জা বিপুল বিশ্বাসে বলে উঠল, ‘আমি? আপনি কী বলছেন?’

—‘আমি ঠিক কথাই বলছি? যে-গুপ্তধনের লোভে এইসব হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তা যে কোথায় লুকানো আছে আপনি সেকথা জানেন। অথচ আপনি সেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে চান না। এর ফল কী হবে জানেন? হয়তো আপনাকে দেখতে হবে আরও অনেক হত্যাকাণ্ড।’

বিস্ফারিত চক্ষে বসন্তের দিকে রঞ্জা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নির্বাক মুখে। তার মুখের উপরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা আর্তভাব। তারপর সে একটা দীর্ঘশাস ফেলে ব্যথিতকঠে বললে, ‘আমি যদি গুপ্তধনের সঞ্চান না দিই, তাহলে আরও অনেক নরহত্যা হতে পারে।’

—‘নিশ্চয়ই!’

রঞ্জা শুরু হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট পর অত্যন্ত শাঙ্ক ঘরে সে বললে, ‘আপনি আমাকে কী করতে বলেন বসন্তবাবু?’

—‘গুপ্তধন কোথায় আছে আমাকে তা খুলে বলুন।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর হত্যাকারী যতদিন না ধরা পড়ে, গুপ্তধন থাকবে পুলিশের তত্ত্বাবধানে।’

—‘কিন্তু গুপ্তধন এখান থেকে হানান্তরিত করবার সময়ে অপরাধীরা আপনাকেও তো হত্যা করতে পারে।’

বসন্ত উচ্চ হাস্য করে বললেন, ‘আমি হচ্ছি গোয়েন্দা, বিগদের বেড়াজালের মধ্যে বাস করাই হচ্ছে আমার পেশা। আজ পর্যন্ত বহু লোক আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি।’

রঞ্জা আবার অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দৃশ্যমালের বললে, ‘ত্রৈশ, আপনার প্রস্তাবেই আমি রাজি হলুম।’

—‘রঞ্জাদেবী, এর চেয়ে সুসংবাদ আর হতে পারে না। গুপ্তধন কোথায় আছে?’

—‘এইখনেই আপনার হাতের কাছেই।’

বসন্ত ও শোহনলাল ঘরের চারদিকে বিশ্বিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন। ঘরের চারদিকেই দেওয়ালের সামনে রয়েছে সারিসারি প্ল্যাটকে পরিপূর্ণ আলমারি। তারই মাঝে মাঝে মার্বেলের স্তম্ভের উপরে দাঁড় করানো আছে এক-একটা শিলামূর্তি। ঘরের ঠিক মাঝখানে লেখবার বড়ো টেবিলটার সামনে খেতপাথরের একটি প্রমাণ মানুষের মৃত্তি। একখানা সোফার উপরে উপরিষ্ঠ এক প্রোট পুরুষ। সেটি হচ্ছে রঞ্জার পিতা ঋগীয় গোবিন্দদাসের মৃত্তি।

রঞ্জা মৃদু হেসে বললেন, ‘বসন্তবাবু, আমার বাবা গুপ্তধন এখনও তাঁর কাছছাড়া করেননি।’

—‘তার মানে?’

—‘তার মানে, বাবার ওই মূর্তির ভিতরেই আছে তাঁর গুণধন। দশ হাজারখানা হাজার টাকার নোট!*

অত্যন্ত কৌতৃহলী হয়ে বসন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গোবিন্দদাসের প্রতিমূর্তির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গেল শোহনলাল। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও বসন্ত বুঝতে পারলেন না, তার মধ্যে গুণধন কী উপায়ে লুকিয়ে রাখা চলতে পারে। নিজের রিভলভারের হাতল দিয়ে মূর্তির উপরে আঘাত করতে করতে বসন্ত বললেন, ‘বঢ়াদেবী, আপনি আমার সঙ্গে কোতুক করছেন? এ তো দেখছি নিয়েট পাথরের মূর্তি! এর ভিতরটা তো ফাঁপা বলে মনে হচ্ছে না।’

রঞ্জা বললে, ‘মূর্তিটাকে আপনারা টেনে সরিয়ে আনতে পারেন?’

তাঁরা দুজনে মিলে অনেক টানাটানি করেও সেই বিষম ভারী মূর্তিটাকে একচূলও সরাতে পারলেন না।

রঞ্জা আবার হাসতে হাসতে বললে, ‘আপনাদের আর চেষ্টা করবার দরকার নেই। একশোজন লোক একসঙ্গে চেষ্টা করলেও ও-মূর্তিটিকে ওখান থেকে একটুও সরাতে পারবেন না। মূর্তিটিকে শান্ত্যত করতে পারি কেবল আমিই। একলাই!

রঞ্জা আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর মূর্তির ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালের গায়ে যে আলমারিটা ছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে আলমারির তলার দিকে হাত দিয়ে বোধহ্য একটা চাবি বা কোনওরকম কল টিপে দিলে।

তারপরই বসন্ত এবং শোহনের সচিকিৎ দৃষ্টির সামনেই সেই সোফাসুক্ত সমগ্র মূর্তিটা দেওয়ালের গা থেকে ধীরে ধীরে সরে এল প্রায় দেড় হাত।

রঞ্জা বললে, ‘এইবাবে মূর্তির পিছনে গিয়ে সোফার তলার দিকে তাকিয়ে দেখুন।’

কথামতো কাজ করে বসন্ত চমৎকৃত হয়ে দেখলেন, সোফার গায়ে রয়েছে ছোটো একটা লোহার দরজা। একটি ছোটো চাবি বার করে বসন্তের হাতে দিয়ে রঞ্জা বললে, ‘দরজা খুলে ভিতরে হাত বাড়ালেই গুণধন পাবেন।’

সোফার ভিতরে হাত চালিয়ে বসন্ত টেনে বার করলেন একটা বড়ো ক্যাশবাস্ক। তার ভিতরেই পাশে পাশে থাকে সাজানো ছিল দশ হাজারখানা হাজার টাকার নোট—অর্থাৎ পূর্ণ এক কোটি টাকা!

শোহনলাল বিস্ফারিত নেত্রে অভিভূত কঠে বললে, ‘চোঁড়া সামনে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এক কোটি—অর্থাৎ একশো লক্ষ টাকা! এমন দৃশ্য দেখলম জীবনে এই প্রথম। এক লক্ষ টাকার জন্যে অনেকেই অনেক মানুষকে খুন করতে পারে। আর একশো লক্ষ টাকার জন্যে মানুষ করতে পারে না বোধহ্য এমন কোনও কাজই নেই।’

মুখে একটা গভীর পরিত্তিপ্রির ভাব নিয়ে ক্যাশবাস্কটা ঝুকের উপর জড়িয়ে ধরে বসন্ত অগ্রসর হলেন দরজার দিকে।

শোহনলাল বললে, ‘কোথায় যাচ্ছেন আপনি?’

—‘থানায়। বাস্কটাকে মালখানায় জমা দিয়ে আসব।’

* তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট চলতি ছিল।

—‘এই রাত্রে সেটা নিরাপদ হবে কি?’

—‘এর উপরে যদি কেউ লোড করে, তাহলে তাকে কালকের সূর্যোদয় দেখতে হবে না।’

—‘আমিও আপনার সঙ্গে যাব?’

—‘নিশ্চয়ই নয়। আপনাকে এখন থাকতে হবে রঞ্জাদেবীর কাছে।’

জয়েশ চৌধুরী

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে আসতেই সুবোধ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

বসন্ত বললেন, ‘তুমি রঞ্জাদেবী আর শোহনবাবু, দুজনেই উপরে তৈক্ষণ্যপ্রাপ্তি রেখো। আজ যেন আর কোনও দুর্ঘটনা না হয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।’

একহাতে কাশবাঞ্চ এবং আর একহাতে রিভলভার নিয়ে চতুর্দিকে তৈক্ষণ্যপ্রাপ্তি করতে করতে এগিয়ে চললেন বসন্ত। পথেই পড়ল বিনয়বাবুর বাড়ি। তার একতলার একটা ঘরে জুলছে উজ্জ্বল আলো। পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোনা গেল দুইজন লোকের কষ্টস্বর।

শ্যামল ও বিনয়বাবুর পরিচিত কষ্টস্বর। বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, বিনয়বাবু টেবিলের সামনে চেয়ারের উপরে বসে আছেন এবং শ্যামল একটা সিগারেট টানতে টানতে ধীরে ধীরে পদচালনা করছে।

শ্যামল বলছিল, ‘এইমাত্র কী দেখে এলুম জানেন? পুলিশের ধূর্ত শেয়ালটা গুপ্তধন হস্তগত করেছে।’

বিনয়বাবু বললেন, ‘কে, বসন্তবাবু?’

—‘হ্যাঁ। গুপ্তধন আর নিশ্চয়ই তপোবনের ভিতরে থাকবে না। এই রাত্রেই বসন্ত তা থানায় জমা দিয়ে আসবে। সেই সময় তাকে আক্রমণ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার হাতে আছে রিভলভার আর অব্যর্থ তার লক্ষ্য।’

—‘শোহনলাল এখন কোথায়?’

—‘তপোবনে, রঞ্জাদেবীর কাছে। যাক সে কথা। ভুবনবাবু যে মারা পড়েছেন এ বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই তো?’

—‘না। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই সে মারা পড়েছে। বোধ হয় তার প্রেতাঙ্গা বিস্মিত হয়ে এখন সেই কথাই ভাবছে।’

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে জুলন্ত সিগারেটের শেষ প্রান্তটা বাইরের দিকে নিষ্কেপ করে শ্যামল বললে, ‘পাদারিসাহেব, ভুবনের মত্ত্য যে অবশ্যভাবী এটা আমি ভালো করেই জানতুম। সে বিষ্ণ ঘটাতে চেয়েছিল, কাজেই তাকে নিতে হল শেষ বিদায়।’

বিনয়বাবু ধীরে ধীরে বললেন, ‘এই ব্যাপারে বিষ্ণ সৃষ্টি করছে আরও অনেকেই।’

—‘আপনি পুলিশের কথা বলছেন তো?’

—‘হ্যাঁ।’

—‘পুলিশের লোকগুলো হচ্ছে একেবারে অকেজো জীব। বসন্ত পথের কুকুরের মতো কেবল চিক্কারই করে, কিন্তু কামড়াতে পারে না। তবে শোহনলালকে নিয়ে আমি কিঞ্চিৎ দুর্ভাবনায় পড়েছি বটে। সে মোটেই চাঁচায় না, বোধহয় কামড়াতে জানে। এইবার তাকে নিয়ে আমাদের কিছু মাথা ঘামাতে হবে।’

—‘শ্যামলবাবু, অপেক্ষা করুন। সবুরে মেওয়া ফলে।’

৪৮

শ্যামল বললে, ‘হঁ। শোহনলালের ব্যবস্থা আজই আমি করতে পারি, কিন্তু আগাতত তা করব না। আরও দু-চার দিন অপেক্ষা করে দেবি।’

বিনয়বাবু বললেন, ‘সেই কথাই ভালো। রাত বাড়ছে। আজকের মতো আসর ভঙ্গ করা যাক।’ এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বসন্ত আবার থানার দিকে এগিয়ে চললেন দ্রুতপদে এবং চলতে চলতে বারংবার তিনি শ্যামলের কথা ভাবতে লাগলেন—‘বসন্ত পারে খালি চাঁচাতে, আর শোহন পারে একেবারেই কামড়াতে।’ নিজের মনেই মুখ টিপে তিনি একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন, ‘দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কেই বা চাঁচায় আর কেই বা কামড়ায়!'

শ্যামল, বিনয়বাবু

৩

৩

অরোদশ

৩

আর্তনাদ

পরদিনের সকালের চায়ের আসর। টোবিলের একদিকে রঞ্জা, আর একদিকে বসন্ত ও শোহন। বসন্ত শুধুলেন, ‘রঞ্জাদেবী, যে রাত্রে চন্দ্রকান্ত মারা পড়ে, আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?’

রঞ্জা একটু চমকে উঠে বললে, ‘আপনি কি আমাকে দেখেছিলেন?’

—‘আপনাকে দেখিনি, কিন্তু আপনার জুতোর দাগ দেখেছি। এতদিন আমি একথা আগনার কাছে তুলিনি বটে, কিন্তু এইবারে ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। আমি যা অনুমান করেছি, সেটাও আপনি শুনে রাখুন। সেই রাত্রে, কী কারণে জানি না, তপোবন ছেড়ে আপনি আমবাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। তারপর প্রবেশ করেছিলেন ভাঙা কুঁড়েঘরের ভিতরে। সেখানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আপনার দেখা হয়। সেখানে আরও কেউ একজন গিয়েছিল, তাকে আমি জানি না, কিন্তু সে জুতোর তলায় বেঁধে রেখেছিল দুখানা কাঠের পাত। সে-ও হয়তো কুটিরের ভিতরে ঢুকেছিল, নয়তো গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজা বা জানলার সামনে। কিন্তু সেইরাত্রেই চন্দ্রকান্ত নিহত হয়। আপনি কুটির ছেড়ে দৌড়ে আমবাগানের বাইরে চলে আসেন। সেইখান থেকেই আপনার পায়ের দাগ অদৃশ্য হয় আর দেখা যায় সাদা সওয়ারের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। আপনি, চন্দ্রকান্ত মার্যাদা পড়বার আগে কিংবা পরে কুটির ছেড়ে চলে আসেন, কিন্তু দুইবার শোনা যায় আপনার চিংকার। আপনার দ্বিতীয় চিংকারের পরেই দুই-দুইবার রিভলভার ছোড়ার আওয়াজ হয়। খুব সন্তুষ্ট চন্দ্রকান্তকে দেখেই আপনি চিংকার করে উঠেছিলেন। এই পর্যন্ত আমি অনুমান করতে পেরেছি। এর মধ্যে যদি কোথাও গলদ থাকে, সেইটে আপনি দয়া করে দেখিয়ে দিন।’

রঞ্জা মাথা নত করে নীরবে বসে রইল। তারপর কিছু ইতস্তত করে ধীরে ধীরে বললে, ‘বেশ, তাহলে সব কথাই খুলে বলছি। সেই রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর জানলার উপরে টিলের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি প্রথমে ভাবলুম, আপনার নিযুক্ত গোয়েন্দা বোধহয় কোনও কথা আমাকে বলতে চায়। জানলার কাছে গিয়ে দেখি, নীচে অক্কামের আবছা আবছা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। সে চাপা গলায় বললে, ‘আমি শ্যামল।’ এখনই আপনি বিষম বিপদে পড়ে পারেন।

তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে আমবাগানের ভিতরে চলুন। আমবাগানের সেই কুঁড়েঘরে। কোনও ভয় নেই, সব কথাই শুনতে পাবেন।' এই বলেই মৃত্তিটা দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে গেল।

আমি সেই কথামতেই কাজ করলুম। কিন্তু কুঁড়েঘরের ভিতরে গিয়ে লঠনের আলোতে দেখলুম, সেখানে শ্যামলবাবুর বদলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চন্দ্রকান্তবাবু। আমাকে দেশেই তিনি বায়ের মতো ঝাপিয়ে পড়ে আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। সেই সময়েই আমি প্রথমবার চিংকার করে উঠি। কিন্তু পরমহুটেই চন্দ্রকান্তবাবু আমার মুখের উপরে হাত চেপে ধরে দুঃস্থরে বললেন, 'কোথায় আছে শুণ্ঠন? এখনই আমার কাছে বলো! নইলে টুকরো টুকরো করে তোমাকে কেটে ফেলব।' আমি কোনও ক্রমে তাঁর হাত ছাড়িয়ে সরে আসি এবং তারপরেই দ্বিতীয়বার চিংকার করি। তারপরেই উপরি দুইবার রিভলভারের শব্দ হয়। চন্দ্রবাবু ঘুরে মাটির উপরে পড়ে যান। আমিও ভয়ে আঘাতহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে আমবাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পথের উপর দাঁড়াই। ঠিক সেইখানেই ঘোড়ার উপর বসেছিল সাদা সওয়ার। আমি ঢোকের পলক ফেলবার আগেই সাদা সওয়ার একটানে আমাকে মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার উপরে নিজের পিছন দিকে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'কোনও ভয় নেই। আবার যেন চিংকার করবেন না। পিছন দিক থেকে আমার দেহ জড়িয়ে থাকুন। আমি এখনই আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।' আমাকে বাধ্য হয়েই তার কথায় বিশ্বাস করতে হল। কিন্তু সাদা সওয়ার তার বাক্য রক্ষা করেছিল। সে তপোবনের সামনে এসে আমাকে ঘোড়ার উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমি বাড়ির উপরে উঠে জামাকাপড় বদলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম, আর ঠিক সেই সময়েই জানলার বাইরে হল আপনার আবির্ভাব। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

বসন্ত বললেন, 'আমারও আর কিছু জানবার নেই। আপনি যে সত্যকথাই বলছেন, তাও আমি বুঝতে পারছি।'

রঞ্জা নিজের চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বসন্তবাবু, আপনার তো চারটে এগপোচ, আটখানা টোস্ট আর চার পেয়ালা চা না হলে চলে না।'

বসন্ত লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, 'রঞ্জাদেবী, আমার বগুর বিপলজ্জা তো দেখতেই পাচ্ছেন? আহারের আয়োজনও প্রচৰ না হলে কী করে আমার পোষায় বলুন দেবি?'

রঞ্জা বললে, 'বেশ, আমি আরও কিছু 'অধিকন্ত' আনতে বলি আপাতত উপরে যাচ্ছি। আমাকে এখনই জামাকাপড় বদলে একবার বাড়ির বাইরে যেতে হবে।'

—'বাড়ির বাইরে! কোথায়?'

—'বিনয়বাবুর ওখানে। গির্জা সংক্রান্ত কী জুরি ব্যাপারে আমাকে তিনি একবার ডেকেছেন।'

—'কিন্তু বাড়ির বাইরে না গেলেই কি ভালো হয় না রঞ্জাদেবী?'

রঞ্জা কৌতুকভরে হেসে উঠে বললে, 'এই সকালবেলা, এখন আবার ভয় কীসের?'

বসন্ত সন্দিক্ষ স্থারে বললেন, 'কিন্তু বিনয়বাবুকে আমি সন্দেহ করি না। আমি জানি, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।'

এই বলে সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোহনলাল ধ্বালে একটা সিগার এবং বসন্ত করতে লাগলেন টোস্ট ও পোচ-এর সম্বন্ধার।

হঠাতে দরজার উপরে দেখা দিলে পিয়নের মৃত্তি। সে বললে, ‘বাবুজি, টেলিগ্রাম।’

বসন্ত একটা গোটা এগপোচ বদনগুরে নিক্ষেপ করে টেলিগ্রামের লেফাফা ছিঁড়ে জড়িত ঘরে বললেন, ‘পুলিশ কমিশনারের টেলিগ্রাম।’

শোহনলাল বললে, ‘ব্যাপারটা কী?’

বসন্ত বললেন, ‘যে ছোরার আঘাতে ভুবনবাবু মারা পড়েছেন, তার হাতলের উপরে কোনও আঞ্চলের দাগ আছে কি না, তা পরীক্ষা করবার জন্যে ছোরাখানা আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, একথা মনে আছে তো?’

শোহনলাল বললে, ‘হ্যাঁ। পরীক্ষায় কিছু সাবস্ত হয়েছে কি?’

বসন্ত টেলিগ্রামখানার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ‘ওঁ, এ যে অভাবিত কাণু?’

শোহনলাল অত্যন্ত কৌতুহলী কঠে বলে উঠল, ‘তার মানে?’

বসন্ত ইংরেজিতে লেখা সেই টেলিগ্রামখানা উচ্চকঠে পাঠ করে যা শোনালেন, বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায় এই

‘ছোরার হাতলের উপরে আঞ্চলের ছাপ শনাক্ত হয়েছে। ভুবনচন্দ্র বিশ্বাস দাগী অপরাধী। জালিয়াতির জন্যে সে তিন বৎসর জেল খেটেছিল। সে আর কখনও জেল খাটেনি। ছোরার হাতলে আছে তারই আঞ্চলের দাগ।

—সুধাকান্ত’

ঠিক সেই সময়েই রঞ্জার কঠে দূর থেকে একটা আর্টনাদ ভেসে এল—‘বসন্তবাবু, বসন্তবাবু, বসন্তবাবু!’

বসন্ত একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘এ যে রঞ্জাদেবীর চিংকার! আসুন, আসুন! শিগগির বাইরে আসুন।’

তাঁরা ছুটপদে বাইরে গিয়েই শুনতে পেলেন, বেগে ধাবমান একখানা মোটরগাড়ির শব্দ।

১০ ক্ষণ

প্রয়োজন ১০০

চতুর্দশ ডেমলারের পরিণাম

রাস্তার উপরে এসে পড়ে বসন্ত বললেন, ‘গাড়ির শঙ্গটা এল বিনয়বাবুর বাড়ির দিক থেকেই। শ্যামলবাবুর মোটরের ‘গের্যাজ’ ওইখানেই। দোড়ে আসুন, দেখা যাক শ্যামলের ‘ডেমলার’ খানা ওখানে আছে কি না।’

বেগে ছুটতে ছুটতে তাঁরা বিনয়বাবুর বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। কিন্তু ডাকাডাকি করেও পাওয়া গেল না বিনয়বাবুর কোনও সাড়াশব্দ। ‘গের্যাজের’ সামনে গিয়ে বসন্ত দেখলেন, তার দরজা খোলা এবং ভিতরে শ্যামলের গাড়ির কোনও চিহ্নই নেই।

শোহনলালের হাত ধরে টেনে উর্ধ্বর্ষামে ছুটতে ছুটতে বসন্ত বললেন, ‘আর একটুও দেরি করা নয়। শ্যামল নিশ্চয়ই রঞ্জাদেবীকে নিয়ে সরে পড়েছে। চট করে আপনার গাড়িখানা বার করে ফেলুন। মোটর চলতে পারে এখানে কেবল এই একটিমাত্র রাস্তাই আছে। আমরাও শ্যামলের পিছনে পিছনে যাব।’

শোহন তার গাড়ি বার করতে দেরি করলে না। টপ করে চালকের আসনে বসে পড়ে সে বললে, 'কিন্তু শ্যামলের 'ডেমলার' কোনদিকে গিয়েছে আমরা তা জানি না তো!'

বসন্ত গাড়ির ভিতরে ঢুকে বসে পড়ে বললেন, 'খুব সংগৃহ কলকাতার দিকে। চালান গাড়ি।' গাড়ি বেগে ছুটল।

বসন্ত বললেন, 'শ্যামলের গাড়ি প্রায় দশ-বারো মিনিট আগে বেরিয়ে গিয়েছে। তার নাগাল ধরতে হলে আমাদের আরও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে হবে।'

শোহন গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলে।

বসন্ত অধীর ঘরে বললেন, 'আরও তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি!'

গাড়ি ছুটল আরও তাড়াতাড়ি। ষষ্ঠায় বিশ, পাঁচিশ, তিরিশ,—ক্রমে চলিশ মাইল বেগে মোটর হল ধাবমান।

বসন্ত বললেন, 'আরও তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি!'

এ কথা

—'দুর্ঘটনা হবে যে!'

ব্যক্তি

—'হোক! যেমন করে পারি শ্যামলকে আজ ধরবই!'

গাড়ির বেগ ক্রমে উঠল ষষ্ঠায় পঞ্চাম মাইলে।

তখনও শ্যামলের গাড়ির কোনওই পাত্র না পেয়ে বসন্ত বললেন, 'বেগ আরও কিছু বাড়িয়ে দিন!'

ষষ্ঠায় ষাট মাইল! পথের দু-পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি ও লোকজন বিদ্যুৎবেগে কাছে এসে পড়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পিছন দিকে। পথ দিয়ে আরও যেসব গাড়ি যাতায়াত করছিল সেগুলো কোনওক্রমে এপাশে ওপাশে সরে গিয়ে তয়াবহ দুর্ঘটনার কবল থেকে আঘাতের করলে।

সামনের দিকে তাঁকু দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাতে শোহন বললে, 'ভূবনবাবুর ছেরার উপরে আছে কেবল তাঁরই আঙ্গুলের দাগ!'

—'হ্যাঁ। তাই থাকবে বলেই আমারও সন্দেহ হয়েছিল।'

—'মানে? আপনি কি বলতে চান, ভূবনবাবু আঘাতো করেছেন?'

—'হ্যাঁ, দায়ে পড়ে।'

শোহন আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সময় পেলে না, কারণ প্রকাণ্ড একখানা লরি মোড় ফিরে প্রায় তাদের উপরে এসে পড়ল, সে কোনও রকমে সামলে নিয়ে পুল কাটিয়ে আবার হল অগ্রগামী।

তাদের গাড়ি ছুটছে, ছুটছে, ছুটছেই! তবু শ্যামলের গাড়ি হল না দৃশ্যামন। বসন্ত ভাবতে লাগলেন, তাঁদের ফাঁকি দেবার জন্যে শ্যামলও কি তার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে অতিরিক্ত বেগে?

হঠাৎ শোহন চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী ব্যাপার! এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের গাড়ির গতি কুন্ড করে ফেললে।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে একখানা লালরঙের 'ডেমলার' গাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সেখানে জড়ে হয়েছে কৌতুহলী জনতা। একজন কনস্টেবলকেও দেখা গেল।

বসন্ত গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে বললেন, 'কতক্ষণ আগে এই ষটনাটা ঘটেছে?'

কনস্টেবল বললে, 'মিনিট দশ-বারো হবে।'

—'গাড়ির লোকজনরা কোথায় গেল?' ৩৩

- ‘গাড়ির ভিতরে লোকজন কেউ ছিল না।’
 —‘কী পাগলের মতো কথা বলছ! তবে গাড়ি চালাচ্ছিল কে?’
 —‘কেউ গাড়ি চালাচ্ছিল না। গাড়িখানা আপনি তিরের মতন ছুটে এসে ওই গাছটার খাণ্ডে ধাক্কা মেরে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। স্বচক্ষে সব দেখেছি।’
 বসন্ত হতভবের মতো শোহনের মুখের উপর দৃষ্টিগত করলেন।
 শোহন একটু ভেবেই বলে উঠল, ‘ওহো, বুঝতে পেরেছি!’
 —‘বুঝতে পেরেছেন? কী বুঝতে পেরেছেন?’
 —‘শ্যামল নিজেই নেমে পড়ে তার গাড়িখানাকে চালিয়ে দিয়েছে ধ্বংসের মুখে।’
 —‘এমন একখানা দামি গাড়িকে কেউ কখনও ওভাবে নষ্ট করতে পারে?’
 —‘তার পক্ষে তা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। পাছে আমাদের হাতে ধরা পড়ে, সেই ভয়ে সে রঞ্জকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অন্য কোথাও সরে পড়েছে।’

বসন্ত চিহ্নিত মুখে খানিকক্ষণ স্তুতি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ‘এ অনুমান সত্য বলে মনে হচ্ছে। শ্যামল যদি কোনও অলিগনির ভিতরে রুকে পড়ে থাকে, তাহলে আজ তার শৌর্জ পাওয়া অসম্ভব। আমরা কলকাতার কাছেই এসে পড়েছি। শ্যামলও নিশ্চয় কলকাতায় গিয়ে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে। অতএব আমাদেরও এখন হাজির থাকতে হবে কলকাতাতেই। চলুন।’

রাধাপুর থেকে বেরিয়ে গাড়ির গদিতে আরাম করে ঠেসান দিয়ে বসে শ্যামল ডেমলারখানা চালাচ্ছিল থীরে সুষ্ঠে। জরুরি কাজে আজকে একবার কলকাতায় যেতে হবে।

খুব ভালো লাগছিল তার আজকের প্রভাতকালকে। রোদ এখনও তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বাতাসেও পাওয়া যাচ্ছে মিঞ্চিতার স্পর্শ। নির্মৈ আকাশে অনাহত নীলিমা। গাছে গাছে পাখদের গানের সূর শুনে, তারও গান গাইতে সাধ হল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই গুণগুন করে গান গাইতে গাইতে সে ভাবতে লাগল। রাধাপুরে রঞ্জকে একলা ফেলে কলকাতায় তার বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। রাধাপুর হচ্ছে বিপজ্জনক স্থান। রঞ্জ বিপদে পড়তে পারে যে-কোনও মৃহুত্তেই। যদিও তার চারিদিকেই আছে পুলিশের পাহারা, কিন্তু পুলিশের সর্তর্করার উপরে তার একটুও বিশ্বাস নেই। এই তো বসন্তবাবুর প্রায় চোখের উপর থেকেই রঞ্জকে ধরে নিয়ে প্রিয়েছেন ভুবন। বিনয়বাবু এখানে না থাকলে রঞ্জার ভাগ্যে যে কী হত, তা কিছুই বলা যায় ন্যৌ থ্যাঁ, তাকে আজ রাত্রেই কলকাতা থেকে আবার ফিরে আসতে হবে।

আচম্ভিতে তাকে পিছনে ফেলে তীব্রবেগে এগিয়ে গেল একখানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি। তার জানলাগুলো পর্দা দিয়ে ঢাকা বটে, কিন্তু হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল যে মুখ, তা দেখেই, শ্যামল অত্যন্ত চমকে উঠে সিখে হয়ে বসল। সে হচ্ছে রঞ্জার ভয়ার্ট এবং পাণ্ডুর মুখ!

তৎক্ষণাত সে নিজের গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু আগেকার গাড়িখানা এমন অসম্ভব বেগে ছুটে যাচ্ছিল যে, সে তার নাগাল ধরতে পারলে না। তারও গাড়ির বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠল এবং বাড়তে বাড়তে অবশ্যেই দাঁড়াল গিয়ে ঘন্টায় যাট মাইল। মিনিটে মিনিটে মাইলের পর মাইল পার হয়ে দুখানা গাড়ি হ হ করে ছুটে চলল উক্কা বেগে।

দাঁতে দাঁতে চেপে শ্যামল আকুল কঠে বলে উঠল, ‘হে ভগবান! হয় রত্না, নয় মৃত্যু।’

পৃথিবীর আর সমস্ত দৃষ্টি লুণ্ঠ হয়ে গেল তার সমুখ থেকে—তার বন্য দৃষ্টির সামনে এখন জেগে আছে খালি ওই অগ্রগামী গাড়িখানা। ধরতেই হবে, ওর নাগাল ধরতেই হবে। প্রাণগতে সে তার গাড়ির গতি করে তুলনে দ্রুততর। নিজের গাড়ির ডান দিকের দরজাটা খুলে ফেললে একটাঁটা। ধীরে ধীরে সে অন্য গাড়িখানার বাম পাশ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে দুখানা গাড়িই ছুটতে লাগল ঠিক পাশাপাশি হয়ে সমান বেগে।

তারপর শ্যামল যে কাণ্ড করলে, উচ্চত ছাড়া তা আর কেউ করতে পারে না। কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই হঠাতে সে নিজের ‘ইল’ ছেড়ে দিয়ে একলাকে পাশের গাড়ির পাদানির উপরে লাফিয়ে পড়ে সজোরে চেপে ধরলে তার জানলাটাকে। তারপর চোখের নিম্নে দরজার হাতল ঘূরিয়ে সে হয়ড়ি খেয়ে হড়মড় করে পাশের গাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ল।

আড়ত হয়ে রত্না বসে আছে গাড়ির এক কোণে এবং অন্য কোণে দেখা গেল আর একটা মৃত্যিকে।

উদ্বাস্তুর মতো তাদের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, ‘এসেছি—আমি এসেছি রত্না।’ তারপরেই সে তার চেতনা হারিয়ে ফেললে।

শ্যামলের

কান্দনের

ক্ষেত্রে:

মাঝে মাঝে

কান্দনে

মাঝে

পথঘূর্ণ

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জীবন দেখতে গিয়ে মৃত্যু

১৯৩৫

পুলিশ কমিশনারের ঘরের ভিতরে বসে আছেন তিনজন লোক—স্বয়ং সুধাকান্ত চৌধুরি, বসন্ত এবং শোহনলাল। তাঁদের মুখের ভাব প্রশংসন্ত বটে, কিন্তু তাঁদের মনের ভিতর দিয়ে কেন তাবের ঝড় বইছিল, বাইরে থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারবে না।

খানিকক্ষণ পরে বসন্ত ধৈর্য হারিয়ে বললেন, ‘এতক্ষণ কেটে গেল, তবু এখনও কোনও খবর নেই।’

সুধাকান্ত বললেন, ‘কলকাতার দিকে দিকে লোক পাঠানো হয়েছে, কিন্তু না কিন্তু খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।’

—‘আমি বিশ্বাস করি না। শ্যামলকে আপনি চেনেন না, তাই এই কথা বলছেন।’

কৌতুক হাসি হেসে সুধাকান্ত বললেন, ‘শ্যামলকে জানি চিনি না, নয়? তুমি তাকে যখন এত বেশি চিনে ফেলেছ, তখন সময় থাকতেই তাকে প্রেস্তার করলে না কেন?’

—‘তাকে প্রেস্তার করতে নিষেধ করেছেন তো আপনিই।’

সুধাকান্তের দুই চঙ্কু যেন কোনও গোপন কারণেই আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি হাস্তান্ত হাসতে বললেন, ‘ওয়ারেন্টখানা কোথায় আছে?’

—‘আমার পকেটেই।’

—‘তাহলে এইবারে তাকে প্রেস্তার কোরো।’

—‘কী আশ্চর্য! শ্যামলের কোনও পাতাই নেই তাকে প্রেস্তার করব ক্ষেপন করে।’

এমন সময় একজন লোক ‘ট্রে’-র উপরে চায়ের কেটালি, পেয়ালা ও কতকগুলো স্যান্ডউইচ নিয়ে
ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সুধাকান্ত বললেন, ‘বসন্ত, তোমরা আজ অত্যন্ত বিচলিত হয়েছ বলে তোমাদের জন্যে এই ব্যবস্থা
করে রেখেছি। নাও এগুলোর সম্মতিহার করতে দেরি কোরো না’ বলে তিনি নিজের হাতেই কেটালি
থেকে তিনটে পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন।

হঠাৎ টেলিফোনের ঘটা বেজে উঠল, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

হয়তো যে-সংবাদের প্রত্যাশা করা যাচ্ছে, টেলিফোনে এসেছে তারই বার্তা!

চা ও স্যান্ডউইচের কথা ভুলে বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ‘রিসিভারটা তুলে নিলেন সাধারে।
বললেন, ‘হালো, হাঁ, হাঁ, আমাই কথা কইছি।’

টেলিফোনের বার্তা শুনতে তাঁর মুখের ভাব ক্রমেই গভীর হয়ে উঠল অধিকতর। সুধাকান্ত
ও শোহনলাল চুপ করে বসে বসে বসন্তের মৌখিক ভাবের পরিবর্তন লক্ষ করতে লাগলেন। নিস্তুর
ঘরের ভিতরে কেবল ঘড়িটা করতে লাগল টিক টিক টিক। সেই একান্ত শুন্দির ভিতরে টেলিফোনের
তার অপর প্রাণ থেকে যে-বার্তা বহন করে আনছিল, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তার ক্ষীণ শুঙ্গন।

তারপর বসন্ত ‘রিসিভারটা নিয়ে টেলিফোন যত্নের উপর রেখে কয়েকবার ঝঠালেন ও
নামালেন। এবং আবার শুধোলেন, ‘এইমাত্র কোনো কে আমাকে ডেকেছে। ডাকটা কোথা থেকে এসেছে
বলতে পারেন?...আচ্ছা, ধন্যবাদ।’

‘রিসিভারটা যথাহানে স্থাপন করে বসন্ত ফিরে এসে বললেন, ‘কোনও অজানা বন্ধু আমাদের
শ্মরণ করেছেন। ‘বড়োবাজার এক্সচেঞ্জের’ পাবলিক টেলিফোন’ ব্যবহার করে তিনি আমাকে অতি
ভদ্র ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, আজ থেকে ঠিক তিনি দিনের ভিতরে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের ধাপের
উপরে গোবিন্দদাসের কোটি টাকার নোট যদি রেখে না আসা হয়, তাহলে রঞ্জদেবীর দুই চক্ষু অক্ষ
করে দেওয়া হবে।’

সুধাকান্ত বলে সর্বনাশ! এখন উপায়?

বসন্ত বললেন, ‘শোহনবাবু, আমি বিনয়বাবুকে চাই।’

শোহন শুধোলেন, ‘কেন?’

—‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছেন বিনয়বাবু। শ্যামলের সঙ্গে তিনি
যেসব কথা বলছিলেন, আমি স্বর্কর্ণে তা শুনেছি। সমস্ত রহস্যই তিনি জানেন। তাঁকে আমি গ্রেপ্তার
করব বলে ভেবেছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি রাধাপুর থেকে কেলো আসতে হয়েছে বলে তা পারিনি।
শোহনবাবু, আপনি এখনই রাধাপুরে চলে যান। আপনার সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টরও রাধাপুরে যাবে,
বিনয়বাবুকে গ্রেপ্তার করে আপনি কলকাতায় নিয়ে আসুন। রাধাপুর এখন থেকে বেশি দূরে নয়।
আপনি অন্যাসেই আজ সন্ধ্যার মধ্যেই বিনয়বাবুকে এখানে এনে হাজির করতে পারবেন।’ তারপর
তিনি সুধাকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি কী বলেন, স্যার?’

সুধাকান্ত সহাস্যে বললেন, ‘মামলার ভাব দিয়েছি তোমার হাতে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই
করবে। এখন বসে পড়ো। স্যান্ডউইচ অপেক্ষা করছে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সময় থাকতে এগুলোর
একটা ব্যবস্থা করে ফ্যালো।’

খাবার খেয়ে ও চা পান করে শোহনলাল তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুধাকান্ত বললেন, ‘শোহনলালের সামনে আমি কিছু বললুম না বটে, কিন্তু রাধাপুরে শোহনলালকে না পাঠিয়ে অন্য কোনও লোককে পাঠালে হত না?’

—‘কেন বলুন দেখি?’

—‘শোহনলাল তো কলকাতা পুলিশের লোক নয়। তুমি ওর পরামর্শ নিতে পারো, কিন্তু কোনও বড়ো কাজের ভার ওর হাতে না দিলেই ভালো হয়।’

—‘কিন্তু শোহনলাল আমার সঙ্গে রাধাপুরে গিয়েছিল। বিনয়বাবুকে সে চেনে আর ওখানকার সব কিছুই তার নথদর্পণে। আমাকে এখন কলকাতাতেই থাকতে হবে। তাই ওকে রাধাপুরে পাঠালুম।’

‘৭ জুন বুক্স:

১ অক্টোবর

১৫ জুন প্রাতঃ

১৫ অক্টোবর প্রাতঃ

কঠোর কলকাতার উপরে নেমেছে তখন সম্ভাব্য অঙ্গকার।

মাঝে একজন ইনস্পেকটরের সঙ্গে বিনয়বাবু প্রবেশ করলেন বসন্তের ঘরে।

ইনস্পেকটর বললে, ‘শোহনলালবাবু আজ রাত্রে রাধাপুরেই থাকবেন। নিজের মালপত্র আজ তাড়াতাড়িতে তিনি নিয়ে আসতে পারেননি। সেগুলো নিয়ে তিনি কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।’

৮:৩০:

বসন্ত বললেন, ‘আছা।’

ইনস্পেকটর ঘর থেকে দেরিয়ে গেল।

১০:৩০

১০:৩০

৩ বসন্ত ফিরে বললেন, ‘এই যে বিনয়বাবু। আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি। বসুন।’

বিনয়বাবু অভিযোগপূর্ণ কঠে বললেন, ‘আমাকে এভাবে কলকাতায় নিয়ে আসা হল কেন?’

—‘শ্যামলের সঙ্গে আপনার গলায় গলায় বস্তু হ’। তার কোনও কথাই আপনার কাছে গোপন নেই। আপনার মুখেই আমি তার সব কথা শুনতে চাই।’

—‘কারুর ব্যক্তিগত গুপ্তকথা ব্যক্ত করবার অধিকার আমার নেই। আপনি অন্যায় অনুরোধ করছেন বসন্তবাবু।’

বসন্ত গলার স্বর কর্কশ করে তুললেন, ‘আপনি জীবন দেখতে চান, না বিনয়বাবু? জীবনের আর-একটা দিক আমি আজকেই আপনাকে দেখাতে পারি। রঞ্জাদেবীকে স্বাক্ষর কে বা কারা ছুরি করে নিয়ে গেছে। তারা কে, একথা আপনি জানেন। আমার কাছে সব প্রকাশ না করলে আমি নিশ্চয়ই আজ আপনাকে প্রেপ্তার করব।’

বিনয়বাবু সচকিত কঠে বললেন, ‘রঞ্জাদেবীকে আবার ধরে নিয়ে গিয়েছে! এ খবর তো আমি এখনও পাইনি।’

—‘কেবল তাই নয়। চোরেরা শাসিয়েছে যে, গোবিন্দদাসের কোটি টাকা যদি তাদের হাতে তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে রঞ্জাদেবীকে তারা অক্ষ করে দেবে।’

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, ‘আপনি সত্য বলছেন?’

—‘হ্যাঁ। এখন বলুন দেখি, শ্যামল কোথায় আছে?’

—‘আমি জানি না। আজ ভোরবেলায় গাড়ি নিয়ে শ্যামলবাবু কলকাতায় চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমাকে বলে যাননি।’

— ‘কলকাতায় তার বাড়ি আছে?’

— ‘বলতে পারি না।’

— ‘রঞ্জাদেবী কোথায়?’

— ‘তাও আমি জিনি না।’

— ‘শ্যামল সম্বন্ধে আর সব কথাই আপনি তো জানেন?’

— ‘নিশ্চয়ই নয়। কোনও কোনও কথা তিনি আমার কাছে বলেছেন বটে, কিন্তু অনেক কথাই প্রকাশ করেননি। তবে আমাকে শ্যামলবাবুর অনুগত বলতে পারেন বটে। আর রঞ্জাদেবীকে আবার যে চুরি করবার চেষ্টা হবে, এটাও আমি আগে থাকতেই আন্দজ করতে পেরেছিলুম।’

বসন্ত সবিশয়ে বললেন, ‘আন্দজ করতে পেরেছিলেন? কেমন করে?’

— ‘সেটা বলতে আমার আপত্তি নেই। কাল রাত্রে—’

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ‘রিসিভারটা তুলে নিয়ে বসন্ত বললেন, ‘হ্যালো, হ্যাঁ। কাকে চাই? হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছেন।’ মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, ‘বিনয়বাবু, ফোন এসেছে আপনার নামে।’

বিনয়বাবু বিস্মিত তাবে ‘রিসিভারটা গ্রহণ করে বললেন, ‘শ্যামলবাবু ফোন করছেন! জরুরি দরকার, আমাকে এখনই যেতে হবে। কিন্তু আমি একটু পরেই আবার এখানে ফিরে আসব।’

বসন্ত চেঁচিয়ে বললেন, ‘শুনুন! থামুন! কিন্তু ততক্ষণে বিনয়বাবু ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছেন।

বসন্ত একলাক্ষে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ে চিংকার করে বললেন, ‘এই সিপাই! পাকড়ো, পাকড়ো।’

প্রৌঢ় বিনয়বাবুর তৎপরতা বিশ্যাজনক। একটা পাহারাওয়ালা দুই বাহুর বিস্তার করে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বিনয়বাবু সুকৌশলে সমস্ত বাধা এড়িয়ে একেবারে ফটক পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন অতি দ্রুতপদে। ফটকের পাশেই পুলিশের একখানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তার পাশ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বসন্ত রিভলভার বার করে চিংকার করে উঠলেন, ‘থামুন, বিনয়বাবু, নইলে এই আমি গুলি করলুম।’ তিনি পলায়মান মূর্তির পায়ের দিকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুড়তে গেলেন। কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই কোথা থেকে আর একটা রিভলভারের শব্দ ছুল এবং পরমহৃতেই বিনয়বাবু দুই হাতে তাঁর মাথা চেপে ধরে স্টান পথের উপরে পড়ে গেলেন।

বিনয়বাবুর শখ হয়েছিল জীবন দেখবার জন্ম। কিন্তু তার বদলে দেখলেন তিনি মৃত্যুকেই।

বিনয়বাবুর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বসন্ত চতুর্দিকে করতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তিনি তো রিভলভার ছোড়েননি, তাবে কে করলে এই কাজ?

একখনো সাদা রঙের মোটর এইমাত্র এইখান দিয়ে বেগে চলে গিয়েছে বটে। এখনও দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে সেই গাড়িখানা।

বসন্ত ছুটে এসে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়লেন এবং চালককে বললেন, ‘ওই সাদা গাড়িখানার পিছনে পিছনে চলো।’

সোজা পথ। পুলিশের গাড়িখানা তিরবেগে এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে সাদা গাড়িখানার আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

রাস্তার চৌমাথ। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বার করে বসন্ত শুধোলেন, ‘এখান দিয়ে কোনও সাদা মোটর যেতে দেবেছ কি?’

কনস্টেবল বললে, ‘হ্যাঁ হজুর, গাড়িখানা খানিক এগিয়ে ডান দিকে ওই রাস্তার ভিতরে ঢুকে গেল।’

আবার ছাঁটল পুলিশের গাড়ি কনস্টেবলের নির্দেশমতো ডান দিকের সেই রাস্তায় ঢুকে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একখানা মাঝারি আকারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সাদা গাড়িখানা। কিন্তু গাড়ির ভিতরে কেউ নেই।

বসন্ত রাস্তায় নেমে পড়লেন। সেই বাড়িখানার সদর দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। বাড়িখানার সব জানলা অন্ধকার। দেখলে মনে হয় তার মধ্যে নেই জনপ্রাণী। দরজার উপরে সজোরে ধাক্কা মারতে মারতে বসন্ত কয়েকবার চিক্কার করে ডাকলেন, কিন্তু কাকুর টু-শব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

পুলিশের গাড়ির ভিতরে ছিল দুইজন পাহারাওয়ালা। বসন্তের ডাক শুনে তারা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বসন্ত বললেন, ‘দরজার উপরে লাথি মারো, দরজাটা ভেঙে ফ্যালো।’

দুইজন পাহারাওয়ালার ঘন ঘন পদাঘাতের ফলে দরজার ভিতরের অগ্রলাটা গেল ভেঙে। এক হাতে রিভলভার এবং আর এক হাতে টর্চ নিয়ে বসন্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, ‘তোমরাও আমার সঙ্গে এসো।’

একটু এগিয়েই পাওয়া গেল দোতলায় উঠবার সোপানশ্রেণি। একজন পাহারাওয়ালাকে সিড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে, আর-একজনকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত আগে একতলার ঘরগুলোর ভিতরের উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বসন্ত আবিষ্কার করলেন, খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে। তিনি হতাশ ভাবে বললেন, ‘সাদা গাড়িতে চড়ে যারা এখানে এসেছিল, নিশ্চয়ই তারা খিড়কি দিয়ে সরে পড়েছে। চলো, এখন উপরটা একবার দেখে আসি।’

পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে দোতলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। বারান্দা দিয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই বাঁ দিকে পাওয়া গেল একটা ঘর। তার দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার।

রিভলভারটা উদাত করে, টর্চের চাবি টিপে বসন্ত খৰ্ব সুরক্ষানে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন এবং তারপর সচমকে বলে উঠলেন, ‘এ কী দৃশ্য!’

প্রায় মিনিটখানেক বিস্ফারিত নেত্রে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বসন্ত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর সুইচটা আবিষ্কার করে আলো জেলে দিলেন।

ঘরের মেঝের উপরে নানা ভদ্রিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে চার-চারটে মনুষ্যমূর্তি!

তাদের দিকে তাকিয়ে বসন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাতে একটা মূর্তি অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে নতুন উঠল। তৎক্ষণাতে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে বসন্ত প্রত্যেক মূর্তিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। আরও দুটো মূর্তির জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু তাদের দেহে আছে প্রাণ। একটা লোক মরে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দেহের ভিতরে তল্লাশ করে পাওয়া গেল রিভলভার। সেগুলো হস্তগত করে একটা রিভলভার সঙ্গী

পাহারাওয়ালার হাতে দিয়ে বসন্ত বললেন, ‘তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। ঘরের ভিতর দিয়েই আর একটা দরজা রয়েছে দেখছি! আগে ওঘরটা আমি দেখে আসি।’

দরজাটা বক্ষ ছিল না। পাশের ঘরে চুকে আলো জ্বলে দিয়ে বসন্ত দেখলেন, সেখানে কোনও লোক নেই। কিন্তু মেরের উপরে পড়ে আছে একটা সাদা জিনিস। একখানা রুমাল।

বসন্ত রুমালখানা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তার এককোণে বোনা রয়েছে দুটো অঙ্কর—‘রঞ্জা’।

তাহলে রঞ্জাকে চুরি করে এইখানেই নিয়ে আসা হয়েছিল? কিন্তু রঞ্জার রুমাল রয়েছে এখানে, সে গেল কোথায়? আর এই গুগুর যতো চার-চারটে সোকাই-বা কে? কার কবলে পড়ে এদের এমন অবস্থা হয়েছে? দুজনের ঢোয়ালে তো দেখছি প্রচণ্ড মৃষ্টাঘাতের চিহ্ন! এসব যে রঞ্জাদেবীর কৌর্তি নয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি রঞ্জাদেবীকে কেউ উদ্ধার করেছে?

মনের ভিতরে জাগল বটে প্রশংসনো, কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোনও উভয়ই পেলেন না বসন্ত। তারপর তিনি বাড়ির অন্য ঘরগুলোও খুঁজে এলেন। কেউ কোথাও নেই।

বসন্ত পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, ‘তোমরা দুজনে এইখানেই পাহারা দাও। একজন উপরে আর একজন একতলায়। আমি এখনই থানায় গিয়ে আরও লোকজন পাঠিয়ে দিছি।’

তাহলে পুরুষের কাছে পুরুষের পুরুষ

পুরুষ

পুরুষের পুরুষ

সুধাকান্ত শুধোলেন, ‘তাহলে রঞ্জাকে কেউ উদ্ধার করেছে?’

বসন্ত বললেন, ‘রুমালের সূত্র দেখে তো তাই মনে হয়। কিন্তু কেই-বা তাকে হৃৎ আর কেই-বা উদ্ধার করলে, সেইটৈই আন্দাজ করতে পারছি না।’

এমন সময় একজন লোক ঘরের ভিতরে এসে বললে, ‘বসন্তবাবু, রাধাপুর থেকে আপনার নামে এই টেলিগ্রামখানা এসেছে।’

টেলিগ্রামে লেখা ছিল

‘শ্যামলবাবুর সঙ্গে রঞ্জাদেবী নিরাপদে ফিরে এসেছেন। শোহনবুরু গ্রেপ্তার করেছেন শ্যামলবাবুকে! তিনি আপনার সঙ্গে এ সন্দেশে পরামর্শ করতে চান—সুবোধ।’

সুধাকান্ত বললেন, ‘যা ভেবেছিলুম, তাই। যে গৌরব তোমার প্রশংসন, তা নাভ করলে শোহনলাল। সে নিশ্চয়ই খুব সুচতুর।’

বসন্ত বললেন, ‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! জাতার পুনিশেব কাছে টেলিগ্রাম করে জেনেছি, সেখানেও সকলের মুখে মুখে ফেরে তার চাতুর্যের খ্যাতি। এ মামলায় আমি কেবল নির্বোধ বলে প্রয়াণিত হয়েছি। শোহনলালও সুচতুর, শ্যামলও কম চতুর নয়। তার চাতুর্যের আরও-কিছু ইতিহাস আমি তলে তলে সংগ্রহ করেছি।’

সুধাকান্ত মুখ ঢিপে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, ‘শ্যামলের কথা তো আগেই তোমাকে আমি বলেছি।’

বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কিন্তু তার সমস্ত গুপ্তকথা আপনিও আমাকে জানাননি। আচ্ছা, রাধাপুর থেকে ফিরে এসে সব কথাই আপনাকে খুলে বলব। এখন আমি চলবুম।’

৩৫৪

শোড়শ

৩৬

শোহনলালের বক্তব্য

চৰকাৰ প্ৰকাশিত
শ্ৰমিক বিষয়া

খুব ভোৱে বসন্ত মোটৱে চেপে যাত্রা কৱলেন রাধাপুৱেৰ দিকে।

তাঁৰ মুখ আজ খুব খুশি। যেসব স্তুতি পাকিয়ে মামলাটাকে জটিল কৱে তুলেছিল, সেগুলো এখন আলাদা আলাদা কৱে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নৌকো প্ৰায় ঘাটেৰ কাছে এসে পড়েছে, বিগদেৰ সন্তানণ এখন নেই বললৈই চলে। লভনেৰ বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেৰ পুলিশেৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ সঙ্গে পৰিচিত হৰাৰ জন্যে তাঁৰ মনে অনেকদিনেৰ উচ্চকাঙ্ক্ষা। পুলিশ কমিশনাৰ অঙ্গীকাৰ কৱেছেন, এই মামলাটাৰ কিনাৱা কৱতে পাৱলে তিনি তাঁৰ জন্যে একটা লম্বা ছুটিৰ ব্যবস্থা কৱে দেবেন। আজকেই যে এই মামলার একটা কিনাৱা হয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

বসন্ত মনেৰ আনন্দে উপৱি উপৱি তিনটে সিগাৱেটকে পুড়িয়ে ছাই কৱে ফেললৈন। শোহনলাল জাভাৰ একজন নামজাদা ব্যক্তি। কলকাতাৰ এই মামলাটাৰ সমন্ত বিজয়গৌৰবও আজ সে অৰ্জন কৱতে চায়। শ্যামল নামজাদা হৰাৰ জন্যে ব্যক্তি নয়, ইচ্ছা কৱলে সে-ও খুব নাম কিনতে পাৰত। কিন্তু সে তা চায় না, সে চায় তুবে তুবে জল খেতে অগাধ জলেৰ মকরেৰ মতো।

মোটৱ যথাসময়ে রাধাপুৱেৰ ভিতৱে প্ৰবেশ কৱলে। গাড়ি থকে নেমেই তিনি দেখলেন, গাড়িবাৰান্দাৰ তলায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে শোহনলাল। সে বললে, ‘প্ৰিয় বসন্তবাবু, কাল রাত্ৰেও আপনি এলেন না দেখে, আমি ভোৱেছিলুম আপনি আৱ এখানে আসবেন না।’

বসন্ত বললেন, ‘বেশি রাতে আপনাৰ টেলিগ্ৰাম পেয়েছিলুম, তাই কাল আসতে পাৱিনি। কিন্তু শ্যামলকে তো আপনি গ্ৰেপ্তাৰ কৱেছেন, এখন আৱ বেশি তাড়াঢ়োৱ দৰকাৰ কী? ধন্য শোহনবাবু, আপনি আমাৰ অভিনন্দন গ্ৰহণ কৱনো?’

—‘ধন্যবাদ।’

—‘রঞ্জাদেবী ভালো আছেন তো?’

—‘নিশ্চয়। তাঁৰ জন্যে আৱ দৃশ্যতাৰ কোনওই কাৰণ নেই। এখন চলুন আমৱা লাইব্ৰেইঝৱেৰে ভিতৱে যাই।’

লাইব্ৰেইঝৱেৰ ভিতৱে প্ৰবেশ কৱে টেবিলেৰ দুইধাৱে দুইজনে মুশোদ্ধুৰি বসে পড়লেন।

বসন্ত বললেন, ‘এইবাবে সব কথা শোনবাৰ জন্যে আমাৰ স্বেচ্ছা অধীৱ হয়ে উঠেছে। কোন কোন স্তুতি ধৰে আপনি কী কী কৱেছেন, আমাৰ কাছে তা খুলে পোললে বাধিত হব। কেমন কৱে আপনি শ্যামলকে গ্ৰেপ্তাৰ কৱলেন?’

—‘রঞ্জাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামল নিজেই এখানে এসে হাজিৱ হয়েছে।’

—‘আজৰ, উদ্ধৃত, আশচৰ্য কথা।’

—‘কিন্তু সত্য কথা। সে পৱন শাস্তি ভাবে এখানে এসে রঞ্জাদেবীকে আমাৰ হাতে সমপৰি কৱলে। তাৱপৱ বাপ্পেৰ হাসি হাসতে হাসতে আমাৰ সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মুখে একটা সিগাৱেট ধৰিয়ে ফেললে।’

—‘হাঁ! শ্যামলেৰ ওই হাসি আমি খুব চিনি। দেখলৈই বিষম রাগ হয়। তাৱপৱই আপনি বুঝি তাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৱলেন?’

—‘হ্যাঁ। কিন্তু তখনও সে বিচলিত হল না। অত্যন্ত সহজ ভাবেই বললে, ‘আমার হাতে হাতকড়ো একটু আলতো ভাবে পরাবেন। আমার কঞ্জি জখম হয়েছে।’ দেখলুম, সত্ত্বই তাই। শ্যামলের নিজের দলের লোকেরা বিশ্বাসযাতকতা করে গুপ্তধন আব রত্নাদেবীকে নিয়ে চল্পট দেবার চেষ্টা করেছিল, আর শ্যামলকে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল বাধা দেবার জন্যে।’

—‘শোহনবাবু, এরকম ছাড়া ছাড়া তাবে না বলে সব কথা আপনি গুছিয়ে বলুন।’

—‘গুছিয়ে বলবার বেশি মাল-মশলা কিছুই নেই।’

—‘সাদা সওয়ার কে?’

—‘শ্যামল নিজে।’

—‘কিন্তু রাত্রে তার আবির্ভাবের কারণ কী?’

—‘কারণ লোককে ভয় দেখানো। ধূংসত্ত্বের ভিতরে পুপুধন আছে, এই ভুল ধারণার বশবতী হয়ে রাত্রে সেখানকার নানা জায়গার মাটি খুঁড়ে দেখা হত। কৌতুহলী লোকদের তফাতে রাখবার জন্যে শ্যামল অলৌকিক সাদা সওয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করত।’

—কিন্তু লোকে বলে—আর ভুনবাবুর ঘৃণা: ‘একধা শুনেছি যে, সাদা সওয়ার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে আবার যখন খুশি দৃশ্যমান হত। এর কারণ কিছু অনুমান করতে পেরেছেন?’

শোহনলাল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ‘ওইখানেই কেমন একটা ধাঁধা থেকে গিয়েছে।’

—‘কিন্তু আদালত তো ধাঁধার কথা শুনবে না, যা কিছু সব আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। এ মামলায় আপনি আমার উপরে টেক্কা মেরেছেন, তবু আপনার সুবিধার জন্যে রহস্যটা আমি পরিষ্কার করে দিতে পারি। সাদা সওয়ারের গায়ে ছিল একটা সাদা জামা। কিন্তু তার সঙ্গে থাকত একখানা কালো র্যাপার। রাত্রের অঙ্ককারে সে যখন সাদা জামা গায়ে দিয়ে বাইরে চলাফেরা করত, তখন সকলেই তাকে দেখতে পেত। তারপর অদৃশ্য হবার দরকার হলে সে গায়ে মুড়ি দিত সেই কালো র্যাপারখানা। রাত্রের অঙ্ককারের সঙ্গে তার র্যাপারের কালো রং একেবারে মিলিয়ে যেত।’

—‘ধন্যবাদ বসন্তবাবু, একটা জটিল সমস্যার সমাধান করে আপনি আমার বড়ো উপকার করলেন।’

—‘না শোহনবাবু, এখনও আর একটা মস্ত সমস্যা আছে—মেঝেরাতে ভুবন মারা পড়ে, তার উপরে তার নিজের আঙুলের ছাপ ছিল কেন?’

—‘কারণ সে আঘাতী করেছিল।’

বসন্ত মাথা নেড়ে বললেন, ‘অস্ত্রব! সে আঘাতী করবে কেন? বিশেষ, রত্নাদেবীর বাড়িতে এসে তাঁর আঘাতী করার মানেই হয় না। আর তাঁর আঘাতীর পূর্ব মুহূর্তেই বিনয়বাবুই বা ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন কেন? আদালতে এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন আপনি?’

শোহনলাল সায় দিয়ে বললে, ‘ঠিক বলেছেন। এসব কথা তো আমি এতক্ষণ ভেবে দেখিনি! আপনি এসব সমস্যারও সমাধান করে দিতে পারবেন?’

—‘পারব বলেই মনে করি।’ এই বলে বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, ‘আমি এখন থানায় ফোন করে শ্যামলকে এখানে আনাতে চাই।’

—‘সেজন্যে আপনাকে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না। সুবোধ বাইরেই আছে, আমি তাকে

এখনই থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' এই বলে শোহনলাল গাত্রোখান করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসন্তের মুখে ফুটল রহস্যময় হাসি। নিজের মনে মনেই তিনি বললেন, 'নৌকোকে এখন ঘাটে ভিড়োবার সময় হয়েছে।'

ঘরের ভিতরে পুঁঁপ্রবেশ করে শোহনলাল বললে, 'শ্যামলকে নিয়ে আসবার জন্যে সুবোধ এখনই থানায় চলে গিয়েছে।'

— উত্তম! শোহনবাবু, আপনি মামলাটাকে মন্দ খাড়া করেননি। এজন্যে আপনার বাহাদুরি শীকার করছি।' তারপর শোহনলালের কাঁধের উপরে দক্ষিণ বাহু স্থাপন করে বসন্ত আবার বললেন, 'প্রিয় শোহনলাল, আমি এখন তোমাকে প্রেপ্তার করতে চাই।'

সেই মুহূর্তেই বসন্ত মাথার উপরে অন্তর্ভুক্ত করলেন তীব্রণ এক আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল তাঁর সমস্ত অন্তর্ভুক্তি!

১৯৩৪.১২.১২.

১১৪৬

ক্ষেত্ৰ

ক্ষেত্ৰ নথি: ক্ষেত্ৰ

ক্ষেত্ৰ নথি

সপ্তদশ

১৯৩৪.১২.১২.

১৯৩৪.১২.১২.

দাবার শেষ চাল

সর্বপ্রথমে বসন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দেওয়ালের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুখানা সেকেলে তরবারি।

এই দুখানা তরবারি আগেও দেখেছেন তিনি। কিন্তু কোথায়? ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল, রঞ্জাদেবীর লাইব্রেরিঘরে দেওয়ালের উপরে এই তরবারি দুখানাকে তিনি আগেও দেখেছেন করেক্কবার।

আর কিছু মনে পড়ছে না। বসন্ত আবার দুই চক্ষু মুদে ফেললেন, তারপর আবার তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর দৃষ্টির সামনে জুলজুল করছে শোহনলালের দুটো কূর ও হিঁস চক্ষু।

তারপরই তিনি শুনতে পেলেন শোহনলালের কষ্টস্বর 'মামলাটাকে আমি মন্দ খাড়া করিনি, কী বলো বসন্ত?'

বসন্ত তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, তিনি রঞ্জাদেবীর লাইব্রেরিঘরেই আছেন বটে। আড়ষ্ট ভাবে বসে আছেন একখানা কাঠের চেয়ারের উপরে এবং শৰ্কু দড়ি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। বাম পাশে তাকিয়ে দেখলেন সেইরকম বন্দি অবস্থায় সুবোধও বসে আছে আর-একখানা চেয়ারের উপরে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডান পাশে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানেও একখানা চেয়ার। তার উপরে বসে রঞ্জাদেবী, তাঁরও সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘরের আর-এক কোণে নিরিক্ষার ভাবে বসে আছে গুড়ার মতন দেখতে আর-একটা লোক। বাঁ হাতের চেটোর উপরে ডান হাতের বৃংজাপুলি দিয়ে সে 'সুক' প্রস্তুত করছিল আপন মনে।

তারপর তিনি তাকালেন ঘরের উপর দিকে। সেখানে জুলছে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি। তিনি রাধাপুরে এসেছেন সকালবেলায়, আর এখন কি সন্ধ্যা উত্তরে গেছে? এতক্ষণ তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন? কিম্বা শৰ্য্যমতঃপরম?

শোহনলাল জিজ্ঞাসা করলে, ‘বঙ্গুবর বসন্তদ্বাৰা, আশা কৰি আপনি এতক্ষণে মাথাৰ আঘাতটা সামলে নিতে পেৰেছেন?’

বসন্ত শৃঙ্খিৰ ভাব দেখিয়ে বললেন, ‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু প্ৰিয় শোহনলালবাবু, আপনাৰ এই কৌতুকভিন্নয়ের আসল উদ্দেশ্যটা কী?’

—‘কেতুকাতিনয়! তুল বঙ্গু, ভুল! আপনাকে আৱ সুবোধকে এখনই পৰলোকে পাঠাৰ বাবস্থা কৰা হৈব। টেলিগ্ৰাম কৰে ফাঁদে ফেলবাৰ জন্মে আপনাকে যে এখানে ডেকে আনা হয়েছে, তাৱে কি আপনি বুঝতে পাৰেননি?’

বসন্ত মন্তুকান্দেলন কৰে বললেন, ‘পেৰেছি প্ৰিয়বৰ, পেৰেছি। নাটকেৰ চৰম দৃশ্যে কী হতে পাৰে সেটা আগেই আমি আন্দজ কৰে নিয়েছিলুম। তুমি যে জাভা পুলিশেৰ কৰ্মচাৰী নও, তুমি যে সেখানকাৰ ফেৰাৰি আসামি, এসব তথ্য সংগ্ৰহ কৰেই আমি এখানে পদার্পণ কৰেছি। তুমি যখন নিৰ্বাধেৰ মতো বক বক কৰে আমাকে রাপকথা শোনাছিলে, তখন পকেটেৰ ভিতৰে আমাৰ হাত ছিল রিভলভাৰেৰ ঘোড়াৰ উপৰে। তোমাকে যখন প্ৰেপাৰ কৰতে যাই, তখনও আমি প্ৰস্তুত ছিলুম। কিন্তু ওই দুশ্মন চেহাৰাৰ লোকটা যে পিছন থেকে অতৰ্কিতে আমাকে আক্ৰমণ কৰবে, এতটা আমি আন্দজ কৰতে পাৰিবিন।’

—‘মাঝে মাঝে আমৰা সকলেই ভুল কৰে ফেলি, না বসন্ত?’

—‘ঠিক! এৱ পৱেও যথাসময়ে তুমিও যে ক্ষোণও মাৰাইক ভুল কৰে বসবে এ বিষয়েও আমাৰ কিছুমাত্ৰ সন্দেহ নেই। তাৰপৰ কী হবে জানো? দুলতে হবে তোমাকে ফাঁসিকাটৰে দোলনায়।’ কথা কইতে কইতে বসন্ত মনে মনে ক্ৰমাগত নাড়াচাড়া কৰছিলেন, মুক্তিলাভেৰ উপায় কী? পুলিশ কামিশনারেৰ আগ্ৰহ দেখে শোহনলাল সমষ্টি সমষ্টি রহস্য তিনি তাৰ কাছে উদ্ঘাটিত কৰে এসেছেন। বসন্তেৰ কাছ থেকে খবৰ পেতে দৈৰ হলে সেখান থেকে সাহায্য আসবাৰ যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শোহনলাল কি বেশি বিলম্ব কৰবে? তাৰ দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেঁকছে নিৰ্মম হত্যাকাৰীৰ দৃষ্টি।

শোহনলাল বললেন, ‘কিন্তু বসন্ত, এটা তুমি বলতে বাধ্য যে, শ্যামলেৰ বিৰুদ্ধে আমি একটা ভালো মামলা সাজাতে পেৰেছি।’

—‘মোটেই নয়, মোটেই নয়! এমন দুৰ্বল যামলা আমি আৱ দেখিনি।’

—‘বেশি, ফলেন পৰিচয়তে। এখন শোনো! চন্দ্ৰকান্ত চন্দ্ৰকে তুমীলয়ে প্ৰেৰণ কৰেছি আমি নিজেই। কাৰণ? আমাৰ লোক হয়েই আমাকে সে ঠকাতে চেয়েছিলৈ? ভোৰেছিল, আমাৰ চোখে ধূলো দিয়ে সে একসঙ্গে রঢ়া আৱ গুপ্তধন হস্তগত কৰবে। তাৰপৰ রঢ়াৰ ঘৱেৰ জানলা লক্ষ্য কৰে সেই রিভলভাৰ ছোড়াৰ ব্যাপারটা। ভুবন সে কাজ কৰেছিল আমাৰই নিৰ্দেশে। আমি ঠিক আন্দজ কৰেছিলুম যে, সৱাসিৰি রঢ়াৰ উপৰে আক্ৰমণেৰ চেষ্টা হলে তুমি তয় পেয়ে তপোবনেৰ ভিতৰেই আড়া গাড়ৰাব চেষ্টা কৰবে। তাৰ মানে, তোমাৰ সঙ্গে থাকব আমিও। বাড়িৰ ভিতৰে থাকবাৰ সুযোগ পেলে আমাৰ অনেক সুবিধা হবে। সেখানে ভুবনেৰ সাহায্য তোমাকেও আমি পথ থেকে সৱাবাৰ ব্যাবহাৰ কৰেছিলুম। কিন্তু তখনও তোমাৰ কা঳ পূৰ্ণ হয়নি বলে তোমাৰ বদলে মৰতে হল মৰাথকে! তাৰপৰ গুপ্তধনেৰ লোতে ভুবনও বিশানুভাৱ হয়ে দাঁড়ায়। সে আমাৰ হুকুম না মেনে বঢ়াকে হৱণ কৰে। তাৰপৰ সে বঢ়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এৱ মধ্যে আছে নিশ্চয়ই শ্যামল আৱ বিনয়েৰ কাৰচূপি। তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে দেখে ভুবন অত্যন্ত ভীত হয়। কাৰণ, সে

বেশ বুঝে নিয়েছিল যে, তাকেও আমি হত্যা করব চল্লকাটের মতো। তারপর ঠিক কী হয়, ভিতরের ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। আন্দজে কেবল এইটুকুই বলতে পারি, বিনয়ের সাহায্যে শ্যামল তাকে প্রৱোচিত করে আমাকে হত্যা করবার জন্যে। তোমাদের উপস্থিতিতেই আকশ্মিক অঙ্ককারের সুযোগ নিয়ে ভুবন আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু কেমন করে আমি বেঁচে গিয়েছিলুম, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তবে একটা কথা এখনও তুমি জানো না। নিজেকে সামলে নিয়ে সেই মুহূর্তেই আমি দুই হাতে ভুবনের ছোরাসুন্দ মুষ্টিবদ্ধ হাত চেপে ধরে অস্ত্রখানা তারই বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছিলুম। এইজনেই ছোরার উপরে পাওয়া যায় কেবল ভুবনেরই আঙুলের ছাপ।’

বসন্ত বললেন, ‘চমৎকার শোহন, চমৎকার! তিন-তিনজন সাক্ষীর সামনে রোগীর মুখেই রোগের কাহিনি ব্যক্ত হচ্ছে।’

শোহন হা হা করে হেসে বললে, ‘আমার বিরক্তে কে সাক্ষী দেবে? তোমাদের দুজনকে তো এখনই মহাপ্রশ়ান করতে হবে! বাকি রইল কেবল রঞ্জ। সে যদি আমাকে বিবাহ করতে রাজি হয়, তাহলে তো সব মুশকিলই আসান হয়ে যাবে। নইলে সে-ও হবে তোমাদের মহাপ্রশানের সঙ্গনী। কামিনীর জন্যে আমার কোনওই আকিঞ্চন নেই—আমি চাই কাঙ্গন, আমি চাই গোবিন্দদাসের কোটি টাকা।’

—‘বটে, বটে? কিন্তু সে টাকা পাবে কেমন করে?’

—‘তাও বলছি। কিন্তু আমার কাহিনির আরও কিছু বাকি আছে, সেটুকু শুনে রাখো। আমার দলের দুইজন লোক বিশ্বাসযাতী হল দেখে, আমি আবার এক নতুন দল গড়ে তুলি। এক সন্ধ্যায় বনের ভিতরে গিয়ে আমি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলুম, কেমন করে রঞ্জকে আবার চুরি করতে হবে, সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা ছায়ার্টিকে সরে যেতে দেখি। খুব সম্ভব সে পাদিরি বিনয়। আমাদের কিছু কিছু কথা সে বোধহয় শুনতে পেয়েছিল। তখনই আমি মনে মনে তার উপরে দিয়েছিলুম প্রাণদণ্ড। তারপর তোমার নির্দেশে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে আমার বড়ো দুশ্চিন্তা হল। সে পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই আমার কথা ফাঁস করে দেবে। খুব ক্ষত মোটর চালিয়ে পুলিশের আগেই আমি কলকাতায় এসে হাজির হই। তারপর বিনয়-বধের র্যাবস্থাটা পাকা করে ফেলি। কথা রইল, আমার কয়েকজন লোক পুলিশের আস্তানার কাছে পাহারা দেবে। তারপর বিনয় এলেই শ্যামলের নামে তাকে ফেলন করে রাস্তায় ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর যা হয়েছিল তোমাকে তা আর বলবার দরকার নেই। সমস্ত শুনে এখন তোমার হাসি পাচ্ছে বৈধ হয়?’

বসন্ত বললেন, ‘হাসি পাচ্ছে কী শোহন, মনে মনে আমি হাসছি—খুব হাসছি। বন্ধু, তোমার আসল স্বরপ তখনই আমি জেনে ফেলেছিলুম।’

—‘তাই নাকি? তাহলে তুমি হচ্ছ একটা নিরেট বোকা! সব জেনেও তুমি হাত গুটিয়ে বসেছিলে?’

—‘তোমাকে প্রেপ্তার করবার আগে তোমার বিরক্তে আমি আরও প্রমাণ সংগ্রহ করছিলুম।’

—‘কিন্তু যেসব প্রমাণ কাজে লাগাতে পারবে না, তা সংগ্রহ করে কোনওই লাভ নেই। যাক, বাকি কথাও শুনে রাখো। গুপ্তধনের জন্যে ঘটনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে কলকাতায় আমার বাসায় একটি ছাটোখাটো পরামর্শ-সভার আয়োজন করেছিলুম। আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল

ভুবনের আর চন্দ্রকান্তের। কিন্তু ভুবন উপস্থিত থাকতে পারেনি। কে একজন অপরিচিত আগস্তক এসে ভুবনকে অঙ্গান করে ফেলে তার স্থান প্রহণ করে আমাদের অঙ্গাতসারেই। আগস্তক আমাকে চিনতে পারেনি, কারণ আমার মুখ ছিল কুমালে ঢাকা। কিন্তু তার আগমনে আমার একটা উপকার হয়! সিডি দিয়ে নামবার সময়ে তার পকেট থেকে পড়ে যায় পকেটবুক। তার ভিতরে ছিল জাভার গোয়েন্দা বিভাগের একখানা ‘আইডেন্টিফিকেশন কার্ড’—তার নামের জ্যোগাটা ছিল খালি। সেইখানে নিজের নাম বসিয়ে আমি সাজি জাভা পুলিশের লোক। বসন্ত, তুমি আর কিছু জানতে চাও?’

—‘না।’

—‘তাহলে গোবিন্দদাসের সেই ক্যাশবাঞ্জটা বিনাবাক্যবায়ে আমার হাতে সমর্পণ করো।’

—‘তুমি তো জানোই, ক্যাশবাক্য আছে থানার মালখানায়।’

—‘তুমি ইচ্ছা করলেই ক্যাশবাঞ্জটা এখনই এখানে আনাতে পারো।’

—‘কেমন করে?’

—‘টেলিফোনের ‘রিসিভার’টা আমি তোমার মুখের সামনে ধরছি। থানার অফিসারকে জানাও, ক্যাশবাঞ্জটা যেন তপোবনের বাগানে আমার হাতে অর্পণ করা হয়।’

—‘তোমাকে অতখানি আপ্যায়িত করবার ইচ্ছা আমার নেই।’

—‘সাধান বসন্ত, আগুন নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না।’

—‘আগুন নিয়ে খেলা করতেই আমি ভালোবাসি।’

শোহন গভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপরে টাঙানো একখানা তরবারি হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নিলে, তারপর ক্ষিরে অভ্যন্ত কঠিন স্বরে বললে, ‘বসন্ত! বলো, এখনও তুমি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি আছ কি না! যদি নারাজ হও, তাহলে আমি প্রথমেই কচ করে তোমার একটা কান কেটে নেব। তারপরেও রাজি না হলে তোমার আর একটা কানও কাটা যাবে। তারপর তুমি একে একে হারাবে নাক, ঠেঁট, চোখ, তারপর—’

রত্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘চৃপ কর শয়তান।’

শোহনলাল চকিতে তরবারির অগ্রভাগটা রত্নার গালের উপরে টেনে দিলে এবং দেখতে দেখতে তার গঙুদেশ ও কষ্ট বয়ে রক্ষধারা নেবে এসে জামাকাপড়ও করে তুললে রক্ষাকৃত।

নিষ্ঠল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে ও বাঁধন ছেঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বসন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘কাপুরুষ! নরকের কাঁট! পুরুষদের ছেড়ে অসহায় মুরীর উপরে অস্ত্রাঘাত।’

একগাল হেমে শোহনলাল বললে, ‘মাঝেং! পুরুষদের ছাড়ব না। আমি এখানে ছেনেখেলা করতে আসিন—সেই ক্যাশবাক্য আমার চাই-ই চাই। বলো—এখনও বলো, তুমি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি আছ কি না।’

কুন্দ কঠে বসন্ত বললেন, ‘না, না, না,—কিছুতেই না।’

—‘তাহলে এই তোমার ডান কানটা উড়ে গেল! সে তরবারি উঁচিয়ে বসন্তের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বললে, ‘ভগবানের দিব্য! আমি যা বলছি, তাই করব।’

—‘বসন্ত অট্টহাস্য করে বললেন, ‘তোর আবার ভগবান! নরকেও যে তোর ঠাই নেই।’

—‘শোহনলাল বাম হাতে বসন্তের ডান কানটা টেনে ধরে তরবারি তুললে।

ঠিক সেই সময়ে পিছনে একটা ভারী দেহ পতনের শব্দ হল। চমকে পিছনে ফিরে শোহনলাল

দেখলে, তার গুভার মতো অনুচ্ছৱটা মাথায় রিভলভারের হাতলের ঘা খেয়ে ঘরের মেঝেয় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে এবং দরজার কাছে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল, তার দুই হাতে দুটো রিভলভার!

১৫৩

১৫৪

১৫৫
শোহনলাল
শ্যামলের বক্তব্য

অষ্টাদশ

১৫৬

শ্যামলের বক্তব্য

১৫৭

শোহনলাল হতভস্বের মতো বললে, 'তুমি!'

—'তা ছাড়া আর কে হবে?'

শোহনলালের হাত থেকে তরোয়ালখানা মাটির উপরে পড়ে গেল বানবান শব্দে।

দুটো রিভলভারই শোহনলালের দেহের উপর উদ্বাত করে আদেশের স্বরে শ্যামল বললে, শিগগির ওই দেওয়ালের কাছে গিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও।...হ্যাঁ, এইবারে হাতদুটো উপরে তোলো। হয়েছে, একটুও না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

শ্যামল একটা রিভলভার নিজের পক্ষের ভিতরে ফেলে শোহনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার দুই পক্ষে হাতড়ে বার করলে দুটো 'অটোমেটিক' পিস্তল। সে দুটো নিজের এক-একটা পক্ষে রেখে সে বললে, 'তুমি যদি কোনও রকম চালাকি করো, তাহলে এখনই তোমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলব।'

এতক্ষণ পরে সে ভালো করে ঘরের অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর পেল। রঞ্জার মুখ দেখেই সে শিউরে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে তার মুখের পানে তাকিয়ে সে নির্মমকষ্টে বললে, 'তোমাকে আঘাত করেছে? দুরায়া তোমাকে আঘাত করেছে? আচ্ছা!'

তারপর সে ঘরের মেঝে থেকে শোহনলালের পরিত্যক্ত তরবারিখানা ভুলে নিয়ে বন্দিদের দিকে এগিয়ে গেল। এবং একে একে সকলের বাঁধন ছিপিয়ে করে দিলে ক্ষিপ্রহস্তে!

হঠাতে বসন্ত চিংকার করে বললেন, 'ইশিয়ার শ্যামলবাবু!'

ইতিমধ্যে শোহনলাল কিপ্প হস্তে দেওয়ালের উপর থেকে অন্য তরবারিখানা টেনে নিয়ে বাখের মতো শ্যামলের উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

কিন্তু বসন্তের সতর্কবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামল সঁওকেরে একদিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। শোহনলালের উর্ধ্বোথিত তরবারির প্রথম আঘাতটা লক্ষ্যচূর্ণ হয়ে শশদে একটা টেবিলের উপরে গিয়ে পড়ল। তার পরমুচূর্ণে শ্যামল দূর থেকেই নিজের হাতের তরবারিখানা এত জোরে শোহনকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলে যে, তরবারির একটা প্রান্ত তার কঠিনদেশের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে বেরিয়ে পড়ল। বিকট চিংকার করে শোহনলাল সঙ্গে সঙ্গে ভূতজ্ঞায়ি হল এবং তারপর তিন-চারবার ছটফট করেই তার দেহ হয়ে গেল একেবারে আড়ষ্ট।

১৫৮
১৫৯

ঘরের ভিতর থেকে তখন শোহনলালের মৃতদেহ এবং তার সঙ্গীর অচেতন দেহটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

শ্যামল একটু হেসে বললে, ‘এইবাবে আমাদের পালা।’

বসন্ত বললেন, ‘কিন্তু শ্যামলবাবু, আপনি তো থানায় আটক ছিলেন! এখানে এলেন কেমন করে?’

শ্যামল বললে, ‘আমার আসল পরিচয় দিয়ে ‘আইডেন্টিফিকেশন কার্ড’ দেখবার পর থানার অফিসার আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, এবাড়ির চারিদিকেই এখন পুলিশের লোক পাহারা দিচ্ছে।’

রঞ্জা বিশ্বিত কঠে বললে, ‘আপনার আসল পরিচয়? আপনার আবার নতুন কিছু পরিচয় দেবার আছে নাকি?’

বসন্ত বললেন, ‘রঞ্জাদেবী, আপনি শ্যামলবাবুর আসল পরিচয় জানেন না। উনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে একজন পদস্থ ডিটেকটিভ। নিজেকে লুকিয়ে সকলের অগোচরে ওঁকে কাজ করতে হয়। কর্তব্যপালন করবার জন্য ওঁকে পৃথিবীর নানা দেশেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তারতের কোনও শক্ররাজ্য থেকে প্রেরিত এক গুপ্তচর বোঞ্চাই শহরে ধরা পড়েছিল, কিন্তু তার গোপন অভিসন্ধি নিশ্চিত তাবে জানা যায়নি। সেইজন্যে ছায়াবেশে ওঁকে বোঞ্চাইয়ের জেলখানায় কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। বাইরের সকলে জানত উনিও একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী। তাই অন্যান্য কয়েদিরাও অকপটে ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করত। উনি সেখানে ছিলেন সেই গুপ্তচরের পেটের কথা আদায় করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত উনি সফল হয়েছিলেন।’

শ্যামল হাসতে হাসতে বললে, ‘আমার আসল পরিচয় জানবার জন্যে আপনাকে দেখছি অনেক গবেষণা করতে হয়েছে।’

—‘সেইটেই আমাদের কর্তব্য নয় কি?’

শ্যামল বললে, ‘সদ্য স্বর্গগত—না সদ্য নরকস্থ শোহনলাল সম্বন্ধে কানাঘুঘোয় আমি কোনও কোনও কথা শুনেছিলুম। তাই কৌতুহলী হয়ে তার বাসায় এক পরামর্শসভায় ছায়াবেশে যোগ দেবার সুযোগ প্রাপ্ত করেছিলুম। তার অভিপ্রায় জেনে, আসবার সময় আমি জাভা পুলিশের একখানা নামহীন ‘আইডেন্টিফিকেশন কার্ড’ সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলুম। তার মুখ কালো রুমালে ঢাকা ছিল। তখনও পর্যন্ত আমি স্বচক্ষে তাকে দেখিনি। পরে তাকে শনাক্ত করতে পার্তির বনেই ওই কার্ডখানা তাকে দিয়েছিলুম উপহার। কারণ, আমি নিশ্চয়ই জানতুম, কার্ডখানা পরে সে নিজের কাজে ব্যবহার না করে ছাড়বে না। আমার অনুমান যিথাং হয়নি। পরে স্বৰ্ণনাঈ শুনলুম, সে নাকি জাভা পুলিশের লোক, তখন থেকেই তার সম্বন্ধে আমার আর কোনও সন্দেহ থাকেনি।’

বসন্ত বললেন, ‘বিনয়বাবুর পরিগাম আপনি শুনেছেন কি?’

—‘পরিগাম? কেন, কী হয়েছে?’

বসন্ত সংক্ষেপে বিনয়বাবুর মৃত্যুকাহিনি বর্ণনা করলেন।

শ্যামল কিছুক্ষণ স্তুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কর্কণ স্বরে বললে, ‘হতভাগ্য বিনয়বাবু! যদিও তাঁর চেহারা আর কোনও কোনও ব্যবহার হাস্যকর ছিল, কিন্তু খাঁটি মানুষ হিনাবে তিনি ছিলেন চমৎকার। আর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এখানে একমাত্র তাঁর কাছেই আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করেছিলুম। পাদবি হয়েও তাঁর মতন শখের গোয়েন্দাগিরি শেখবার জন্যে আর কাঙকেই আমি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি হয়ে পড়েছিলেন আমার অনুগত শিয়ের মতো। তাঁর কাছ থেকে

আমি অনেক মূল্যবান সাহায্য লাভ করেছি। লোকে যাতে আমাকে সন্দেহ করতে না পারে, সেইজন্যে আমার সামনে তাঁকে বেখেছিলুম শিখগুৰির মতন। আমি নিজে আড়ালে থেকে তাঁকে দিয়ে অনেক কাজই করে নিয়েছি! আমার পরামর্শেই তিনি ভুবনকে উত্তেজিত করে রঞ্জার বাড়িতে পাঠিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন যথাসময়ে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলুম এক, আর হল আর-এক ব্যাপার। সেইখানেই শয়তান শোহনলাল মারা না পড়ে, প্রাণ দিতে হল ভুবনকেই।’

বসন্ত বললেন, ‘আপনার কাছে আর একটা বিষয় জানবার আছে। রঞ্জাদেবীকে আপনি কোথা থেকে কেমন করে উদ্ধার করলেন?’

‘ভালো করে সব কথা পরে শুনবেন বসন্তবাবু। এখন কেবল দু-চারটে ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে রাখি। রঞ্জাকে যখন মোটরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি নিজের গাড়ি থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিলুম। তারপর আমার গাড়িখানাকে ধ্বনিসের মধ্যে পাঠিয়ে আমি তাদের গাড়ির তিতরে লাফিয়ে পড়ে অঙ্গান হয়ে যাই। তারপর তারা আমাকে সেই অবস্থাতেই কী একটা ওষুধ খাইয়ে দীর্ঘকালের জন্যে নিষ্ঠিয়া করে রাখে। জ্ঞান হয়ে দেখি আমি কোনও অজানা বাড়ির একটা ঘরের মেঝেতে শুয়ে রয়েছি। তারপর পাশের ঘরে রঞ্জার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ পাই। তারা নিশ্চিন্ত ছিল, আমার যে জ্ঞান হয়েছে সেটা কেউই সন্দেহ করতে পারেনি। তারপর আমি নির্ভর করলুম নিজের গায়ের জোর, বৰঁঁ আর যুৎসুর জ্ঞানের উপরে। অতর্কিংতে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে দুজনকে বক্সিংয়ের ‘নক আউট রো’ মেরে, আর একজনকে লাথি চালিয়ে চোখের নিম্নে মাটিতে পেড়ে ফেলি, চতুর্থ বাস্তি ধরাশায়ি হয় যুৎসুর পাঁচে। তারপর তারা গাত্রেখান করবার আগেই একখানা লোহার চেয়ার দিয়ে উপরি উপরি আঘাত করে চারজনকেই একেবারে কাবু করে ফেলি। তারপর রঞ্জাকে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে একেবারে রাধাপুরে চলে আসি। সেখানে হাজির ছিল শোহনলাল। আমি মজা আরও কতখানি গড়ায়, তাই দেখবার জন্যে যেচে তার হাতে আস্বসম্পর্ণ করি।’

তপোবনের বাগান। বাগানের ভিতর অপেক্ষা করছে একখানা মোটরগুড়ি।

শ্যামল বললে, ‘রঞ্জা, এইবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছেন।

রঞ্জা মাথা নামিয়ে স্তুত হয়ে বইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শ্যামল তুলে ধীরে ধীরে বললে, ‘আমাকে এখানে একলা ফেলে তুমি কোথায় যাবে শ্যামল?’

—‘নিজের কর্তব্য পালন করতে। এখানে আমার কাছে ওপুধনের চেয়ে তুমিই হয়ে উঠেছিলে বেশি মূল্যবান। কিন্তু কর্তব্য আমাকে ডাকছে, এখন আমাকে বাঁধন ছিঁড়তে হবেই।’

রঞ্জা কাতর কষ্টে বললে, ‘কিন্তু আমার সংস্কৰণে কি তোমার কোনও কর্তব্যই নেই?’

শ্যামল অনাদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘তোমার জন্যে যা করবার তা তো আমি করেছি রঞ্জা! আমার কি আরও কিছু করবার আছে?’

রঞ্জা অতি মৃদুকষ্টে বললে, ‘সে কথা তুমি জানো আর জানেন আমার ভগবান।’

—‘তুমি কী বলতে চাও রঞ্জা?’

—‘আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কায়া যদি চলে যায়, ছায়াও কি তার সঙ্গে সঙ্গে যাবে না?’

শ্যামল খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। তারপর আকাশে চোখ তুলে দেখলে, চাঁদ উঠেছে। তারপর আঘাত নিয়ে অনুভব করলে, বাগানে গঞ্জফুল ফুটেছে। তারপর কান পেতে শুনলে, কোথা থেকে পাখি ডাকছে—‘বউ কথা কও, বউ কথা কও!’ মনে মনে সে ভাবলে, কবিবা কল্পনায় মেতে যা বর্ণনা করেন, তার সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনও মিলে যায় নাকি?

রঞ্জা গাঢ় স্বরে বললে, ‘শ্যামল!’

শ্যামল উজ্জ্বলিত কঠে বললে, ‘রঞ্জা!’

—‘প্রভু! স্বামী! আমি এখন কী করব?’

শ্যামল কোনও উত্তর না দিয়ে দুই দিকে নিজের দুই বাহু বিস্তৃত করলে।

রঞ্জা ঝাপিয়ে পড়ে তার বুকের ভিতর লুকিয়ে ফেললে নিজের মুখ।

শ্যামলের দুই বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে যেন হারিয়ে ফেললে রঞ্জা।*

* পাঞ্চাত্য আধ্যান অবলম্বনে।

